সম্রাজ্ঞী কুন্তী

নটরাজন

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

সম্রাজ্ঞী কুন্তী

অরণ্যে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে অরণ্য। গোটা আকাশ রাঙা হয়ে গেছে। লেলিহান শিখা লকলকে জিভ মেলে আকাশটাকে গিলতে চাইছে যেন। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আগুন যেন জঙ্গলের পশুদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য অরণ্যের। ছোট বড় বন্যপ্রাণীরা পরিত্রাহি চিৎকার করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, যে যেদিকে পারছে। মুখ দিয়ে তাদের ফেনা বেরোচ্ছে। কষ্টে হাঁফাচ্ছে। তবু শ্বাস নেয়ার জন্যে একটু থমকে দাঁড়াচ্ছে না, পাছে আগুন দৈত্য ধরে তাদের। দেহ পিঞ্জরে লুকোনো প্রাণের প্রতি কি মমতা প্রাণীকুলের।

শুকনো পাতার উপর দিয়ে আগুন লাভা স্রোতের মতো গড়িয়ে আসছে। কুটীরের দাওয়ায় বসে দাবানলের দিকে অপলক চেয়ে আছি। আগুনের কী ভয়ংকর রূপ। কী নিষ্ঠুর লীলা তাঁর। বুকে প্রেম নেই, করুণা নেই, মমতা নেই, শুধু আছে ক্ষমাহীন জিঘাংসা! ধ্বংসে তার উল্লাস। তার প্রলয় শিখায় নটরাজ নাচছেন যেন। নির্দয়ভাবে সব কিছু নিশ্চিহ্ন করার আনন্দে মাতোয়ার। পরিণামের কথা ভাবার সময় যদি থাকতো এমন ক'রে জ্বলে উঠতো না আগুন।

দাবানলের বুক থেকে তাপ বয়ে নিয়ে হু হু করে ছুটে এল এক ঝলক গরম হাওয়া। ত্বকে ত্বকে জ্বালা ধরিয়ে দিল। আমার চেতনার ভেতরে, সমস্ত সত্তার ভেতর ঐ জ্বালা কথা কয়ে উঠল যেন। বলল, তোমার বুকের আগুনের চেয়ে দাবানলের তাপ খুব বেশি কি?—আচমকা প্রশ্নে আমি একটু বিব্রত বোধ করি। গরম বাতাস একান্তে ফিসফিস করে বলল ঃ পৃথা এরকম এক দাবানল তো তোমার বুকে অনেককাল ধরে জ্বলেছে। খোলা চোখে তার লেলিহান শিখা কেউ দেখেনি। মানে, দেখতে পায়নি। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগুন জেলেছ তুমি। তোমার বুকের আগুনে গোটা ভারতভূমি পুড়ে ছারখার হয়েছে। ক্ষত্রিয় নারীর গর্ব ছিল তোমার। প্রিয় গর্ব পূরণ করতে তুমি করনি এমন কাজ নেই। নিজের অহঙ্কারের মধ্যে তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে। ঐ অহঙ্কার ছাড়া এই বিশ্বে তোমার সুখের ভাগীদার কে আছে?

পৃথা তুমি বড় অভাগা। বড় একা পৃথিবীতে। কিন্তু তোমার মতো দুঃখীকে দেখে করুণা হয় না।

পাখীর গগন বিদারী আর্তনাদ সহসা অনামনস্কতার জগৎ থেকে আমাকে বাস্তবে নিয়ে এল। বুকের মধ্যে কষ্টের একটা খামচা খামচি শুরু হলো। দাবানলের কথা তো এ নয়। এ তো আমার মনের অভ্যন্তরের কথা। বিবেকের আত্ম-অনুশোচনা।

বাণপ্রস্থে আমার মনটা ভালো যাচ্ছিল না। জীবনভর যা করেছি নিজের জন্যে, স্বামীর জন্যে, পুত্রদের জন্যে ; তার ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত নিয়ে ইদানীং অনেক কথাই মনে হয়। নিজের অজান্তেই আমার সব কাজের একজন নিষ্ঠুর সমালোচক এবং কঠিন বিচারক হয়ে উঠি। দুর্বলতার প্রশ্রয় দেই না। অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করার জন্য মনকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত রাখি। তবু সত্য চিরদিন অপ্রিয়। মনের মন যখন বিচার বুদ্ধির উপর দখল নেয়, আসামীর কাঠগড়ায় সওয়াল করে তখন নিজেকে বড় দীন, অসহায় এবং বিপন্ন মনে হয়। কৈফিয়ৎ দেবার কিছু থাকে না।

অজান্তে চোখের পাতা ভিজে গেল। এ কোন অনুভূতিতে ভেতরটা আমার পাগল পাগল লাগছে? দাবানলের তপ্ত হাওয়ার স্পর্শে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। মনের কখন কি হয়ে যায় মনও জানে না। কেন জানে না—কে জানে? কতকাল হয়ে গেল একবারও নিজেকে কোন কাজের জন্যে দোষী মনে হয়নি। তা-হলে বুকে এ কোন অনুশোচনার কষ্ট? এর উৎসই বা কোথায়?

কিছুক্ষণ চোখ বুজে সব স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে কে যেন বলল: পিতা শূরসেন তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। দুর্বাসা তোমার জীবনে রাহু। কর্ণ অভিশাপ। পাণ্ডু অনন্ত দুঃখের কারণ। আর তোমার ব্যক্তিত্ব, তেজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, রাজমাতা হওয়ার দুর্বার বাসনা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার এক আগুন জ্বালল। সেই আগুনে মাদ্রী পুড়েছে, খাণ্ডবপ্রস্থ জ্বলছে, বারণাবতে জতুগৃহে নিরীহ ছ'টি প্রাণ দগ্ধ হয়েছে: দ্রৌপদী প্রেমের আত্মাহুতি দিয়েছে, কুরুক্ষেত্র গোটা ভারতবর্ষকে শ্মশান করেছে। তবু বুকের আগুন তোমার নেভেনি। তোমার বুকে এত তাপ জমে আছে যে অরণ্য দাউ দাউ করে জ্বলছে। অকস্মাৎ চমকে তাকালাম।

গলিত লাভা স্রোতের মতো আগুন ধেয়ে আসছে।

কুটীরের অদূরে অপ্রশস্ত নদী বয়ে গেছে। ওপাড়ের আগুন যে কোন সময় এপাড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবু কী আশ্চর্য! আমার বুকে একটুও ভয় নেই, দুর্ভাবনা নেই।

সমস্ত অনুভূতির ভেতর মহাকালের পদধ্বনি শুনিছ। নূপুর পায়ে নাচছেন নটরাজ দাবানলের রূপ ধরে তা তা থৈ থৈ করে। তাঁর এক পা বর্তমানে, আর এক পা অতীতে। আকাশজোড়া উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের জ্যোতি-বিকীর্ণ মহোৎসবের মধ্যে নটরাজ নয়, আমার অতীতকে দেখছি।

ত্রয়োদশী পৃথা সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবন নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। তাকে তো আমি চিনতেই পারি না। চিনব কোথা থেকে? পৃথা তো অনেককাল আগে মরে গেছে। কিন্তু তার নামের শিকড়টা আমার মধ্যে রয়ে গেছে। তাই বোধ হয়, পৃথাকে বাদ দিয়ে কুন্তীকে ভাবা যায় না। কুন্তীর মধ্যে পৃথার মৃত্যু হয়েছে ঐ তেরো বছর বয়সে। পৃথার নবজন্ম হলো কুন্তীর মধ্যে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পৃথা হাসছে। একটু হাসলে ওর দু'গালে টোল পড়ে। তখন দারুণ সুন্দর দেখায়। পৃথার গালে টোল দেখার জন্যে পিতা শূরসেনের এক ধরনের আকুলতা ছিল। তাঁর সে মুখ স্মৃতিসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। আজও চোখ বুজলে দেখতে পাই।

দিনান্তে শূরসেন পৃথার কাছে একবারটি আসবেই। পৃথাকে দেখতে নয়, তার সাধা ঝরানো মোহন হাসির টানে রোজ আসে। অবশেষে, এমন হলো শূরসেনকে দেখলেই তার হাসি পেত। কাঙাল চোখে শূরসেন তার টোল খাওয়া মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকত। কি দেখত—কে জানে?

পৃথা লজ্জা পেত। বাবার বাড়াবাড়ি একদম ভালো লাগত না। ভেতরে ভেতরে এক অস্বস্তিকর সংকোচে ছটফট করত। পাছে কষ্ট পায় বাবা, তাই সাবধানে হেসে হেসে বলতো: তুমি যেন কি? আমি আর ছোট নেই, বড় হয়েছি। এটা বোঝ না কেন? আমার বুঝি লজ্জা করে না? ছেলেমানুষীর একটা বয়স থাকে, তোমাকে এ বয়সে আর মানায় না। কথাগুলো বলতো আর হাসতো।

শূরসেনের সংশোধনের চেষ্টা ছিল না। তৃষ্ণার জল তৃষ্ণিতকে যেমন পরিতৃপ্ত করে তেমনি এক তৃপ্তি নিয়ে বলত: তোর সুধা ঝরা হাসিতে আমার প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তি। কেবল তোর কাছে এসে দাঁড়ালে একটু শান্তি পাই। আমাকে নতুন প্রাণ দেয়। টোল খাওয়া ঐ হাসি আমাকে নবীকৃত করে!

পৃথা কথা বলতে পারত না। বিগলিত প্রসন্নতায় মৃদু মৃদু হাসত।

অনেক কাল পরে কথাগুলো আমার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল।

বহুকাল আগের ঘটনা হলে কি হবে? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম একটা লতানো গাছ বাইরের বারান্দায় মৃদু হাওয়ায় দুলছে। গুচ্ছ গুচ্ছ নীল

ফুল ফুটে আছে তাতে। পৃথা এক গুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে কবরীতে গুঁজল। এক ঢাল কোঁকড়া চুলের কবরীর শোভাটা তাতে বহুগুণ হলো। কি এক অকারণ পুলকে নিজের মনে গুণগুণ করল।

পৃথা মুখে যাই বলুক, প্রতিদিন শূরসেনের আগমনের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করত। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই নেশাগ্রস্ত রোগীর মতো তার ভেতরটা কী এক অস্বস্তিতে আর অতৃপ্তিতে ছটফট করত। বাবার উপর রাগ, অভিমান হতো শূরসেনের কাছে তার চেয়ে বেশি কেউ হতে পারে, মনে হলে মাথা দিয়ে আগুন ছোটে।

একবার কার্যোপলক্ষ্যে শূরসেনের কদিন আসনি পৃথার কাছে। তাতেই অভিমানে মুখ আঁধার করে জানলার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথা। বুকে তার ঝড়। কথা বলবে না ধনুকভাঙা পণ করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখবে না। খেলার পুতুল নয় বাবার। পুতুল দাক্ষিণ্য পেয়ে খুশি, কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ চায় আদর, ভালোবাসা। তার প্রাপ্ত মর্যাদা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তেরো বছর বয়সেও পিতার কাছে ছোট সে। বাবা-মা র কাছে সন্তানেরা কোনদিন বড় হয় না; চিরকাল ছোট থাকে। কিন্তু বাবার এই ঔদাসীন্য একটুও ভালো লাগে না তার। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে নিজের একটা মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় বাবা সেটাই বুঝতে চায় না। সে এখন আত্মসচেতন একজন নারী। বাবা বলে শূরসেন তার মর্যাদা অপব্যবহার করতে পারে না। সব কিছুর একটা বয়স আছে। কষ্ট হলেও তাঁকে মেনে নিতে হয়। মানুষের সব সম্পর্কের ভিত তো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মর্যাদা আর সম্মান দিয়েই তৈরী হয়। মুগ্ধ করার মন্ত্রে বাবা তার মর্যাদা বাজে খরচ করছে বলে মনে হলো পৃথার। সব বস্তুরই একটা আলাদা মূল্য থাকে। বিনামূল্যে ধূলোকণা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্নেহ, মমতা, আদর, সোহাগ তো দূরের কথা। বাবা ভালোবাসেনি তাকে। নিজের ভালোবাসাকে বিনামূল্যে খুশি করে গেছে। তাই, জীবন হাতের আঁজলা গলে গলিয়ে যাচ্ছে সে। তার প্রতি শূরসেনের দরদে টান ধরেছে। বিনামূল্যে নে এত বেশি দিয়েছে যে তার নিজের দামটাই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

নিজের মনের ভেতর সত্তার ভেতর এরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতিকে আবিস্কার করা যে কী দারুণ আনন্দ আর মুক্তির ব্যাপার আচমকা তা জানল। মনের জগতের সব আবিস্কারই মানুষ বোধ হয় অকস্মাৎ একা একা করে। নির্জনের, অবকাশের একাকী ব্যক্তিত্বটাই তার আসল ব্যক্তিত্ব। এই বোধটাই তার কানে ফিস ফিস করে বলে, কোন কাজ যদি মনের সাড়া না পায়, আনন্দের না হয়, যদি তা নিষ্ঠার না হয় তা হলে তা পূজার কাজে লাগে না। উল্টে এক গভীর ঘৃণাই অবচেতনে জমতে জমতে নিজেকে কুরে কুরে খেয়ে যায়। কাজ করাটা যতটা অন্যের জন্যে তার চেয়ে বেশি নিজের ভালো লাগা এবং নিজের ভালোর জন্যে। মানুষ হিসেবে আত্মসম্মান নিয়ে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মূল্য যে বোঝে না তাকে সারা জীবন পস্তাতে হয়। যদি মানুষ মানুষের মতো

হয় তবেই এ সংসারে, সমাজে তার মূল্য, নইলে তার দাম কানাকড়িও নেই।

ঘরের ভেতর চেনা পায়ের খসখস শব্দ হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াল। পৃথা নড়ল না। ঘাড় ফিরে দেখলও না। কাঠ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরের অসংযত অভিমানকে আটকে রাখতে প্রাণপণে জানলার গরাদ দুহাতে শক্ত করে ধরল।

অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

শূরসেনের বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি। অসহায়ভাবে বলল ঃ ক'দিন আসতে পারেনি। আজও দেরী হলো।

পৃথা কথা বলল না। গরাদ ধরে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল! শূরসেনের নিশ্বাস তার গায়ে পড়ল। বেশ বুঝতে পারছিল তার একটু করুণা, অনুগ্রহ পাওয়ার জন্যে কৃপাপ্রার্থীর মতো বাবা খুব কাছে দাঁড়িয়ে। নিজেকে অপরাধী ভেবেই তার গা ছুঁতে পারছে না। চুপ করে অপেক্ষা করছে কখন তার বুকের বরফ গলবে। চোখে শ্রাবণধারা নামবে।

পৃথা বুকের মধ্যে কাঁটা ফোটা যন্ত্রণার মতো তীব্র সুখের এক দপদপানি অনুভব করল।

এবারের মতো ক্ষমা করে দে মা। আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে গিয়ে শূরসেন বলল। তাঁর গলায় যেন অপরাধ রাখার জায়গা নেই।

পৃথার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। নিচের দাঁতের উপর ঠোঁট কামড়ে ধরল। মুখে কথা নেই। শূরসেনকে দেখেই যে মুখে অকারণে ফিক করে হাসি ফুটত, খুশির আভা ছড়িয়ে যেত সে মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। কার অভিশাপে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

কাঁধের উপর শূরসেন হাত রাখল। ঘৃণায় পৃথা কুঁকড়ে গেল। বিরক্ত ভাবেই এক ঝটকায় কাঁধ থেকে হাতখানা সরিয়ে দিল। বলল ঃ আমি তোমার খেলার পুতুল না।

শূরসেন পৃথার কণ্ঠস্বরে চমকল। গাঢ় গলায় আচমকা বিস্ময়ে উচ্চারণ করল ঃ এ কী ধরণের কথা!

মাথা সিঁধে রেখে বুক টানটান করে রুক্ষ গলায় পৃথা বলল ঃ যা সত্যি তাই বলেছি। বাবা, মানুষের সম্পর্কটা বড় পলকা। সাবধানে নাড়তে চাড়তে হয়। একটু অসাবধান হলে ভেঙেচুরে যায়। জোর করে সম্পর্ককে বাঁচাতে গেলে তাতে কাটার দাগ ধরে যায়। একটু অসাবধান হলে, নিজের দাঁতও খাতির করে না, জিভকে কামড়ে দেয়। রক্তপাত হয়। অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

শূরসেন অবাক হয়ে পৃথাকে দেখতে লাগল। মাত্র ক'টা দিন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এর মধ্যে কত বদলে গেছে সে। পৃথাকে তার ভীষণ অচেনা লাগল। দুঃখ করে বলল ঃ এও হয়তো তোমার ভালোবাসার এক ধরনের প্রকাশ। কিন্তু এরকম প্রকাশ যত কম হয় সংসারে তত মঙ্গল। আমার আর আর সন্তানদের থেকে তোমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা আমার বাৎসল্যের বিলাস মনে হয়েছে তোমার। হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রকৃত ভালোবাসা বড় ঝড় ঝাপ্টার। পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়। বড় বেশি প্রত্যাশা করে অন্য-

জনের কাছে। আবার আশাভঙ্গের বেদনায় পুড়ে কষ্ট ভোগও করে।

পৃথার বুকের ভেতর হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। সব দৃঢ় প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। হঠাৎ বাবার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। গভীর এক অপরাধবোধ থেকে বলল, আমায় ক্ষমা করে দাও বাবা। আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি শুধু একটু অন্যরকম বলেই বোধ হয় এত কষ্ট পাই। এটাই তোমার কাছে আমার অপরাধ।

শূরসেন তার দু'গালের উপর হাত রেখে গাঢ় গলায় ভাঙা স্বরে বলল: বোকা মেয়ে, ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? সব বাবা-মাকেই ছেলে মেয়ের এরকম কত পাগলামির ভার বইতে হয়। বাবা-মায়েরাই শুধু সেকথা জানে। না বলে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য থাকলে হয়তো অন্যরকম হতো। তা পারে না যে তারা। তাদের মতো স্নেহ-বৎসল প্রাণী বোধ হয় নেই।

শূরসেনের কথার আঁচ লেগে পৃথার ফর্সা মুখ অপমানে রাঙা হয়ে গেল। মাথা হেঁট করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

পৃথার অবস্থা দেখে আমি মৃদু মৃদু হাসছি। হাসবই তো! তার সঙ্গে আমার সম্পর্কে কি? প্রশ্নটা করেও আমি হাসছি। এই তো কত সহজে জিগ্যেস করতে পারলাম, এতদিন করেনি কেন? ও তো আর আমি নই, আমার অন্য এক সত্তা। সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে ওর মান-অভিমান দুঃখ-যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করে না বলেই এমন করে ওকে দেখে হাসতে পারছি। বহুকাল পরে আজ ওর কথা যখন মনে পড়ল, ভ্রূকুটি করেছি নিজেকে। আমার অন্য এক সত্তাকে উপহাস করার কোন লজ্জাই আমার ছিল না। তার সঙ্গে আমার নামের বন্ধন এড়াতে পারছি না বলে বিনি সুতোর মালার মতো আমার সত্তার সঙ্গে ঝুলে আছে। নিজের কথা গভীর করে ভাবতে গেলে তার প্রসঙ্গ না এসে পারে না। আমার নিন্দে, অপবাদ, কলঙ্ক, দুর্নাম, দুর্ভাগ্যের মূলে আমার বাবা শূরসেনের কাণ্ডজ্ঞানহীন একতরফা সিদ্ধান্তকে কিছুতে ভুলতে পারি না। বাবা নিজের হাতে তার প্রিয় পৃথার গলা টিপে হত্যা করল। পৃথা মরে কুন্তী হলো। কেন যে বাবা এমন একটা কাণ্ড করল কে জানে? এরকম না করলে আমার জীবনটা হয়তো তছনছ হতো না। আজ আমার নিজের দিকে চাইতে ভীষণ লজ্জা করে, ঘৃণা হয়।

যে স্মৃতিকে অবচেতনের গভীরে নির্বাসন দিয়ে বেশ ছিলাম, হঠাৎ বার্ধক্যে—বাণপ্রস্থে সেই স্মৃতি মনে পড়ছে। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করছে।

কুন্তী ভোজ বাবার পিসতুতো ভাই এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। জ্ঞান হওয়া থেকে তাঁকে এখানে দেখিনি কখনো। এই তাঁর প্রথম পদার্পণ ঘটল। মানুষটা ভীষণ আমুদে। হৈ-হুল্লোড় ভালবাসে। অল্পেই যে কোন বয়সের লোককে চুম্বকের মতো কাছে টেনে নেয়। মুহূর্তে আপন হয়ে উঠে। তবু তাঁর আচমকা আগমন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলল পরিবারের অভ্যন্তরে। যে যার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করল। এ ধরণের ব্যাখ্যা রাজপ্রাসাদে নতুন নয়। অপরিচিত কোন অতিথি এলে প্রত্যাগমন পর্যন্ত হরেক রকম আলোচনা চলতে থাকে। শূরসেনের কানেও সে গল্প নিশ্চয়ই পৌঁছত। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বাইরে বোঝা যেত না। তবে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবরটা ইদানীং বেড়েছিল। কৌতূহল প্রকাশের ধরণটাও একটু অন্যরকম। ভোজরাজকে কেমন লাগে, তাই বেশি করে জানতে ইচ্ছে করত। কেন, জানি না?

ক'দিন পরে ব্যাপারটা আর চাপা থাকল না। মাটি ফুঁড়ে বীজ থেকে চারা গাছ যেমন বেরিয়ে আসে তেমনি সব রহস্য ভেদ করে বাবাকেও বলতে হলো, পৃথা তোর কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে।

তাঁর আচমকা কথায় পৃথা একটু বিরক্ত বোধ করল। ধমকে বলল: চুপ করত। মাঝে মাঝে তোমার কি যে হয়, বুঝি না বাপু। আমি যত বড় হচ্ছি, তুমিও কেমন হয়ে যাচ্ছ! তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয়।

শূরসেন কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। কষ্টে ঢোক গিলল। জানলার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে আসা দিনের উজ্জ্বল আলো পড়ল বাবার গায়ে। মেঝেতে তার ছায়া পড়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত ছায়াও। গরাদের ফাঁকের ভেতর মুখের অর্ধেকটা গলিয়ে দিয়ে যূপবদ্ধ প্রাণীর মতো অসহায় গলায় বলল: আমার বুকে বিসর্জনের বাজনা ডগর দিয়ে বাজছে। অন্যেরা কেউ তা শুনতে পাচ্ছে না।

পৃথার ভুরু কুঁচকে গেল। গম্ভীর গলায় বলল: থামবে তুমি। এমন ছেলেমানুষী কর যে, কিচ্ছু ভালো লাগে না। কেন বোঝ না তোমার কষ্ট

দেখলে আমিও কষ্ট পাই। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে তখন ভীষণ অপরাধী মনে হয়। মেয়ে যেন আর কারো হয় না, শুধু তোমার একার আছে যেন।

পৃথা আমার কথা একটু আলাদা। জঙ্গলের তিন রাস্তার মোড়ে এসে পথিককে যেমন স্থির করতে হয় কোন পথ বেছে নেবে, তেমনি জীবন পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাকেও ভাবতে হচ্ছে কোন পথে যাব আমি? দুটো পথ কোন দিকে গিয়ে কোথায় শেষ হয়েছে জানা থাকলে স্থির করতে কম সময় লাগে। কিন্তু যেখানে জানা নেই সেখানে হয় সমস্যা। পথ, একবার ভুল বেছে নিলে শোধরাবার উপায় থাকে না। তোকে নিয়ে আমি সেই সংকটে পড়েছি—জীবনও জঙ্গলের মতোই। এখানকার ভুলের শাস্তিও বড় কঠিন। জীবন দিয়ে তার দাম শুধতে হয় নীরবে নিভৃতে।

বিস্ময়ে পৃথার ভুরু কুঁচকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় সভয়ে জিগ্যেস করল: বাবা, কী হয়েছে বলতো? তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কী একটা লুকোতে চাইছ। লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই। সংকট যখন আমায় নিয়ে, তখন মিছেমিছি নাটক করে লাভ কি? জীবনের ঘটনা নাটকের একটা অংশ, কিন্তু নাটকের কাঠামোয় একটা মানুষের জীবনকে ধরে না। নাটকের চেয়ে জীবন অনেক বড়। তাছাড়া তুমি বলছ, আমি তোমার বাঁচা, মরা। তা হলে বুঝিয়ে বলতে পারছ না কেন? জানি না—কী বলব তোমাকে?

অপরাধ রাখার জায়গা নেই যেন শূরসেনের। হাত ধরে পৃথাকে প্রশস্ত কেদারায় বসাল। নিজেও বসল তার পাশে। একটু ইতস্তত করে বলল: পাছে শ্রদ্ধা হারিয়ে ঘৃণার পাত্র হই, তাই সব বলা হয়নি। বিশ্বাস কর, তোর কাছে দয়া, করুণা, অনুগ্রহ, কৃপা ভিক্ষা করতে আমার লজ্জা করেছে। কতবার বলতে চেয়েছি, কিন্তু পারি নি। কে যেন গলাটা চেপে ধরে।

অমঙ্গল আশঙ্কায় পৃথার বুক কেমন করে। ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলল: বাগাড়ম্বর না করে হয়েছে কী, বল?

পৃথার মন তৈরীর জন্যেই একটু সময় দরকার ছিল। তাই, শূরসেন হেঁয়ালী করে বলল: তিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত পথিকের মতো ভাবছি, কোন পথে যাব আমি? এক পথ তোর দিকে গেছে, আর এক পথ গেছে কুন্তী ভোজের দিকে ঘুরে। আমার এখন উভয় সংকট। কার মন রাখি? আদরের মেয়ের মন রাখলে কুন্তীভোজ অসন্তুষ্ট হয়। আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। আমিও তার কাছে মিথ্যেবাদী হব। লোকে বলবে অকৃতজ্ঞ, প্রতারক। এখন কি করব? আমার প্রতিশ্রুতি, সম্ভ্রম, মর্যাদার কি হবে?

পৃথার বুকে অভিমানের সমুদ্র অপমানে অনাদরে উথলে উঠল। দুঃখে দু'চোখের পাতা জলে টলটল করতে লাগল। তীব্র জ্বালার উষ্ণ লু বইতে লাগল সারা শরীরে। কান দুটো রাগে, অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। শরীরে যে এত তাপ জমে ছিল, জানা ছিল না পৃথার। বেশ একটা উত্তেজনা নিয়ে প্রশ্ন করল: তোমার মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? কী সব যা তা বলছ? হঠাৎ এমন কি ঘটল যে তোমার মর্যাদা বিপন্ন? মিথ্যেবাদী হওয়ার মতো কি কাজ করেছ?

তোমার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? সম্ভ্রমহানির প্রশ্ন উঠছে কেন? তোমার সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে আর কেউ নয়, আমি একা দাঁড়িয়ে কেন? সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, শীগ্‌গিরি একটা অঘটন কিছু ঘটবে আমার জীবনে। একটা বাঁক নেবে।

সেই অবোধ রহস্যময় উদ্বেগের কোন মানে হয় না পৃথার। তবু তার বুক টাটাচ্ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিয়ে বলল: কী হয়েছে অকপটে বল। আমায় ভীষণ ভয় করছে। যদিও জানি, জীবনে যা ঘটে সবই আগে ঠিক করা থাকে। তবু—

শূরসেনের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে বলল: মানুষ কিছু করে না, শুধু কর্মফল ভোগ করে। এক অদৃশ্য হাতই সব নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সাধ্য কি তার নিয়ন্ত্রণ ভাঙে।

শূরসেনের কথায় পৃথার উদ্বেগ আরো বাড়ল। বিব্রত ভয়ে তার ভেতরটা শির শির করতে লাগল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: আসল কথা বলতে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? একটা অপরাধবোধে তুমি বারবার আমায় জিজ্ঞাসা থেকে সরে যাচ্ছ। তোমায় দ্বিধার জন্য আমার ভয় বাড়ছে। এক অশান্ত অস্থিরতা নিয়ে পৃথা উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

অদ্ভুত প্রত্যাশাভরা চোখে শূরসেন তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেশ এক স্বস্তি অনুভব করল। জানলার দিকে সরে গিয়ে পৃথার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল: কুন্তীভোজ বড় দুঃখী। অনেকগুলি বিয়ে করেও সন্তানের মুখ দেখতে পেল না। ওর প্রাণে সন্তানের স্নেহে ভরপুর। বাৎসল্যে বুক ভরে আছে। অথচ, তার একজনও দাবিদার নেই। ওরও কারো উপর দাবি করার কেউ নেই। বড় হতভাগা! বেচারার জন্যে কষ্ট হয় বড়। ওর উপর আমার অনেক সহানুভূতি আছে জেনেই ব্যর্থ জীবনের বেদনা, অতৃপ্তি, দুঃখ, হাহাকার, শূন্যতা নিয়ে, অনেক প্রত্যাশা করে আমার কাছে দৌড়ে এসেছে। ভিখেরির মতো যে চায় তাকে না বলে ফিরিয়ে দিতে বড় কষ্ট হলো। আত্মীয় এবং বন্ধু হয়ে তার কষ্টটুকু যদি না বুঝলাম তা-হলে কিসের বন্ধু? তাই তো অনায়াসে বলতে পারল সে:-শূর এ পৃথিবীতে আমার মতো হতভাগাদের কোন দাম নেই। সব নিরর্থক মনে হয়। কেন বেঁচে আছি, কার মধ্যে বেঁচে আছি, জানি না। পৃথিবীর সব মানুষই তার সন্তানদের মধ্যে বেঁচে থাকে। আমি কার মধ্যে বেঁচে থাকব? মানুষ তো একটা প্রত্যাশা নিয়ে চলে। লক্ষ্যে পৌঁছয়। কিন্তু আমার কে আছে? কি আছে? এখন কেমন ক্লান্তি লাগে। পৃথা, বসুদেব, শ্রুতশ্রবার মধ্যে আমি নতুন করে জীবন পেলাম। বেঁচে থাকার একটা নতুন মানে খুঁজে পেলাম।' বলার সময় নিশ্বাস ফেলল বড় করে। আমার মুগ্ধ দুচোখের দৃষ্টি ওর চোখের মধ্যে এমন করে এনে ফেলল যেন অন্যদিকে চোখ ঘোরাতে না পারি। বলল: সন্তানদের অনেক কিছু বাবার শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। সামান্য পরশে সমস্ত অনুভূতির মধ্যে গলে গলে পড়ে। সন্তান না হলেও এই অনুভূতি উপলব্ধি বাৎসল্যভাব সব মানুষের হয়। পরের ছেলে মেয়ে নিজের হয়ে যায়। এটা অনুভূতির ব্যাপার। তোমার ছেলে মেয়েদের সংস্পর্শে এসে আমার সেই

অনুভূতি হলো।' আমার হাত দুটো হঠাৎ তার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলল ঃ শূর বুকের মধ্যে বড় কষ্ট। আমার সব কষ্ট অবসান হয় তোর পৃথাকে যদি আমায় ভিক্ষা দিস। পৃথাকে আমি ভিক্ষা চাইছি। তোর তো আরো অনেক মেয়ে আছে, পৃথাকে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচা।"

শূরসেনের গলা কাঁপছিল। বলল ঃ সেই মুহূর্তে কি যে হলো আমার জানি না। একজন স্নেহবৎসল সন্তানহীন মানুষ কাঙালের মতো সন্তান ভিক্ষে করছে, আর আমার উপায় থাকতে নিষ্ঠুরের মতো তাকে 'না' করতে পারলাম না। 'না' উচ্চারণ করতে কষ্টে আমায় বুক ভেঙে গেল। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মনে মনে বলি, কোন বাবাই চিরদিন মেয়েকে ঘরে রাখতে পারে না। অন্যের ঘরে বধূ করে পাঠাতেই হয় তাকে। আমি না হয় কুন্তীভোজের গৃহে কনে করে পাঠালাম। সেখানে সে পরম যত্নে, আদরে থাকবে। স্নেহ-ভালোবাসা-মমতা অনেক বেশি পাবে।

পৃথা কথা বলতে পারল না। চুপ করে শুনল। রাগ কিংবা অভিমান হলো না। একটা অপমানবোধ বুকের ভেতর কাঁটার মতো বিঁধে রইল। স্নেহপরায়ণ পিতা প্রিয়তম কন্যাকে নিয়ে এমন একটা কাণ্ড করতে পারে পৃথা কষ্ট করেও ভাবতে পারে না। বিপন্ন বিস্ময়ে তার প্রস্তরীভূত অবস্থা।

অনেকক্ষণ পর গভীর একটা অস্বস্তিবোধ থেকে মৃদুস্বরে বলল ঃ শ্রুতশ্রবা আমার চেয়ে অনেক ছোট। তাঁকে তো দত্তক নিতে পারত। উত্তরাধিকারীর জন্যে লোকে পুত্র সন্তান দত্তক নেয়। কিন্তু মহারাজ কুন্তীভোজ বেছে বেছে আমাকে নির্বাচন করলেন কেন? ব্যাপারটা আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। তাঁর ইচ্ছে সমাদর করতে আমার নিজের বাবা মা'কে হারাব কেন?

অসহায়ভাবে শূরসেন তাকে বোঝানোর জন্য বলল ঃ এর ভেতর হারানোর কথা আসছে কেন? আরো একজন নতুন পিতা লাভ হলো সে কি কম কথা?

বাবা, আমি তোমার খেলার পুতুল নই। বাবা বলে, আমায় নিয়ে যা খুশি করতে পার না। আমার নিজের ইচ্ছে, পছন্দ, ভালোমন্দ বোধ হয়েছে। নিজের একটা ব্যক্তিসত্তা আছে। সম্পত্তির মতো যখন খুশি হাত বদল করবে, তাও আমি নই।

পাগল মেয়ে। তোর অমর্যাদা হওয়ার মতো কোন কাজ করেনি।

তুমি বিশ্বাসঘাতককতা করেছ। আমার সরল বিশ্বাস ভোঙ টুকরো টুকরো করেছ। নিষ্ঠুর। নিজের স্বার্থের চেয়ে তোমার কাছে বড় কিছু নেই।

পৃথা! চমকানো বিস্ময়ে ডাকল শূরসেন।

শান্ত নিরীহ মেয়েটির ভেতর সহসা এক বিষধর ফণা তুলে ধরল। অভিমানের বিষ উগরে দিল। বলল ঃ ভেবেছ, আমি কিছু জানি না। বড় রাজ্য স্থাপনের সংকল্প তোমার মনে, প্রাধান্যলাভের স্বপ্নে তুমি বিভোর। কী করলে শক্তি বৃদ্ধি হয় তার চিন্তায় দিনের বেশি সময় কাটাও। মুখে কিছু না বললেও আমি জানি, মগধের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে একই বংশোদ্ভূত রাজ্যগুলির সঙ্গে বিবাদ কলহ এবং বিরোধের উত্তাপ যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে পারস্পরিক বোঝা পড়ার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে কুন্তীভোজকে তোমার দরকার।

রাজ্যের তীব্র আর্থিক সংকট দূর করতে তার কাছে অর্থ ধার করছ। বিনিময়ে আমাকে দত্তক কন্যা করে পাঠাচ্ছ। ছিঃ আমাকে তুমি বিক্রী করে দিলে। আমার যে মন বলে একটা জিনিস আছে তার কথাটা একবারও মনে হয়নি। অথচ, আমার গর্ব ছিল, আমাকে তুমি বেশি করে অনুভব কর। কিন্তু আমাকে তুমি সম্মান দাও নি। একবারও আমার মতামত গ্রহণের চেষ্টা করনি। তোমার একার সিদ্ধান্তকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ। আমি যে তোমার সন্তানদের চেয়ে একটু আলাদা, একটু বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে আমাকে সহ্য করতে পারলে না তুমি?

শূরসেন পৃথার মুখে দিকে অপরাধীর মত্যো চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল: রাগের বশে তুমি যা বললে সব সত্য নয়। একদিন তোমার ভুল ভাঙবে। এখন আমার কোন কথা তোমার ভালো লাগবে না। আমিও সে চেষ্টা করব না। সংসারে যারাই ব্যতিক্রম হয় তাদের সব কিছুর জন্যে একটু বেশি মূল্য দিতে হয়। আমার সন্তানদের ভেতর তুমি আলাদা বলেই তোমাকে চিনে নিতে আমার কষ্ট হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্য কাউকে নয়। তোমার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়েছে। একে তুমি দোষ বলবে? কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যাকে পাঠাব তাকে তো বিশ্বস্ত হতে হবে। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন আস্থাবান ব্যক্তিকে মনে না পড়া যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী। তোমাকে কোনভাবে অপমান করেনি বরং সম্মানিত করার চেষ্টা করেছি। আমার উদ্দেশ্যকে অপব্যাখ্যা করলে তুমিও কষ্ট পাবে, আমিও বেদনা অনুভব করব। সন্তানদের মধ্যে আমি যে তোমার উপর বেশি নির্ভরশীল সে কথা বলে বোঝানোর দরকার আছে মনেও হয়নি। হলে, আগাম অনুমতি নিতে নিশ্চয়ই ভুল করতাম না।

পিতার কথাগুলো মন দিয়ে শুনল পৃথা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর থমথমে গম্ভীর গলায় বলল: ভুল তো হয়েছে। ভোজরাজ আমাকে দত্তক চাইলেন কেন জানতে চেয়েছ? তাঁর পুত্রহীনতার সংকটের আমি কী করতে পারি? সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বের সমস্যা কিংবা কুলরক্ষার উপায় মেয়ে হয়ে আমি কিভাবে সমাধান করব? সেবা, মমতা দিয়ে তাঁর সন্তানহীনতার দুঃখ, ব্যথা, জ্বালার উপশম করতে পারি মাত্র।

সেটা কি কম কথা?

শ্রুতশ্রবাও তো সে কাজ করতে পারতো। তা ছাড়া বয়সে আমার অনেক ছোট সে। আমার চেয়ে দীর্ঘদিন তাকে কাছে পেতেন। তার পক্ষে মানিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা আরো সহজ হতো।

আমিও সে কথা বলেছি। কিন্তু মেয়ে হয়ে ছেলের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য করতে যেভাবে তুমি পার শ্রুতশ্রবা সেভাবে পারবে না বলেই জহুরির মতো কুন্তীভোজ তোমাকেই চিনে নিয়েছে। এতে তোমার গর্ববোধ করা উচিত।

মাথা হেঁট করে বললাম: গর্ব হওয়া তো দূরের কথা অপমানে ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কেমন একটা ভয়ও হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে। জীবনের বাঁক নেবে।

কুন্তীভোজের গৃহে আমি আর পৃথা নই। কুন্তী। অন্য এক নবীন বালিকা কিশোরী। আমার গোত্রান্তর হলো। শুরু হলো নতুন জীবন নতুনভাবে। এখানে আমি অত্যন্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য সচেতন এক কিশোরী।

পৃথা মরে কুন্তী হলো টেরও পেলাম না। একদিনের জন্যে দুঃখ হয়নি। শূরসেনের বড় আদরের নামটা হারিয়ে গেল আমার জীবনে। এখানে শুধু কুন্তী আমি। এটাই আমার নাম এবং পরিচয়। এই নামেই আমি পাণ্ডুর মহিষী। পঞ্চ-পাণ্ডবের গর্বিতা জননী ঃ রাজমাতা কুন্তী।

রাজমাতা হওয়ার পথটা মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক অপমান, অনাদর, অবহেলার বিঘ্ন সংকুল উপত্যকার এলাকা পেরিয়ে অনেক দুঃখ, ভয়, যন্ত্রণার পাহাড়ের গা ঘেঁষে বয়ে এসে তবেই আমি রাজমাতা হয়েছি। এটা আমার আক্ষেপ নয়, আমার গর্ব। জয়ের গর্ব।

তবু সে কথা মনে হলে, মন খারাপ করা আর্তিতে বুকখানা টাটায়। কোথায় যেন একটা বিষাদ জমা হয়ে আছে। রাজমাতার ভাবভঙ্গী থাকে না তখন। বুকের গহনে রক্ত ক্ষরণ হয়। নিজেকে বড় দীন এবং ছোট মনে হয়। কৃতকর্মের জন্যে নিজেকে দায়ী করি। দায়ী থাকি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। বাণপ্রস্থে সেই প্রায়শ্চিত্তই করছি। কিন্তু সময়ের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে না পারলে প্রায়শ্চিত্ত যে কত বিড়ম্বনাকর হয় আমার চেয়ে বেশি কে জানে?

বাণপ্রস্থেব দিনগুলের বড় নির্জন। বিষণ্ণ একাকীত্বের মধ্যে কাটে সর্বক্ষণ। মানবহীন দেশে নিস্পৃহ নিরাসক্ত নির্জনতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এখানে মানুষ বলতে তো চারজন—আমি, দেবর, ভাসুর ধৃতরাষ্ট্র এবং বড় জা গান্ধারী। চার-জনে যেন চার দ্বীপের বাসিন্দা। দেখাশোনা হয় কিন্তু কথাবার্তা হয় খুব কম। সারাদিন বড় জো দু চারটে কথা বলার চেষ্টা করি। তাও প্রয়োজনের কথা। অনন্ত সময় চলে যায় মুখ বুজে। নির্জন বন থেকে বৌ কথা কও, চোখ গেল-পাখি ডাকে। বাঁদর হুপ হুপ করে এক ডাল থেকে আব এক ডালে লাফ দিয়ে যায়। পাশ দিয়ে ঝরণা ঝর ঝর করে বয়ে চলেছে তো চলেছেই। ওর শব্দ কখনো থেমে নেই। কিন্তু এ শব্দগুলো, ভাষাগুলো কোনোটা মানুষের সঙ্গী নয়। বরং তার সঙ্গহীনতাকে ব্যঙ্গ করে, পাতারা ফিসফিস করে বলতে থাকে তুমি একলা, তুমি একলা।

আমি প্রত্যেকদিন বুঝতে পারি কুন্তীভোজের গৃহে পৃথা যদি কুন্তী না

হতো তাহলে অন্যভাবে জীবনটা সুরু করতে পারত। দিনগুলো হয়তো প্রত্যেক মেয়ের মতো পুনরাবৃত্তি করে কাটত। বিয়ে হতো কোন রাজপুত্রের সঙ্গে। রাজমহিষী হতাম। রাজমাতা হতাম। তারপর আর কি? আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়লো হতো। অদৃষ্ট আমার জীবনের ফাঁকির বাঁশি বাজতে দেবে না বলেই এক অন্য জীবনের মধ্যে টেনে এনেছে। আমার সাধ্য কি তার স্রোতে বাধা দেই?

এটা আমার জীবনের শুধু একটা ঘটনা। বৃহৎ জীবনের একটা খণ্ডাংশ মাত্র। তবু জীবনের কথা প্রসঙ্গে সেটুক না এসে পারে না। কারণ তাকে বাদ দিয়ে তো আমি নই। কুন্তী ভোজের গৃহে একসঙ্গে যে কটা বছর কাটিয়েছি স্নেহে, সখ্যে মাধুর্যে তা পূর্ণ। তার মধ্যে কোন ফাঁক ও ফাঁকি ছিল না। আমার জীবন কাহিনীর সূচনা পরিপূর্ণ গৌরবে ভরে দিয়েছিল। যদি কেউ জিগ্যেস করে কি তুমি পাওনি? কোনটা পাওনি কুন্তী ভোজের গৃহে? তা হলে আমাকে বলতেই হবে অভিযোগ করার মতো কিছু নেই। এখানে যা সব ঘটনা তা মারাত্মক কিছু নয়, তা নিয়ে জীবনের গল্প হয় না। তবু আমার অন্তর্জীবন প্রবাহের গতিটা চিহ্নিত করতে তার উল্লেখ করতে হয়। কারণ কোন ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থ রূপ নয়। যে ভালোবাসা মানুষের প্রাণে দীপ জেবলে দেয়, চারপাশে সৌরভে ভরে দেয়, অমরাবতীতে পেঁছে দেয়, সেই ভালোবাসারই এমন রূপ আছে যা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, নরক যন্ত্রণায় কষ্ট দেয়। অথচ বাইরে থেকে দেখতে উভয়ের রূপ একই; যেন দুই যমজ ভাইবোন—একজন প্রাণ দেয়, অন্যজন হরণ করে।

এরকম নানা ঘটনার অনুভূতির ভেতর জীবন তরীখানা নিয়ে আমি ভেসে বেড়িয়েছি। একটুও শান্তি পায়নি। কুন্তী ভোজের গৃহে হঠাৎ বদরাগী মুনি দুর্বাসা, রাজার অতিথি হয়ে এসে আমার শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে একটি লোষ্ট্রপাত করে যে তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করল তার আবর্ত থেকে কোনদিন মুক্তি পাইনি। এই বলয়ের ভেতর অন্য কাউকে নয় চিরকাল আমাকেই খুঁজেছি। আমার সত্তার যে অংশ নিজেকে কোনদিন কারো কাছে অভিব্যক্ত করতে পারেনি তারই বেদনা।

সে বেদনার স্রষ্টা কে? প্রশ্নটা সারা জীবন ধরে আমার মনের মধ্যে একা বয়ে বেড়িয়েছি। কারণ সব সমাধান তো আর উত্তরের দ্বারা হয় না। জীবনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর একা একা দিতে হয়। কারণ সব কথা তো অন্যকে বুঝিয়ে বলার নয়। সেটা বলতে গেলে নিজেকে ছোট লাগবে ভীষণ। আমার প্রশ্নের উত্তরটা বোধহয় সেরকম। আমি যা বলি না কেন, আমাকে বোঝার গরজ নেই কারো। তাই আমার জিজ্ঞাসার সঙ্গে এক ধরনের অপ্রকাশ্য নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশানো উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ এবং ভয় মিশে ছিল।

এখন সে ভয় নেই তার। কিন্তু একটা লজ্জা সংকোচ রয়ে গেছে। সেটা বোধ হয় কোনদিই কাটবে না। কারণ আমি রমণী। রমণীর সব লজ্জা তার রক্ত মাংসের দেহ ঘিরে। পুরুষের যেখানে ঢাকাঢাকির কিছু নেই, সেখানে মানুষের সমাজ নারীকে বেশি করে আদৃত করছে। অনেক বাধা-নিষেধ আরোপ

করেছে। সংস্কার বিশ্বাসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে দেহ চেতনা, দেহই নারীর সম্পত্তি। এত মূল্যবান সম্পত্তি যে সর্বক্ষণ পাহারা দিতে হয়। দেহের শুচিতা গেলে সম্পত্তি হারানোর মতো নারীর অপরাধ রাখার জায়গা থাকে না যেন। দোষটা যেন তার একার। বিশ্বাসভঙ্গের কষ্ট তাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দেয়। নিজেকে বড় দীন অসহায় এবং বিপন্ন মনে হয় তখন। দেহের শুচিতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব তার মধ্যে এক শ্রেণীর মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এই তীব্র দেহ সচেতনতাই তার অহং। এই অহং নিয়ে একটিমাত্র পুরুষকে বরণ করে জীবনে। পুরুষের শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য দৈহিক শুচিতা এবং সংযম রক্ষার দায়িত্ব একা নারীকেই বহন করতে হয়। এই বোধ ও অনুভূতির ভেতর বড় হওয়ার জন্যে একে মেনে নেওয়ার বাড়াবাড়ি সব মেয়ের ভেতর আছে। আমার রক্ত স্রোতেও সেই সংস্কারের ধারা প্রবাহমান। একদিন ঋষি দুর্বাসা এসে ওলোট-পালোট করে দিল সব। আমার জীবনে সে এক ধূমকেতু।

বহুকাল পরে ঋষির মুখখানি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে তাঁকে দেখছিলাম। বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির ঔজ্জ্বল্য এবং স্বপ্নালু দু'চোখের চাহনিতে এমন একটা নিবিড় ঘুম লাগার ভাব ছিল যা তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফেতে ঢাকা পড়েনি। বরং অপরূপ শ্রীময় করেছিল। একটা দিব্যভাব তাঁর মুখ, চোখ শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল যেন। আপনা থেকে মনটা শ্রদ্ধায় নুয়ে এল। একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ কাঁপিয়ে দিয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ।

বাণপ্রস্থের কুটীর থেকে আমার নব্বই বছর আগের জীবনকে তেমনি দেখতে পাচ্ছি। আলপনা দেয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে দুর্বাসা। কুন্তী ভোজের রাণীরা তাঁর পরিচর্যায়, অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। রাণীদের কেউ দুধ দিয়ে হাত পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ পবিত্র গঙ্গাজলে তা পুনরায় পরিষ্কার করছে, কেউ চুল দিয়ে ভিজে পা-হাত মুছিয়ে দিচ্ছে। সব জলটুকু গা থেকে নিঃশেষে শুষে না নেয়া পর্যন্ত নরম চুল বুলিয়ে তা মুছে নেয়া চলতে লাগল। তারপর রাজপুরোহিত উদাত্ত কণ্ঠে ঋষির আগমনের এবং গুণের প্রশস্তি বাক্য পাঠ করে তাঁকে অভিনন্দিত করল। কুন্তীভোজ গরদের গাত্রবাস দিয়ে তাঁর খালি গা ঢেকে দিলো। দুর্বাসাকে মধ্যমণি করে রাজা এবং রাজমহিষী পথ দেখিয়ে অতিথি-শালার দিকে এগিয়ে চলল।

দুর্বাসাকে এত সমাদর করার কি আছে? ওই ঋষির ক্ষমতা কতটুকু? একজন রাজার ভয় পাওয়ার মতো কী আছে তাঁর? প্রশ্নগুলো কুন্তীভোজকেই করলাম। আমার কৌতূহলিতে প্রশ্ন কুন্তীভোজকে বেশ একটু অস্বস্তিতে ফেলেছিল। মুখ দেখেই তা টের পেলাম। কয়েকটা মুহূর্তে তার দ্বিধায় কাটল। অপ্রস্তুতভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল: রাজার পুত্রহীনতা অপরাধ। ব্রাহ্মণ মুনি ঋষিদের আশীর্বাদ, অনুগ্রহ পেলে পুত্র লাভ হয়। তা-ছাড়া এঁরা বড় স্পর্শকাতর। একটু সেবা, যত্ন, ভালো আতিথ্য পেলেই খুশি। আর না পেলে চটে যান। সাধারণ মানুষ এঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে এবং মানেও খুব। এদের অনুরাগ মূলধন করে এঁরা অনেক কিছু করতে পারেন। রাজ্যে অশান্তি,

বিশৃঙ্খলা বাঁধিয়ে নানা উৎপাত ঘটিয়ে রাজার ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। তাই কোন রাজা এঁদের চটাতে চায় না। এঁর সেবা যত্নের সব ভার তোমাকে দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। তুমি বুদ্ধিমতী। কখন কোন কাজটা করা দরকার এবং কি করলে ভালো হয়, তুমি যেমন বোঝ, এমনটা আমিও পারি না।

মেয়ে মানুষের মন তো প্রশংসায় গলে যায়। ভেতরটা প্রসন্ন হয়ে উঠে। প্রশ্ন ফুরিয়ে যায়। বিগলিত খুশিতে ধন্য হয়ে বলি, তোমার বিশ্বাসের অসম্মান হয় এমন কিছু করব না।

ভোজরাজ প্রসন্নচিত্তে বলল : আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

ঢোঁক গিলে বললাম, যাঁর সেবার দায়িত্ব পেলাম, সেই মানুষটির স্বভাব, আচরণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু পূর্ব ধারণা থাকলে প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নেয়ার কাজটা সহজ হয়।

ভোজরাজ চমকানো বিস্ময়ে বলল : ঠিক বলেছ। ঋষিরা কোন না কোন রাজার চরগিরি করে। দুর্বাসা মগধ সম্রাট জরাসন্ধের একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। জরাসন্ধও তাঁর খুব অনুগত এবং বাধ্য। দুর্বাসার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের গতি-বিধি, চিন্তাধারার উপর সংগোপনে নজর রাখার একটা কার্যকরী সংস্থা তৈরী করেছেন। মুনি ঋষিদের সাহায্যে জরাসন্ধ অন্য রাজ্যের গোপন কার্যপূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। দুর্বাসার আগমন তাই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আতিথ্য গ্রহণ করতে তিনি আসেননি, যাদব রাজ্যগুলির মধ্যে বংশানুক্রমিক যে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সংঘাত নিরন্তর লেগে আছে তার হিসাব নিকাশ করতে এসেছেন। মগধ সম্রাট যাদবদের অন্তর্কলহ এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্র-সারণের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর আগ্রাসী রাজনীতি প্রতিরোধ করতে যাদবরাজ্যগুলিকে জোটবদ্ধ করে প্রজাতান্ত্রিক যাদব সমবায় রাজ্যগঠনের যে প্রয়াস আমি ও শূরসেন করছি, তার বিঘ্ন ঘটাতে দুর্বাসাকে পাঠানো হয়েছে। কোপন স্বভাবের এই ঋষিকে তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ। কেবল তোমার উপরেই যা একটু ভরসা। তাঁকে না চটিয়ে কি উপায়ে আমাদের স্বার্থ নিরাপদ করা যেতে পারে আগে থেকে তার বাধাধরা কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দুর্বাসার মনের গতি-প্রকৃতি বুঝে স্থির করতে হবে। দুর্বাসার সঙ্গে আমি কোন সংঘাত চাই না। প্রতিবাদ অন্তরে গোপন রেখে কৌশলে ঋষির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার সব দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম।

সেদিন সারারাত ভালো ঘুম হলো না আমার। নানা চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করেছি শুধু। ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। তখনও বিনিদ্র রজনীর জটিল চিন্তার ঘোর কাটেনি। দেহ মনে ক্লান্তি, অবসাদ জড়িয়ে আছে। সরোবরে গা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় পূজোয় বসলাম। তবু মনটা শান্ত হলো না। পূজান্তে একা একা উদ্যানে পায়চারি করছি, আর ভোজরাজের কথাগুলো মনে মনে পর্যা-লোচনা করেছি।

বারংবার মনে হতে লাগল নবীনা কিশোরী থেকে হঠাৎ এক দায়িত্বশীল রমণী

হয়ে গেছি। আকাশ জোড়া বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত হতে লাগল আমার ভেতরটা আনন্দে, আবেগে আশঙ্কায়। বেশ বুঝতে পারছিলাম, দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় আমার মধ্যে কী সব ঘটে যাচ্ছে। আর আমি ঐখানে কান পেতে আছি—গভীরে, খুব গভীর অভ্যন্তরে কে যেন অস্ফুট স্বরে কথা বলছে।

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে পেছন থেকে ভোজরাজ উচ্ছল গলায় ডাকল: পুত্রী। উদ্যানে একা কী করছ? এ সময় তো কখনো তোমায় দেখি না। কী হয়েছে? তোমার? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি।

লাজুক অপ্রতিভতায় সহস একটু হেসে ফেলি। বললাম: দেখা হয়ে ভালোই হলো। কতকগুলো জরুরী কথা বলার আছে।

বেশ তো বল।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল কথাগুলো গুছোতে। বয়স্ক ব্যক্তির মতো বললাম দুর্বাসাকে প্রীত করে জরাসন্ধকে তোষণ করার নীতি আমাদের অসহায়তাকে প্রকাশ করবে। কারণ জরাসন্ধ কংসকে আশ্রয় করে যাদব রাজ্য গ্রাস করার ফন্দী এঁটেছে। এতে যদুকুলোদ্ভব সব যাদবেরাই অসন্তুষ্ট। তাদের ক্ষোভ. বিদ্রোহ গোপন নেই। বিশেষ করে ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। দুর্বাসা এসেছেন ভোজরাজ কুন্তীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ সরেজমিন করতে। এ অবস্থায় শুধু আতিথ্য ও সেবা দিয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করে কর্তব্যচ্যুত করা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাঁর তো শ্যেনদৃষ্টি থাকবে তুমি কতখানি জরাসন্ধের প্রতিপক্ষ, গোপনে কতটা শক্তি সংগঠিত করছ? যাদবদের উপর তোমার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কতটুকু তার উপর। বাবা তুমি আমাকে বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছ। বৃহস্পতির রাজনীতি শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করনি। তবু মনে হচ্ছে, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছ।

বাঁকা হাসিতে ভোজরাজের ওষ্ঠাধার বঙ্কিম হলো। বলল: পুত্রী রাজনীতিতে স্বার্থরক্ষাই মূল কথা। স্বার্থেই বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। কার স্বার্থ কীভাবে রক্ষা হয় তার উপরে গড়ে উঠে সন্ধির শর্ত। সেও সাময়িক। স্বার্থরক্ষা হওয়ার পরে তার কানাকড়ি দাম নেই। জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করতে হয়। এখানে জেতাটাই বড় কথা। কীভাবে জিতলে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। পুত্রী রাজনীতিতে পর্যবেক্ষণ যার যত তীক্ষ্ন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যার বেশি, সেই জেতে। দুর্বাসার সঙ্গে আমাদের লড়াইটা কৌশলগত। কারণ, তিনি শত্রুপক্ষের লোক। তবুও ঋষি বলে তাঁর গন্তব্যের উপর কার্যের উপর কোনরকম বিধিনিষেধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ নীতি আরোপ করতে পারি না। তাঁকে বহিস্কার করা কিংবা বন্দী করাও শিষ্টাচার নয়। রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁরা ঈশ্বরের সাধক, মোক্ষাভিলাষী সাধু-সন্ত। ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর এঁদের প্রভাব কত গভীর ব্যাপক তা জানা না থাকলে রাজার রাজকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এবং এঁদের প্রভাবকে যে সুসমন্বয় করতে জানে তার উন্নতি, সাফল্য এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারে না। বনবাসী রামচন্দ্রের সাফল্যের মূলে আছে মুনি-ঋষির সহযোগিতা।

ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং তার গতি প্রকৃতির নাড়ী নক্ষত্র সম্পর্কে ভোজরাজের সূক্ষ্মজ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করে রাখল। সুদীর্ঘকালধরে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করতে করতে তাঁর চুল পেকেছে, বুদ্ধিও পরিপক্ক হয়েছে, এক কালে কুমার হৃদয়ে অর্ধস্ফুট উত্তপ্ত আদর্শ ক্রমে শাসন শিল্পে পরিণত রূপ পেয়েছে। এ জন্যেই হয়তো জনক শূরসেন এই মানুষটির সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আঁতাত গড়ে তুলেছে। হঠাৎ-ই কথাগুলো বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল আমার মস্তিষ্কের মধ্যে। কয়েকটা মুহূর্ত আমিও অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। মুগ্ধতার ভাবটা কেটে গেলে বললামঃ তোমার বক্তব্য সুন্দর। কিন্তু শুধু বক্তৃতা দিয়ে তো কৌশল প্রয়োগ করা যায় না। কঠিন বাস্তবে কত ধরণের সমস্যা, বক্তৃতায় তাকে আঁটে না। প্রতিমুহূর্তে নিত্য-নতুন সিদ্ধান্ত পাল্টে পাল্টে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। ঋষি দুর্বাসার মতো কঠোর স্বভাবের মানুষকে বশ করা, সেবায় পরিতুষ্ট করে নিবৃত্ত করা বক্তৃতাতেই সম্ভব, কাজে নয়। খাতির যত্ন, সেবা পাওয়াটা অতিথি তাঁর ন্যায্য পাওনা মনে করে। ত্রুটিতে অপরাধ ধরে।

তোমার কথাগুলো ফেলে দেয়ার নয়। কিন্তু যারা সংঘাতের জন্যে তৈরী, যাদের নীতি হলো সংঘাত বাড়ানো তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলাই প্রকৃষ্ট রাজনীতি। প্রতিপক্ষকে মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিতে নেই।

আমিও জানি। মহর্ষি বৃহস্পতি বলেছেন, সে অস্ত্র যদি কেড়ে নিতে না পার, অন্তত তাকে অকেজো করে দিও। কিন্তু কি ভাবে? পদ্ধতি স্থির করা আর তার সঠিক রূপায়ণই সমস্যা।

মুনি ঋষিরা খুবই স্পর্শ কাতর। একটু সেবা যত্ন, আদর ভালবাসা শ্রদ্ধা পেলেই প্রসন্ন হয়ে যায়। স্পর্শকাতর মনের স্পন্দনটি কান পেতে সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা শোনে, অনুভব করে তারা খুব সহজেই এঁদের রুক্ষ বুকের মরুভূমিতে মানবিক অনুভূতির মরুদ্যান রচনা করতে পারে।

বিজ্ঞের মতো আমি হেসেছিলাম। আমার সে হাসি জীবন রহস্যকে জানার কৌতুকে বর্তুল হয়েছিল। বললাম: অনুমান এবং কল্পনা কখনো সত্য হয় না। বাস্তব বড় কঠিন এবং রূঢ়। জনক শূরসেনের মুখেই এই ঋষির ক্রোধ সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা শুনলে তুমিও অস্থির বোধ করবে। বৃষ্ণি-বংশের রাজা নারায়ণের গৃহে একদিন ভর-দুপুরে দুর্বাসা হাজির। তাড়াহুড়ো করে তাঁর আহারের ব্যবস্থা হলো। আহার করতে গিয়ে তপ্ত অন্ন ব্যঞ্জনে তাঁর হাত পুড়ে গেল। তাতেই ঋষি ক্ষেপে গিয়ে রাজার বুকে পদাঘাত করলেন। গোষ্ঠী কোন্দলে বিভক্ত এবং সমর শক্তিতে দুর্বল রাজা প্রতাপশালী মগধ সম্রাটের কথা বিবেচনা করে অসম্মান, অপমান বুক পেতে গ্রহণ করলেন। বুঝতেই পারছ কুচুটে স্বভাবের এই মানুষটা হৃদয় বলে কিছু নেই। দম্ভে, অহংকারে স্ফীত হয়ে শুধু সংঘাত সৃষ্টিই এঁর উদ্দেশ্য। দুর্বাসা ভালো করেই জানে প্রতিপক্ষ যদি তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়, মন্দ আচরণ করে তা-হলে তার উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেবেন।

কৌতুকহাস্যে ভোজরাজের মুখ কোমল হলো। চোখের চাহনিতে জীবন রহস্য বোঝার কৌতুক। বললেনঃ ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বনের অবাধ্য হিংস্র

পশুকেও স্নেহ ভালোবাসা, মমতা দিয়ে পোষ মানানো যায়, আর একজন বদ মেজাজী মানুষকে বশীভূত করা যায় না ; আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাসযোগ্য-হয়ে উঠার উপর নির্ভর করে চিত্তজয়ের সাফল্য। ভালোবাসা মমতা, দরদ চিত্তজয়ের মন্ত্র। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেতে হয়। বিনা হৃদয়ে, হৃদয় পাওয়া যায় কোথায় ? বেশির ভাগ রাজাই দাস-দাসী দিয়ে অতিথির পরিচর্যা ও সেবা করে থাকে। মুনি ঋষিরা তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে, তাঁদের বুভুক্ষিত অন্তরটা গৃহী মানুষের সংস্পর্শে ভরে উঠে না। প্রত্যাশা অপূরিত থেকে যায়। কেউ কেউ এই দূরত্বে অসহিষ্ণু বোধ করে। ঋষি দুর্বাসা সেই প্রকৃতির মানুষ। জরাসন্ধ যদি নিজের স্বার্থে ও কার্যে তাঁকে ব্যবহার করতে পারে তা-হলে অন্যেরা তাঁকে পারল না কেন ? এই প্রশ্নটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। হয়তো একটা গভীর পারিবারিক মেলামেশা এবং আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে ঋষির মন ও প্রকৃতি নমনীয় হতে পারে। প্রত্যাশা পূরণ হলে অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ থাকে না। বেশি ভাগ মানুষ সেটা বোঝে না কিনা—তাই শেষ রক্ষা করতে পারে না তারা। আমার এই উপলব্ধির কূট প্রয়োগ এবং সফল রূপায়ণ তোমার কর্মকুশলতা এবং চাতুরীর উপর নির্ভর করছে। ভোজরাজ্যের ভাগ্য তোমার হাতে অর্পণ করলাম।

বিবর্ণ ভয়ে মুখখানা আমার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললাম ঃ এ কাজের যোগ্য কিনা নিজেও জানি না। তা-ছাড়া আমি মেয়ে। ভালো করে রাজনীতি বুঝি না। পুঁথিগত বিদ্যে আর শেখা বুলি দিয়ে তর্ক করে হাততালি পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে তা দিয়ে কতখানি স্বার্থ নিরাপদ করা যায় বুঝি না। রাজনীতিতে এমন অনেক কিছু ঘটে যায় যা না ঘটলে মানুষের জীবন ও ইতিহাস এমন দুর্ঘটনাবহুল হতো না। আমি সামান্য বালিকা। জটিল মানব চরিত্রের কতটুকু বুঝি ? আমার অভিজ্ঞতাই বা কি ? কোন ভরসায় আমাকে এত বড় দায়িত্ব দিচ্ছ ? আমার ভয় করছে ? দোহাই, এত বড় শাস্তি দিও না।

তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। আমার কোন পুত্র নেই। তোমাকে পুত্রের উপযুক্ত করে শিক্ষা-দীক্ষায় তৈরী করেছি—সে কি ভয় পাওয়ার জন্যে ? মেয়ে বলে নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছ না। কিন্তু একটা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বুদ্ধি এবং যোগ্যতার কোন তফাৎ নেই। দায়িত্ব অর্পণ না করে মেয়েদের আমরা অকেজো করে রেখেছি। অযোগ্য ভাবতে তো তাদের আমরা শিখিয়েছি। তাই, আত্মবিশ্বাসে মেয়েরা বড় দুর্বল। দায়িত্ব নেয়ার চেয়ে তাদের ভয় অভিযোগের, ব্যর্থ হওয়ার লজ্জার। একজন ছেলের এই ধরনের সংকোচ দুর্লভ ঘটনা। এক্ষেত্রে সাহসই সব। ছেলেদের চেয়ে তুমি কম কি সে ? বাস্তবে মেয়েরা চিরকাল পুরুষদের চেয়ে বেশি দায়িত্বপূর্ণ। সংসারের সন্তানের সব দায়িত্ব তো তারা বেশি পালন করে আসছে। সেখানে তাদের পারদর্শিতা, কুশলতার কোন তুলনাই হয় না। তা-হলে নিজেকে অযোগ্য ভাবছ কেন ? একজন জংলী রমণী বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করছে। সেও শিকার করছে, পশুর মাংসকেও কেড়ে খাচ্ছে। সবটা মনের ব্যাপার। নিজের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। মন শক্ত হলে

ভয়ও দূর হয়ে যায়।

আমি সামান্যা রমণী। আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আস্থা অর্জনের কোন কাজ আমি করিনি।

সে পরীক্ষার সুযোগ তো আসেনি। তাই কী পার, আর পার না তা তুমি নিজেও জান না। যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোন পরীক্ষাই তোমার হয়নি। আমার বিশ্বাসটা একবার তোমাকে দিয়ে বাজাতে চাই।

পরীক্ষা দেয়ার দুঃসাহস আমার নেই। আগুন নিয়ে খেলা করতে পারব না।

ভোজরাজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ এদেশের অন্ধকার আকাশে তুমি একমাত্র তারকা। আমার আশা, ভরসা সব। যে কোন দামে, যে কোন প্রকারে যোগ্যতার পরীক্ষায় তোমাকে বসতে হবে। হার-জিত ভাগ্যের খেলা। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানুষ তার স্খলন, পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল ভ্রান্তি নিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ। সব কিছুর ভেতর দিয়ে না গেলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ভুল করলে মানুষ অভিজ্ঞ হয়। অভিজ্ঞতার জন্যে অবশ্যই দাম দিতে হয়। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠকে শেখে।

ভোজরাজের আহ্বানের মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে, না করার ক্ষমতা ছিল না আমার। কর্তব্যের বোঝা চিরকাল আমার মতো মেয়েদেরই জন্যে। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিরুপায় হয়ে মনে মনে বলি—সুখ-দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, সফল-অসফল, জয়-পরাজয় যাই উপস্থিত হোক নিঃশব্দে, নির্লিপ্তভাবে মেনে নিয়ে অবিচলিত থাকি যেন।

আমি ঠকে শিখেছিলাম। কথাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুকের গভীর থেকে উঠে এল। মনের ভেতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে। কিন্তু তার কোন অনুভূতি নেই আমার মধ্যে। অবচেতনের গভীর সেই স্মৃতি নির্বাসন দিয়েছি। তবু কী বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি।

আড়চোখে দুর্বাসাকে দেখছি। নিবিড় ঘুম পাওয়া দুটি চোখের মতো তাঁর চাহনি। স্বপ্ন জমে আছে যেন। স্বপ্নালু চোখের উপর বাঁকা ধনুকের মতো দু'খানি ভুরুর রেখা ছাড়া মুখের আর কিছু দেখছি না। দাড়ি গোঁফ ভর্তি গালের ফাঁক দিয়ে মুখের যে অংশটা বেরিয়ে থাকে সেখানকার

রেখাগুলোও আমার চোখে পড়ছে না। স্বপ্নালু দুটি চোখের মায়াবী আকর্ষণ থেকে অবুঝ দৃষ্টিকে কিছুতে সরিয়ে নিতে পারলাম না। দুর্লভ অপার্থিব দৃষ্টির মুগ্ধতা আমার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। কী এক অনির্বচনীয় প্রাপ্তিতে মন ভরে উঠল।

হঠাৎ ভোজরাজের কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙল। মহার্ষ আমার কন্যা কুন্তী। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ দাঁড়িয়ে কেন? প্রণাম কর।

যন্ত্রবৎ ভোজরাজের আদেশ পালন করলাম। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেছি। আমার অস্বাভাবিকতা ভোজরাজের নজর এড়াল না। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখে ভর্ৎসনা নেই, তিরস্কারও না। আছে শুধু জিজ্ঞাসা আর উদ্বিগ্ন অসহায়তা।

গভীরে খুব গভীরে জন্মান্তরের মতো বিচ্ছিন্ন অথচ যুক্ত আমার নানা রঙের দিনগুলো জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলো অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেলেও তার স্মৃতি একটুও ঝাপসা হয়নি। রঙরেখা অটুট আছে তার। এসব আমি ভুলি কি করে? আমার জীবনের সমস্ত ভুলভ্রান্তি, অপরাধ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সব নিয়ে আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি নিজেকে। লুকোনোর কোন চেষ্টা আমি করব না। আমার আমিকে উজার করে দেখাতে চাই কালান্তরের প্রেক্ষাপটে। আমি প্রার্থনা করছি যদি কোথাও কেউ থাকে আমার ভাগ্য নিয়ন্তা তবে এই অন্তবর্তী সময়টা পার করে নিয়ে চল ভোজরাজ্যে।

জীবন রহস্য বোঝার বয়স হয়েছে তখন আমার। যৌবনের ঢল নেমেছে দেহে। দিন দিন সুন্দর হচ্ছি দেখতে। দর্পনের সামনে দাঁড়ালে চোখ ফেরাতে পারি না। নেশার মতো চেয়ে থাকি। বড় বিস্ময় লাগে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। কত সব অদ্ভুত প্রশ্ন, কৌতূহল, আকাঙ্ক্ষা আগুনের ফুলকির মতো রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। কজ্জলিত দুই আঁখির তারায়, দৃষ্টিতে যৌবনের চপলতা, অধরে উচ্ছলিত হাসির নির্ঝর। উদ্ধত দুটি পয়োধর মদগর্বিত যৌবনের দুটি দুর্গ যেন। আমার পল্লবিত যৌবনের গর্ব। আমার নারীত্বের শোভা। দেহবল্লরীর সুধাগন্ধে আমার প্রাণমন আকুল। এ যেন নিজেকে নতুন করে আবিস্কার করছি আর প্রতিমুহূর্তে নতুন হয়ে উঠছি। দেহের সৌন্দর্য নারীকে বিকশিত করে। তাঁর সব রূপই দেহে পোশাকে, আভরণে, অলঙ্করণে, খুশিতে, ভালোলাগায়, আনন্দে মাখামাখি হয়ে আছে যেন। প্রকৃতির রূপ পাহাড়, অরণ্য, প্রান্তর, দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশ, নদীনালা বিধৌত পল্লীর শোভা দেখলে যেমন খুশি হয় তেমনি আমাকে দেখে দুর্বাসার যে ধরনের খুশি হয় তার গভীরতর অর্থ বুঝতে ভুল হয় না কোন মেয়ের সে যে বয়সেরই হোক না কেন। খুশিতে আমার বুক ফুলে উঠে। তখন সারা শরীর গান গেয়ে উঠে। মম যৌবন নিকুঞ্জ পবনে গাহে পাখি গান।

দুর্বাসা আমার আতিশয্যে, আতিথ্যে, আপ্যায়নে, সান্নিধ্যে এত বেশি খুশি হতেন যে তাঁর কাছ থেকে একটু সরে থাকার উপায় ছিল না। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লেগে থাকতাম। সেবা, শুশ্রূষা ছাড়াও আহার বিহারেও আমাকে সঙ্গ

দিতে হয়। আহারের ব্যবস্থা, পুজোর আহ্নিকের বন্দোবস্ত সেও করতে হয় আমায়। অন্য কেউ করলে ঋষি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। অভিশাপের ভয় দেখাতেন। শাপের ভয়ে পরিচারিকারা ঋষির ঘরে পর্যন্ত ঢুকতো না। এড়িয়ে চলত তাঁকে। বাধ্য হয়ে আমাকেই ঝক্কি সামলাতে হতো। রাগের বশে যদি কোন শাপ-মন্ত দেয়, তাই না করতাম না। আশ্চর্য! সংসারে মায়া, মোহ, স্নেহ-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে যে মানুষ সিদ্ধ যোগী, পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন সেই মানুষটা একেবারে শিশুর মতো। লোকের কাছে খ্যাপা দুর্বাসা, কিন্তু তাঁর ভেতর কোন খ্যাপামি তো কোনদিন দেখি না। শিশু যেমন জননীর কাছে আশ্রয় নেয় তেমনি আমি তাঁর আশ্রয়, তাঁর অবলম্বন। বিস্ময় লাগতো বাইরে যে মানুষটা এত কঠিন, ভেতরে তিনি এত দুর্বল, এত নরম। সেই বয়সে প্রথম অনুভব করলাম বাইরের অবলম্বনগুলো যখন ঘুচে যায় তখন শিশুর মতো আশ্রয় নেয় নারীর কাছে। প্রেমের কাছে, আত্মিক আশ্রয় খোঁজে প্রেম পিপাসিত বলেই বোধ হয় এক প্রস্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, তবু মনের মানুষটা না পাওয়ায় বোধ হয় তৃষ্ণা মেটেনি। প্রেমই হয়তো আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষিকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

সাত দিনের বেশি কোথাও আতিথ্য নেননি। কুন্তী ভোজের গৃহে আমার নেশায় প্রথম থিতু হয়ে বসলেন। তাঁর হৃদয়ের খুব কাছে বসে বুকের কলধ্বনি শুনেছি হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে—নিশি ডাকের মতো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তার বুকের অভ্যন্তরে। ঐ ডাক তাঁকে স্থির হতে দেয় না। একদিন সখেদে বললেন ঃ জান কুন্তী। মানুষ যে কি চায় নিজেও ভালো করে জানে না। ব্রহ্মচারী হয়ে কি পেয়েছি? আমার বুকে এত জ্বালা কিসের? কার উপর অভিমান করে এ ্ রেগে যাই? কোন অতৃপ্তি আর অভাবে আমি খ্যাপা দুর্বাসা হয়েছি? এমন তো হতে চাইনি আমি। তবু মাঝে মাঝে বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ঈর্ষায়, বিদ্বেষে, ঘৃণায়, ক্রোধে, পাষণ্ডের মতো দায়িত্বহীন কাজ করে বসি। কত মানুষকে নিষ্ঠুর ক্রোধে, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো অভিশাপ দিয়েছি, দৈহিক নির্যাতন করেছি। পরে, কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এখানে আসা অবধি নানা ঘটনার মধ্যে সে সব কথা মনে হয় খুব। তাদের সঙ্গে তোমার কত তফাৎ? আমাকে তুমি অবাক করেছ। বেশ বুঝতে পারি আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। তার সব কৃতিত্ব তোমার। আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গেছি। ফুলের গন্ধের মতোই ভালো মানুষের মনের গন্ধও আপনি ছড়িয়ে যায় অন্যের মনে। তেমনি করে আমার মনের মধ্যে ছড়িয়ে আছ তুমি। তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলছি, আমি ক্লান্ত, আমি রিক্ত। আমার ভার তুমি নাও। আমায় একটু করুণা কর। কথাগুলো বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ডুবুরীর মতো আমার দু'চোখের গভীরে ডুবিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে রইল।

তাঁর কথাগুলোয হঠাৎ করে বুকের মধ্যে কী যেন গলে গেল। কী যেন নয়, পুরো বুকটাই যেন গলে গেল। আমার ভেতর অত বড় ঋষি যে কি দেখেছিলেন তিনিই জানেন। কাঙালের মতো অল্প বয়স্কা মেয়েটির সান্নিধ্য, সঙ্গ সেবা, যত্ন, পরিচর্যা এত বেশি করে চাইতেন 'না, বলতে বুক ভেঙে যেত।

দিন দিন আমিও বদলে যাচ্ছি। আমার চোখে রঙ, বুকে সুর। ভালোবাসি, ভালোবাসি বলে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।

যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে উঠল আমার ভেতর এক চিরন্তনী নারী। সেই প্রথম অনুভব করলাম পুরুষ মনের উত্তাপ পাবার জন্যে একটা তৃষ্ণা তৈরী হয়েছে আমার বুকের অভ্যন্তরে। পুরুষমনকে আকর্ষণ করার প্রবণতাও সেই প্রথম। জীবনের ধর্ম প্রকাশ করা। উদ্ভিন্ন দেহে কিশোরীর মনে জেগে ওঠা নারীত্ব; সাজ-সজ্জার ভেতর দিয়ে পুরুষের কাছে মেলে ধরে। নিজেকে আবিষ্কার করে। মনের আয়নায় রূপ, যৌবন এবং সৌন্দর্যকে দেখে। রূপচর্চা হলো নারীর সৌন্দর্যচর্চা। তার মনের এক ধরনের প্রকাশ। মনের মাধুরী মিশিয়ে নারী সাজে; পুরুষের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠার জন্যে। পুরুষকে তৃষ্ণার্ত করা, তার তৃষ্ণাকে আরো বাড়িয়ে তোলার এক খেলা। রূপচর্চায়, সাজ-সজ্জায় নারী কোন বয়স মানে না। সাজ-সজ্জা, রূপচর্চার কোন বয়স নেই, সময় নেই, কোন মাপকাঠি নেই। নিজে সেজে খুশি হওয়া, দিয়ে সুখী হওয়াই নারীর মনের ধর্ম। কারণ, দেয়াটা তার নিজের ক্ষমতার মধ্যে, পাওয়াটা তার হাতের ভেতর নয় বলেই নিজেকে উজার করে দিয়ে পুরুষকে চায় নারী। চায়, তার প্রেমিক পুরুষটির উপর শর্তহীন প্রভুত্ব, প্রণয়ীর নিঃশর্ত দাসখৎ। জেতাতে যেমন তার সুখ, দখলেও তেমনি আনন্দ। নারী দুটোই চায়।

পরিণত মন দিয়ে নারী মনের যে রহস্যের কথা বললাম, পঞ্চদশী কুন্তীর সত্তার গভীরে সেই চেতনাই তাকে দুর্বাসার দিকে প্রবলবেগে টানছিল। দুর্বাসার সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে বুকের মধ্যে কার পদধ্বনি শুনতে পেতাম যেন। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধারণাটা। সম্পর্কটা আমি বুঝতে পারছি বুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে। ফুলের উপর আলো পড়লে তার পাঁপড়িগুলি যেমন মেলে ধরে অনেকটা তেমনি এক উন্মুখ চাওয়ার কাছে নিজের সত্তাকে মেলে ধরেছি। ফুল যেমন জানে না ফল ফলাবার নির্দ্দেশ এসেছে তার কোন অলক্ষ্য থেকে, তেমনি আমিও জানি না এই অদৃশ্য উৎফুল্ল হওয়ার ভেতর কিসের নির্দ্দেশ আসছে।

ঘটনাগুলো পর পর বলা হচ্ছে কিনা জানি না। পর পর যে বলতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বহু বৎসরের ব্যবধানে স্মৃতিতে, ভাগ্যে তা এক অন্যরূপ নিয়েছে। আবেগ মুগ্ধতা, বিপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবন বৃত্তান্তের আর আগেও নেই, পরেও নেই। এখন ঐ দিনগুলো একই সময়ে আমার মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে শুধু বর্তমান। আমি তাকেই দেখছি। এটা স্মৃতি নয়, বর্তমান। ক্ষণে ক্ষণে আমি তার মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছি। আমাকে স্পর্শ করে আছে গোটা অতীত।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঋষির শয্যার পাশে বসে তাঁর পদ সেবা করছি। কুলুঙ্গীর বড় বড় দীপের স্নিগ্ধ আলোয় কক্ষ দেশ উদ্ভাসিত। আড়চোখে ঋষিকে দেখছি। অনুরাগের বর্ণচ্ছটা মিশিয়ে মুগ্ধ চোখে ঋষি আমাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তে নম্র লজ্জায় ভেতরটা নুয়ে এল ভয়ও হলো। ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মতো আমি কাঁপছি। আমার অবস্থা দেখে মৃদু

মৃদু হাসছেন ঋষি। শরমে মাথাটা আরো নুয়ে এল ঋষির পায়ের দিকে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। মনে মনে দ্রুত কত ধরনের কথা বলছি নিজের সঙ্গে। হঠাৎ ঋষিবর বললেন ঃ জান কুন্তী, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তোমার চোখের উপর চোখ মেলে ধরার জন্যে এমন আকুলি বিকুলি করে ভেতরটা যে আর স্থির থাকতে পারি না। একে কি তুমি দোষ বলবে?

ঋষির জিজ্ঞাসার জবাবে কী বলব আমার জানা নেই। চিত্রার্পিতের মতো তাঁর তৃষিত চোখের সামনে চুপ করে বসে আছি। অনন্ত সময় চলে যাচ্ছে। তবু তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারলাম না। কেন জানি না, নিজের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি প্রাণপনে। কিন্তু ঋষির কোন অভিব্যক্তি নেই। স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

হঠাৎ ঋষি শুধালেন ঃ লজ্জা? লজ্জা কিসের? তুমি তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ। উপনিষদ বলেছে, যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হলো তখন ব্রহ্ম একা। সৃষ্টি কর্তার মনে কোন সুখ নেই। দুঃসহ একাকীত্ব এবং সঙ্গীহীনতায় তাঁর সময় কাটে না। একা তাঁর ভালো লাগল না। একা থাকার মধ্যে কোন রস পান না, আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না বলেই তিনি নিজেকে দুই করলেন। তখন রূপ রস শব্দ স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে তৈরী এক বিচিত্র বিশ্ব এল। ব্রহ্মা নিজে বলে উঠলেন —আনন্দ রূপমৃতং যদ্বিভাতি। পৃথিবী সুন্দর হলো। আকাশের দিকে চেয়ে সৃষ্টিকর্তা বললে তুমি সুন্দর, সুন্দর হলো সে। ব্রহ্মার সবচেয়ে যে প্রকটরূপ তা আনন্দস্বরূপ। তিনি রসিক, রসপ্রিয়, রসলোভী। রস অনুভব করে তিনি আনন্দ পান। আর রস তো একা অনুভব করা যায় না; তার জন্যে চাই আর একজন। দুয়ের জানাজানি পরিচয় প্রীতি; এনা হলে রসের ধারা বইবে কি করে? এই যে দ্বিতীয় সত্তা মানুষের ক্ষেত্রে সে হলো নারী। তার মানে পুরুষ কিংবা নারী একটি মানুষরূপের অর্ধেক মাত্র। তাই তো সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে দুজনের প্রতি দুজনের সমান টান। দুজন ছাড়া দুজন পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ হওয়ার টান নারী পুরুষের ভেতরে থেকে গেল। এই সম্পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তার প্রেম। প্রেমে মানুষ পূর্ণ হয়। তুমি এসব কথা জান?

ঋষির প্রত্যেকটি কথা আমার কানে, মনে, বুকে এমন করে গেঁথে গেল যে এক দারুন মুগ্ধ চমকে বিজুরীর মতো চমকাতে লাগল আমার ভেতরটা। আড়ষ্ট লজ্জার ভাবটা আর নেই। নারীর স্বভাবের মধ্যে নিজের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখার একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। সংকোচ, কুণ্ঠা তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ যন্ত্রনা দেয়। তবু পুরুষের কাছে নিজের আনন্দ, সুখ, ভালোলাগাকে উন্মোচিত করে না কোন নারী। পুরুষের কাছ থেকে নিজেকে লুকোনো, নিজেকে অনাসক্ত করে, নিজের মূল্যকে, অভাবকে আরো তীব্র করে তোলার প্রতীক্ষার ভেতর এক প্রতিকারহীন যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

বুকে উথাল পাথাল ভাব। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ি।

প্রশ্রয় ভরা উজ্জ্বল চোখ মেলে অনিমেষ তাকিয়ে আছি ঋষির দিকে। চোখের মধ্যে ঋষির চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল যেন একটুও উপছে পড়ে বাইরে নষ্ট না হয়। সব মেয়েই পুরুষের এই চাউনির অর্থ বোঝে। ভয়ার্ত

গলায় বললাম : অনেক হয়েছে। এবার ফেরান চোখ। আমি সইতে পারছি না ওই দৃষ্টি। ভয় করছে।

তড়াক করে দুর্বাসা বিছানায় উঠে বসল। আমার খুব কাছে সরে এল। নিমেষে হাতটি তুলে নিল তাঁর হাতে। বাধা দেয়ার শক্তি ছিল না আমার। হাতটি খুলে ধরলাম তাঁর করপদ্মে। ঋষি হাতের উপর গাল রাখল, চুম্বন করল। বুকে চেপে ধরে আদর করল। আমার সারা শরীরে সিরসিরানি উঠল। আঙুলের আঙুলের উষ্ণতায় মিলন হলো। কতক্ষণ জানি না—হাতটা ঋষির হাত থেকে টেনে নিলাম। এক অজ্ঞাত রহস্যালোকের পর্দাটা হঠাৎ সরে গেল। আমি অনুভব করলাম, পুরুষের অনেক কিছুই নারীর শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। ছোঁয়া লাগলে সমস্ত শরীর গলে যেতে চায়।

দুর্বাসার অর্ধনিমীলিত দুই চোখের তারায় বিভোর বিহ্বলতা। বলল : রাগ হলো তো? আমি খুব খারাপ তাই না?—যেন অপরাধ রাখার জায়গা নেই।

কেমন একটা ভয়ে জড়সড় হয়ে মাথা হেঁট করে নিচের দাঁতের উপর ঠোঁট কামড়ে বলি : আমি তো কিছু বলেনি। নারীর সান্নিধ্য, তাব সাহচর্য আপনি তো জীবন ভোর চান নি, কিংবা নেয়ার সাহস হয়নি, অথবা ইচ্ছে হয়নি বলে নারীর থেকে দূরে থেকেছেন। আজ, আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটা মেয়েকে ঘরে একা পেয়ে উপোসী পুরুষের মতো এভাবে চাইবেন কেন? আপনার কোন কঠিন পরীক্ষার কাছে আমার আত্মসংযম পাছে হেরে যায় তাই— বলে চুপ করে যাই।

দুর্বাসার চোখে উপোসী ভিখেরীর ক্ষিদে জ্বলজ্বল করছিল। বলল : কেই বা কাকে বোঝে? নিজেকেই বা কতটুকু চিনি? ঋষি হলেও আমিও একজন রক্তমাংসের মানুষ।

দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে পাছে অভিশাপ দেয়, তাই সন্তুষ্ট করার জন্যে তাঁকে বলি : আমার কথাটা আপনি একটু বুঝুন। একবারও ভাববেন না যে আমার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কোন ইচ্ছে পূরণ করার মধ্যে যেমন তীব্র সুখ থাকে, তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে অন্যের আদর্শ, ব্রত এবং ধর্মকে রক্ষার করার মধ্যেও তেমনি একটা সুখ চাপা থাকে।

আমি কি জানি, আমার মধ্যে এক ভোলা মহাদেব আছে। তার মুক্তি, আনন্দ, সুখ গৌরীর মতোই এক রমনীর কাছে আত্মসমর্পনে। এটা বোঝার কথা কুন্তী, বোঝানোর নয়। উপনিষদে পুরুষ যে দ্বিধা ছিন্ন করেছিল নিজেকে, সেই ছিন্ন দু'ভাগেব মধ্যে পরস্পর মিলিত হবার, সম্পূর্ণ হবার টান তো রয়েই গেল। ঋষি হলেও সে মুক্ত নয়। সত্যি কথা বলতে কি, অমন যে যোগীবর মহাদেব তিনিও পারেননি গৌরীর টান থেকে দূরে থাকতে। মহাদেবের বুকে গৌরী নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাল—স্বামী ও কার ছায়া তোমার বুক জুড়ে আছে? ও কে? মহাদেব গৌরীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলল : প্রিয়তমা, ও তুমি। আমি তোমাকে আরো কাছে পেতে চাই। ঐ ছায়ার মতো তোমার মধ্যে মিশে যেতে চাই। এমন দূরে দূরে, আলাদা করে নয়, তোমার সমস্ত অঙ্গের স্পর্শ আমি চাই। যাতে বাঁধা পড়বে আমার নিত্য

আলিঙ্গনে। শব্দ আর অর্থকে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি আমি তুমি এক অঙ্গে দুই রূপ হয়ে থাকব। তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা আমি চিন্তা করতে পারি না।

গৌরী উৎফুল্ল হয়ে বলল ঃ খুব মজা হবে। এক অঙ্গে আমরা দুজন অর্ধ নারীশ্বর হয়ে শোভা পাব। তোমার অর্ধেক আর আমার অর্ধেক অঙ্গ নিয়ে হবে এই যুগল রূপ। সমস্ত গায়ের স্পর্শ আমি চাই, যাতে তুমি বাঁধা পড়বে আমার নিত্য আলিঙ্গনে।

মহাদেব বলল ঃ তাই হোক।

কথাগুলো বলা শেষ হওয়ার পরেই দুর্বাসা হঠাৎ-বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাঁর ভূজবন্ধনে এমন নিবিড় করে বাঁধল যেন একটু নড়া-চড়া করতে না পারি। তাঁর তৃষ্ণার্ত মুখ আমার মুখের উপর নেমে এল। আমি চেষ্টা করছি ঋষির আগ্রাসী চুম্বন থেকে নিজেকে সরাতে। ভূজবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করছি। কেন করছি কে জানে? হয়তো পুরুষের তৃষ্ণাকে, উত্তেজনাকে নিয়ে সব নারীই এই খেলা খেলতে ভালোবাসে। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে হেরে যায়। তেমনি আমিও পরাজিত হলাম। দুর্বাসা রুক্ষ, উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল আমার নরম ঠোঁটের সমস্ত স্নিগ্ধ সিক্ততা। মুখে বলছি, আঃ কী করছেন? লাগে-লাগে, ভাল্লাগে না—এরকম বর্ব্বরতা মানায় না। মুখে যাই বলি না কেন আমার সারা শরীর গান গেয়ে উঠছে। মুখের ভেতর তাঁর মুখের স্পর্শ লেগে আছে। তবু আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

দুর্বাসা আমাকে বাহুবন্ধন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি বিস্রস্ত বসন গুছিয়ে নিচ্ছি, এলোমেলো চুল ঠিক করে নিচ্ছি।

মুখে কিছু বলছি না দেখে লজ্জিত ঋষি হতাশ গলায় নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে স্বগতোক্তি করল যেন। বলল ঃ মানুষ মাত্রেই কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে। যা তাকে মানুষ হিসেবে হাস্যাস্পদ করলেও মানুষ হিসেবে হয়তো পূর্ণতরও করে তোলে। মানুষ তো আর দেবতা নয়। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রের অপূর্ণতাই তাকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলে অকস্মাৎ। তাকে কি কেউ দোষ বলবে? ভালোবেসে কিছু চাওয়াটা কখনো দোষের হয় না। তাকে বর্ব্বরতা করা বলে না।

দুর্বাসার স্বগতোক্তির জবাবে বললাম না কিছুই। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

সেদিন রাত্রে আর ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ঋষির স্পর্শটা গায়ে লেগে রইল। এরকম একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সৌরভ বুকে নিয়ে এপাশ-ওপাশ করি। দুর্বাসা সত্যি-এরকম একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে যে আমার অনুভূতির রূপ, রঙ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের স্বাদটাই বদলে দিতে পারে চিন্তাই করিনি। আমার জীবনে প্রথম পুরুষ।

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে ভালো লাগছে আমরা দুজনে কাছাকাছি বসে আছি। নীরব অন্ধকার আমাদের সব অস্তিত্বকে ঢেকে দিয়েছে। দুজনের শ্বাস প্রশ্বাসের

শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কুলুঙ্গীতে রক্ষিত নিবাত নিষ্কম্প মৃদু দীপ শিখার অনুজ্জ্বল আলোয় আমাদের যুগল ছায়া দীর্ঘাকৃত হয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে। এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে আমি আবিষ্ট।

কখন যে ঘুমে দু'চোখের পাতা জুড়ে গেছে জানি না। রাতের স্বপ্নে দুর্বাসা চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকল। পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে কুন্তী বসে ডাকল। ঐ ডাক শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। বুকে সাগর উথলে উঠল। নিজের শরীর মনকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হলো। তবু সাড়া না দিয়ে ঘুমের ভাণ করে চুপ করে থাকলাম। প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করছি ঋষি গায়ে হাত দিয়ে ঘুম থেকে কখন জাগিয়ে তুলবে? আদর করে বুকে টেনে নেবে। সময় বয়ে গেল। সাড়া না পেয়ে এক বুক অভিমান নিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। আর আমি চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা বুকে করে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছি। চোখের জল বাঁধা মানছে না। মন যাকে তীব্রভাবে চায় তাকে এভাবে 'না' বলে ফিরিয়ে দেয়ার যন্ত্রণা কী দুঃসহ, তার অনুভূতি হলো। বুকে প্রেমের কল্লোল সেই প্রথম। একটা ভয়ও হলো। ভয়ের কারণ, মনটা তো শরীরের মধ্যে থাকে। শরীর ছাড়া মনের বয়স কোথায়? মনের মন কখন কি করে বসে সেটা জানা না থাকলে ভয় হয়। এক নিষিদ্ধ অথচ তীব্র ভালোবাসার ভয়ার্ত আভাসে ভেতরটা জ্বর জ্বর লাগল।

পাখির ডাকে সহসা ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের বিষাদটা দেহমন ভরে রয়েছে। আমার শরীর শিথিল। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই যেন।

আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমি জানি না এই অনুভূতির উৎস কোথায়—শরীরে না মনে? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে? মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ স্বপ্নটা একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে।

মানুষের শরীরেরও বোধ হয় একটা গন্ধ আছে। প্রত্যেকের গায়ের গন্ধ আলাদা। বোধ হয় প্রত্যেক ফুল এবং প্রাণীর গায়েয় গন্ধের মতো আলাদা আলাদা। পোষা কুকুর, বিড়াল, গরু চলে গেলে বাতাসে যেমন তাদের গায়ের গন্ধ লেগে থাকে তেমনি মানুষের গায়ের গন্ধও নাক চেনে। মানুষও। কিন্তু মানুষ যেহেতু পশু নয় গায়ের গন্ধটা তার বাতাসের গায়ে লেগে থাকে না। যে

তাকে ভালোবাসে, শুধু সে নিশ্বাসের মধ্যে তার ঘ্রাণ পায়। কিন্তু একজন না পছন্দ মানুষের সঙ্গে আমার সব ভালোলাগা, না-লাগা যে এমন করে জড়িয়ে যাবে কখনও ভাবেনি। ভাবতে খুব মজা লাগে, ঋষি দুর্বাসার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ একটু নয়-চারগুণ। তবু ঐ মানুষটা এক লহমায় জীবনের বড় বড় বাধা নিষেধের পাহাড়গুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে লজ্জা, ভয়, সংকোচ দ্বিধার আড়াল ভেঙে ফেলে আমার শরীর ও মনের দখল নিয়েছে। আমার আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। আমার শরীরের মধ্যে যে মন বাস করে যুগান্তরের ঘুম থেকে তাকে জাগিয়েছে। আমায় আমিকে দেখলাম, চিনলাম। এক নতুন নারী হয়ে উঠলাম। হঠাৎ পাওয়ার শারীরিক বিস্ময়, একটা সুখকর অনুভূতি, আনন্দ, উত্তেজনায় আমার ভেতরটা ভরে গেল। শরীরের মধ্যে যে এত সুখ অসামান্য আনন্দের উৎস লুকোনো আছে, দুর্বাসার সান্নিধ্য না পেলে বোধ হয় জীবনভোর অজ্ঞাত থেকে যেত।

আমার জীবনে সেই প্রথম প্রেমের অনুভূতি। দুর্বাসাকে আমি হৃদয় দিয়ে বসেছি। ঋষির শাপের ভয়ে নয়, তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্যেও নয়, ভোজরাজকে প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্যে নয়, দুপক্ষের তীব্র আসক্তি আর আনন্দঘন আশ্লেষে একে অন্যকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ায় সুখকার অনুভূতিতে আমার হৃদয়পাত্র ভরন্ত কলসের মতো ভরে যেত আবেশে। সেই ভালোলাগার কোন বয়স নেই। সময় নেই। মনই সব। মনের মন তো আগে থেকে পরিকল্পনা করে কাউকে ভালোবাসে না। একসঙ্গে থাকতে থাকতে ভালোবাসা হয়ে যায়। যুগল মনের মন্দিরে শরীরের দীপ জ্বেলে আরতি করার পরেই পুরুষ ও নারী পরস্পরকে খুঁজে পায়। কিন্তু সে খোঁজা, সে পাওয়া কোনদিন শেষ হয় না, সেই সঙ্গে জানারও। হারিয়েও যেন কিছু হারায় না।

আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করে দুর্বাসা তো তোমাকে ভালোবেসেছিল তাহলে তোমায় ত্যাগ করলেন কেন? তুমি তো বিশ্বাসভঙ্গে কোন কাজ করনি তাঁর সঙ্গে। সরল মনে নিষ্পাপ প্রেম উজাড় করে দিয়েছ। তবু তোমার প্রেমকে অপমান করলেন। প্রেম-প্রীতির গর্ভে অনবধানে যাঁর এক ফোঁটা ঔরস পড়ে অলক্ষ্যে দিনমাস ধরে যে রক্তমাংসের দলাটা তুমি লালন করলে, তার প্রতি একটু মমতা কিংবা দরদবোধও কি তাঁর নেই? তস্করের মতো সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, নিঃস্ব করে চুপি চুপি যে পালাল; প্রেমের সেই বিশ্বাসঘাতকের উপর তোমার ঘৃণা হয় না? সে তোমাকে দিয়েছে কি? তোমার নিষ্পাপ মাতৃত্বের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। শত্রুপক্ষের লোক মিত্র হয় না কখনও একথাটা তোমার মতো বৃহস্পতির কূট রাজনীতি জানা মেয়ের বোঝা উচিত ছিল। তবু মোহে পড়ে তোমার শেখা বিদ্যে জলাঞ্জলি দিলে। মাদার গাছে গা ঘষলে তার কাঁটায় দেহ রক্তাক্ত হয়। তেমনি শত্রুর সঙ্গে মেলামেশারও একটা পরিধি আছে। তাকে অতিক্রম করলে মূল্য দিতে হয়। তোমার কষ্টের জন্যে তুমিই দায়ী। জরাসন্ধের ভয় দুর্বাসার মনোরঞ্জনার্থে কুন্তীভোজ তোমাকে ব্যবহার করেছে। সুযোগ পেয়ে ঋষি তাঁর তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। তোমার জন্যে তার প্রাণে

একটু মমতাও ছিল না।

অভিযোগটা অস্বীকার করার মতো জোর পাই না মনে। সত্যি তো, কুন্তীভোজের গৃহ ছেড়ে যেদিন চলে গেল সেদিন একবারও আমার কাছে বিদায় নিতে এল না। বলল না ঃ চলে যাচ্ছি। নির্বোধের মতো বিশ্বাস করে ঠকেছি। ভোজরাজকে কৌশলে জিতিয়ে দিতে গিয়ে হেরে গেছি তাঁর কাছে। আমার মতো অনেক মেয়েই প্রেমাস্পদের কাছে হেরে যায় ইচ্ছে করেই। হেরে যাওয়ার মধ্যেও একটা আশ্চর্য সুখ নিহিত আছে। সে কথাটা যেদিন কোন মেয়ে বুঝে ফেলে সেদিন মনে মনে বলে, তোমাকে আমার সর্বস্ব নিবেদন করলাম। আমার জয়—তোমার জয় হোক। আমি চাই তুমি আমাকে জোর কর, তোমার খুশিমতো যেমন ইচ্ছ চালাও, আমাকে তোমার দাসী করে রাখ। তোমার মধ্যে আমাকে হারিয়ে যেতে দাও। এইভাবে আত্মনিবেদন করার ভেতর কিংবা পরাভব স্বীকারের মধ্যে কোন দাহ নেই, অপমান নেই, অনুশোচনা নেই। দানের আনন্দে, তৃপ্তিতে হয়তো বা পুন্যে তা পরিপূর্ণ। এমন শান্ত স্নিগ্ধ ভালোবাসতে শুধু মেয়েরাই জানে। সেই ভালোবাসার গর্ববোধ ছিল আমার বুকে। কিন্তু দুর্বাসা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের মতো মহামূল্যবান জিনিষগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হঠাৎ এভাবে চলে যেতে পারে স্বপ্নেও মনে হয়নি। ঋষির বিশ্বাসঘাতকতা আমার প্রেমকে ছোট করে দিয়েছে। নিজেকে তাঁর কাছে প্রথম পরাজিত মনে হলো। যদিও তাঁর কাছে কোনদিন হারতে চাইনি। বরং ঋষিকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সেই হেরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় জেতা হলো তাঁর কাছে। এখন বুঝতে পারছি আমার জানাটা ঠিক ছিল না। ভোজরাজের কথা মনে হলো, কোন জানাই ভ্রান্ত নয়! আজ যেটাকে অভ্রান্ত নিশ্চিত সত্য বলে মনে হচ্ছে, কাল সেটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। মানুষকে বিশ্বাস করতে হয় ভেবে চিন্তে। কিন্তু কথাগুলো যে এমন করে আমার জীবনে ফলবে, কে জানতো?

পনেরো বছর বয়সের স্মৃতিটা ভুলে থাকা সত্যিই কঠিন। ঐ বয়সটা আমার জীবনের এক বিশেষ দিকচিহ্নও বটে। কারণ, সেদিনের ঘটনাই আমাকে শিখিয়েছে কি করে সত্যকে জানতে হয়। ঘুরে ফিরে সেই কথাটা তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মতো আমার ভেতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে করে দিল।

দুপুর হতে একপ্রহর দেরী তখন। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে সুদর্শনা হাঁফাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ঃ একবারটি বাইরে চল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখ, কী কাণ্ড হচ্ছে। খ্যাপা ঋষি চলে যাচ্ছে। তাঁর যাওয়ার রথ এসেছে। অশ্বারোহী সৈন্যেরা রথের আগে পিছে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুরোহিত এসেছে যাত্রামঙ্গল পাঠ করতে। আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে রূপচর্চা করছ। কার জন্যে করছ? এসব তোমার দেখবে কে? দেখার মানুষ তো চলে যাচ্ছে।

সুদর্শনা আমার বিশ্বস্ত পরিচারিকা। শূরসেন থেকে তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। ভোজপুরীতে এই বয়স্কা দাসীই আমার একমাত্র সহচরী এবং আত্মীয়া। মায়ের মতো আগলে বেড়ায়। চোখে চোখে রাখে। আমার জন্য

ওর উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। একটু বেশি দুঃসাহসী বলে ভয়টা বেশি। কতদিন জিগ্যেস করেছে, খ্যাপা ঋষির সঙ্গে তোমার মাখামাখিটা আমার ভালো লাগে না, বাপু। এখানে তোমাকে শাসন করার কেউ নেই। ভালো-মন্দ বলে দেয়ার লোক নেই। এখানে তুমি ভীষণ একা। আমি ছাড়া আর কেউ তোমার ভালো চায় না। তাই একটা ভয়ের মধ্যে থাকি।

সুদর্শনার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলি, ঋষি তো আর বনের বাঘ নয়, মানুষ। তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

বেজার মুখ করে সুদর্শনা সংকোচে বলল : ভয় তো শরীরের। শরীর কারো কথা শোনে না। তার গোপন করারও কিছু নেই।

তুমি কি ভাব বলতো ?

তোমাকে পেটে ধরেনি কেবল। জন্ম থেকে তোমাকে পালন করেছি। তোমার সঙ্গে স্নেহ মমতার সম্পর্ক আমার। মমতা বশেও মায়ের মতো সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকি। তুমি আমাকে লুকিয়ো না। তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারি লোকটা তোমাকে মন্ত্রে বশ করেছে। তোমার সাধ্য কি মন্ত্রের বন্ধন কাটিয়ে বাইরে এস।

মন্ত্র কী খারাপ জিনিস।

চমকানো বিস্ময়ে জিগ্যেস করল : মন্ত্র পড়ে তোমরা বিয়ে করেছ কি ?

কেন ? জীবনকে দেখার জীবনকে জানার উপলব্ধি করার পাঠ অভ্যাস করা কি খারাপ ?

পৃথা এসব কী বলছ ! ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। এখানে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই। ভোজরাজও নিজের স্বার্থে তোমার সঙ্গে স্নেহ ভালোবাসার খেলা করে। মানুষটা খুব ধূর্ত। বাইরে থেকে তাঁর চালাকী টের পাওয়া যায় না। আমি জেনেছি, ঋষিকে উনিই আমন্ত্রন করে এনেছেন। ঋষিকে তুষ্ট করে মগধ সম্রাটের আক্রমন থেকে ভোজরাজ্যকে বাঁচানো তাঁর উদ্দেশ্য। তাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্যে ভোজরাজ ঋষির ঔরসে পত্নীদের গর্ভে সন্তানোৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাণীরা কেউ রাজি হয়নি। তখন তোমার কচি মনকে আদর্শের রঙে রাঙিয়ে, বুদ্ধি-বিদ্যা, দায়িত্ববোধের প্রশংসা করে ঋষির পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছেন। তুমিও ঋষির সেবায় মজে গেছ। তাই তো তোমায় নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। কখন কি হয় তার ভয়ে মরি। কুন্তীভোজ কি চায় কে জানে ?

একলহমায় কথাগুলো মনের উপর ঝলকে উঠল। আমার সারা শরীর চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা থেঁতলে দিচ্ছিল যেন। আমার মধ্যে তখন একটা বিরাট ভাঙা গড়া চলছে। আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না। মনে মনে বলছি, মানুষ চিনতে ভুল করলাম। ভালোবেসে ঠকলাম। বিশ্বাস করে একোন অপরাধ করলাম ? তা-হলে পৃথিবীর সব কিছু বদলে গেল কি ? রাজনীতির পালের হাওয়া লেগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি বদলে যায় ? গোটা জীবনের মূল্যবোধটা কি অন্যরকম হয়ে যায় ? নইলে, বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় সংকীর্ণতা ঐক্যের স্থানে বিচ্ছিন্নতা এসে মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে কেন ? হঠাৎ এ কোন

বিপর্যয়ের মধ্যে এসে পড়ল আমার জীবন ? এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে কৃমি পোকার মতো থিক থিক করছে। মনটাও বিষিয়ে গেছে। কিছু ভালো লাগছে না !

আমাকে নীরব দেখে সুদর্শনা বলল ঃ রাজকুমারী, রাগ কিংবা অভিমান করার সময় নয় এখন। তুমি একটা কিছু কর।

কেমন একটা উদাস অবসন্নতায় বিষণ্ন আমার কণ্ঠস্বর। বললাম ঃ এ পৃথিবীতে এই দুর্বল ছোট্ট দু'হাত দিয়ে কাকে ধরে রাখব ? ধরা না দিলে কাউকে ধরে রাখা যায় ? যায় না। শুধু মুখে বলা, যেতে আমি দেব না তোমায়। কিন্তু যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, মায়া-মমতার ধার ধারে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে চলে যায়, তাদের তো যেতে দিতে হয়। মনের লড়াই তো আর খোলা তলোয়ার নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে সবাকার সামনে হয় না।

ব্যাকুল গলায় সুদর্শনা বলল ঃ তুমি একবারটি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে দেখলে অপরাধে ঋষির মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

আমি তো কোন অপরাধ করিনি। মনের ভালোবাসায় কোন অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি সেই প্রেমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করে তাহলে আমার করার কী আছে? বেশি বয়স ব'লে আমি তো তাঁর অমর্যাদা করিনি। আমার ভালোবাসাতে খাদ নেই, পাপ নেই। কোন অনুশোচনাও নেই। থাকবে কেন ? ভালোবাসার কুসুম এ বুকে ফুটিয়েছে কে ? —ঈশ্বর। আমার ভালোবাসা ঈশ্বর।

ওসব ভাবাবেগের কোন মানে নেই। মেয়ে-মানুষ জাতটাই বড় আবেগপ্রবণ। ভালোবাসায় বড় বেশি সৎ আর একনিষ্ঠ থাকার জন্যে এবং বিশ্বাস করার জন্যে জীবন ভোর তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়। তবু চৈতন্য হয় না তার। বোকা, বোকা, ভীষণ বোকা। মনটা যেহেতু শরীরের মধ্যে বাস করে তাই শরীর ছাড়া কোন ভালোবাসা হয় না। শরীরের ভালোবাসাতেই পাপ। ভালোবাসার পাপ মেয়ে মানুষেকে একা বয়ে বেড়াতে হয়। তার বিষফল সারা শরীর মন বিষিয়ে দেয়। এই বাস্তব কথাটা বুঝতে যারা দেরী করে তাদেরই পস্তাতে হয়। আশ্চর্য ! সেই কথাটাই ভাবছ না তুমি।

ভাবার সময় যখন ছিল ভাবিনি ভাবনাটা বড় দেরী করে ফেলেছি। এখন ভেবে হবে কী ?

দেরী হলেও শুধরানোর সময় আছে এখনও। জীবনটা জোয়ার-ভাঁটায় মতো। হারজিত লেগেই আছে। হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না। মনের হাল শক্ত করে না ধরলে পাড়ে পৌঁছবে কী করে ? হাল ছেড়ে ভেসে বেড়ানোর মতো বিড়ম্বনা আর নেই। একদিন ঋষিকে হারিয়ে দিতে চেয়েছিলে তুমি। অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষটাকে জয় করার জন্যে তোমার গর্ব ছিল। কারণ তুমি হারতে চাও নি। হেরে যাওয়ার সত্যি কোন সুখ নেই। হারতে চায় না কেউ। জেতাটাই বড়। কিভাবে জিতলে, সে কথা কেউ মনেও রাখে না। আমার কথা শুনে, একবারটি ভোজরাজের সামনে দাঁড়াও। নির্ভয়ে বল, ঋষি প্রতারক, ঠগ, দস্যু। আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছেন। ওকে যেতে দিও না।

কথাগুলো বলে সুদর্শনা আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। দুর্বাসা যখন রথে উঠছেন ঠিক সেই সময় আমাকে হাজির করল তাঁর সামনে। আমায় দেখে একটু অবাক হলেন। বোধ করি কেঁপে গেল দুর্বাসার ভেতরটা।

ভোজরাজও কম আশ্চর্য হয়নি। চমকানো বিস্ময়ে বলল : তুমি!

দুর্বাসা খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেন নি। মুহূর্তে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখমণ্ডল। কিছু হয়নি এমন একটা ভাব করে বলল : ভোজরাজ আপনার কন্যার সেবার কথা এ জীবনে ভুলব না। বড় ভালো মেয়ে, খুব লক্ষণযুক্তা। কিন্তু সোজা পথে ওর জীবন শুরু হয়নি। অনেক বাধা-বিপত্তি ধকল সইতে হবে সারাজীবন ধরে। যেমন ভাগ্যবতী তেমনি অভাগা। জোয়ার ভাঁটা জীবন ভোর লেগে থাকবে। জীবনে উন্নতিও যেমন, শত্রুতাও তেমনি। শুধু বিধাতার শত্রুতা নয়, মানুষের শত্রুতাও কম নেই। তাই ওর ভালোর জন্যেই বশীকরণের গুপ্তবিদ্যার পাশাপাশি জননী হওয়ার এক আশ্চর্য মন্ত্র শিখিয়েছি। এই মন্ত্র বলে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে জননী হতে পারবে। দেবতার সন্তান বলেই জাতকের গায়ে কলঙ্ক লাগবে না। মানুষের সমাজে দেবতার পুত্রদের খুব সমাদর। তাদের জননী হওয়াও গর্বের। আমি আশীর্বাদ করছি, সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরী হবে কুন্তী। সন্তানেরা হবে তার পরম গর্বের এবং বিস্ময়ের।

কী যে ঘটে গেল আমার মধ্যে সেই মুহূর্তে, জানি না। ঋষির চোখ আমার চোখের উপর স্থির। অধরে মৃদু মৃদু হাসি। মুখে আনাবিল প্রশান্তি। চোখের চাহনিতে নিবিড় ঘুম ঘুম ভাব। কেমন একটা আচ্ছন্নতায় আমার ভেতরটা আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে আসছে। দুরন্ত প্রতিবাদে ভেতরটা গজরাচ্ছে। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে বলি : মিথ্যে কথা। অপকর্ম আর অপরাধ তোমার বিবেককে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না তাই আমাদের নিষিদ্ধ সম্পর্কের গায়ে নির্দোষ দেবতার নামের ছাপ লাগিয়ে নিজের সম্মান বাঁচল। ভণ্ড ঋষি! তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছে। ঋষি নামের কলঙ্ক তুমি। আসলে তুমি একটা কপট, প্রতারক। আমার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করলে পাছে ব্রহ্মচর্যার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, তাই নিজের অপকর্মকে নির্লজ্জের মতো অন্যের ঘাড়ে চাপালে। তোমাকে ধিক্কার দেবার ভাষা নেই আমার। কথা বলতেও ঘেন্না করছে। প্রেমের নামে আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করলে কেন? তুমি তো আমাকে কিছু শেখাওনি। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাগুলো বলে তোমার মর্যাদা কি খুব বাড়ল? নিজের কাছে তুমি ধরা পড়ে গেছ। তোমার মান বাঁচাতে গিয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ। অন্যের কাছে নিজেকে লুকোতে পার, কিন্তু আমি তো জানি, কোথায় গলদ আর কোথায় ফাঁকি তোমার। বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে তোমার। তাই একজন কুমারীকে একজন ঋষির কাছ থেকে অন্য কোন মন্ত্র নয়, মা হওয়ার মন্ত্র শিখিয়েছ। বিচক্ষণ হলে টের পেতে কোন মেয়ে কুমারী অবস্থায় মা হতে চায় না। প্রকৃতির নিয়মে সব মেয়ে মা হয়। ঋষি তুমি কি বোকা? কী দুর্বল তোমার যুক্তি? এভাবে আমাকে অপদস্থ করলে কেন? আমি তোমার কী করেছি? আজ তোমার কাছে আমি কি কেউ না? আমার কোন দাম নেই তোমার কাছে? এই

তোমার বিচার ?

কথাগুলো মনের মধ্যে ঝড় তুলল। কিন্তু কী আশ্চর্য আমি সম্মোহিত। ঋষির দু'চোখ আমার দুই চোখের মধ্যে এমন করে এনে ফেলল যে ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে গেল। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত ছিল না আমার। ঋষি বিদায় গ্রহণের বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার চৈতন্যোদয় হলো।

সন্দেহের পোকাটা কুড়ে কুড়ে খেয়ে আমার ভেতরটা ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। সন্দেহ এমন এক জিনিস, মনের মধ্যে শিকড় গেঁড়ে বসলে তাকে আর নির্মূল করা যায় না। মাটির গভীরে গাছ যেমন শিকড় চাড়িয়ে দেয় তেমনি সন্দেহের শিকড় নিঃশব্দে শাখামূলে মেলে ধরেছে মনের অভ্যন্তরে।

সকাল হচ্ছে, রাত্রি আসছে, অমোঘ নিয়মে সময়ের চাকা ঘুরছে। সেই ঘূর্ণ্যমান চক্রের মধ্যে আমার অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ পাক খাচ্ছে।

আমার দেহে মাতৃত্বের সব লক্ষণগুলো দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। উদর বসনের শাসন মানছে না। পয়োধর কাঁচুলির বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নির্লজ্জ শরীরটা নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। কী যে করব একে নিয়ে কিছুই স্থির করতে পারছি না। মনে মনে ঋষিকে গাল দেই। তাকে উদ্দেশ্য করে বলি স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, ভণ্ড, শঠ, প্রতারক। তারপর আস্তে আস্তে রাগ জুড়িয়ে গেলে এক অন্য অনুভূতি হয়। তখন আর আক্ষেপ থাকে না। মনটা উদা হয়ে যায়।

ঋষি হলেও দুর্বাসা মানুষ। মানুষ হলেই মন বলে একটা ব্যাপার থাকে মনের দুর্বলতাই সব। এই মনের জন্যেই একজন সংসারী মানুষকে সারা জী ধরে দাম দিতে হয় অনেক। কিন্তু ঋষি সংযমের শানে মনটাকে শানিয়ে নি মায়া, মোহ, দুর্বলতাকে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করছে। ঋষির কোন দুর্বলতা থাকতে নেই। তবু মানুষের শরীরের ভেতর যে মনটা বাস করে সে মনের ভেতর কখনও কখনও ঝড় উঠে। ঝড় উঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে তাঁর অসহায়তা এবং হতাশা সম্বন্ধে সচেতন হয়। ঋষির সঙ্গে মনের সংঘাত বাঁধে। মনের দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়লে পাছে ছোট হয়ে যায়, ঋষির গৌরবের সৌধ ভেঙে পড়ে, বাইরের ঐশ্বর্য বিপন্ন হয় তাই ঋষিকে বাঁচাতে অত্যন্ত স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর হয়ে যান। মনের মানুষটাকে তাঁর ভীষণ ভয়। কেউ যদি মনে

দারিদ্র্য দেখতে পায় তাহলে শ্রদ্ধা-ভক্তি সম্মান করবে না! সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি, ভয়, সমীহ না থাকলে ঋষির মাথা উঁচু থাকবে কী করে? ঋষি তা-হলে সাধারণ হয়ে যাবে? একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন পার্থক্য থাকে না তাঁর। আর সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকা মানেই তো নিচু হওয়া। অর্থাৎ অন্য সবাইয়ের সমান হওয়া, সকলের সঙ্গে একাকার হওয়া। ঋষিত্বের মহিমা দিতে অন্য ঋষিদের মতো দুর্বাসাও বিস্ময় এবং চমক সৃষ্টি করেছেন।

একটা ভয়ঙ্কর অসম্মান থেকে নিজের গৌরব এবং মর্যাদা নিয়ে ঋষিদের এই বেঁচে উঠার কৌশলই আমাকে শেখাল কী করে বাস্তব সত্যকে চিনতে হয়। হঠাৎ, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক ঝলক আলোয় আমার ভেতরের অন্ধকারটা উদ্ভাসিত হলো। ঐ ক্ষণদীপ্ত আলোকে নিজের ভেতরটা দেখে নিতে ভুল হলো না।

সেই সময় হঠাৎ দরজার তালা খোলার শব্দ হলো। সুদর্শনার গলা শোনা গেল বাইরে। দেখলাম, সুদর্শনা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। তারপর আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বিরক্ত হয়ে বলল: রাতদিন এরকম দরজা বন্ধ করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওঠা-পড়ার শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? তবু শুনতে হবে। একঘরে এমন করে মুখ লুকিয়ে আরো কয়েকমাস কাটাতে হবে। কিন্তু এভাবে কতকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখবে? একদিন জানাজানি হয়ে যাবেই। কানাকানি তো শুরু হয়ে গেছে। তুমিও যে নির্ভাবনায় আছ তা নয়। মুখে না বললেও টের পাই, প্রতিমুহূর্তে নিজের সঙ্গে নিজের এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটা লড়াই তোমার ভেতর চলেছে। এরপরে তো সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই সংঘর্ষ বেঁধে যাবে। তখনও কি অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? ঋষিকে ঘেন্না করলে কিংবা নির্বোধের মতো অভিমান করলে তার কি আসে যায়? আসল অন্যায় যে করল তাকে শাস্তি দেয়ার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে কাকে শাস্তি দিতে চাইছ? এর মধ্যে মাতৃত্বের কোন গৌরব নেই। নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আত্মঘাতী হওয়ার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। বরং ঋষির উপদেশ মনে রেখে তাঁর মন্ত্রকে রক্ষাকবচ করে নাও। ঋষিদের ব্রহ্মবাক্য মিথ্যে হয় না—এ রকম একটা বিশ্বাস আছে লোকের।

চাপা সুদর্শনার কথা শুনে চমকে উঠি। নিজের মনেই বলি, এমন করে আত্মঘাতী করার মধ্যে সত্যি কোন বীরত্ব কিংবা মহত্ব নেই। এরকম একটা জেদেরও কোন কিছুই হয় না। তবু আমি মেয়ে বলেই হেরে যাচ্ছি, ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ে হার বাড়িয়ে নিচ্ছি। এ আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি হেরে যাব কেন?—এযে অপমানেরও লজ্জা! আমি লোককে মুখ দেখাব কি করে? আমার নিজেরই তো নিজের মুখ দেখতে লজ্জা হচ্ছে।

এবার আমার গায়ে হাত রেখে সুদর্শনা বলল: রাজকুমারী তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না। তোমার এ শরীরে উত্তেজনা ভালো নয়।

না, রাগে নয় দুঃখে, অপমানে, অভিমানে আমার ভেতরটা তেতে উঠল। যন্ত্রণারুদ্ধ কণ্ঠে বললাম: দোষ কী আমার একার? ঋষিও তো সমান অপরাধী। তোমার অংশে একটুও কম নয়। বরং, বেশি। জেনে শুনে তিনি যদি দায়িত্ব, কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে আমারও বা কি দায় পড়েছে? তাঁর নিষ্ঠুর

হওয়া যদি পাপ না হয়, তা হলে আমি পাপের ভয় করব কেন? কিসের পাপ? মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই গর্ভের রক্তপিণ্ডের দলাটা বোঝার মতো ঘেন্নায় বয়ে বেড়াচ্ছি? একটু মায়া-মমতা দেখাতে চাই না।

সুদর্শনা আমার কথা শুনে কৌতুক বোধ করল। মুখে তার চেপা হাসি। বলল: ও সব রাগের কথা। কিন্তু আমি তো জানি, হাজার চেষ্টা করলেও মায়ের বুকে স্নেহ-মমতার উপর বাঁধ দেয়া যায় না। সুরধনী যেমন শিবের জটাজাল উন্মোচন করে মর্তভূমি প্লাবিত করে সাগরের দিকে ছুটে চলে অনন্ত তৃষ্ণায়, অমনি এক প্লাবনে ভেসে যায় মায়ের সব যন্ত্রনা, রাগ, অভিমান ভয়।

ওর কথা শুনে আমার সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে উঠেছে। দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব দেখছি। খুব ভয় পেলে মানুষের যেমন চেহারা হয়, আমারও তেমনি চেহারা হয়েছে। শ্বাসবন্ধ করে নিজের ভেতরকার সব কষ্ট, যন্ত্রনা, হাহাকারকে প্রাণপণে নিঃশেষে শুষে নিতে লাগলাম নিজের বুকে। দুচোখ বোজা। নিশ্বাস পড়ছে না। ভীরু ভয়ে মুখ থেকে একটা কথাও বেরোচ্ছে না। সুদর্শনার দিকে তাকাতে ভয় করছে।

আমি চুপ করে আছি দেখে সুদর্শনা প্রসঙ্গ বদল করে বলল: থাক-সে, ওসব কথা বলে লাভ নেই। এখন কী করলে লজ্জা-সম্ভ্রম বাঁচে সেই কথাটাই বেশি করে ভাবা দরকার। আমি ভেবেছিও। মেয়ে মানুষের জীবনে ইজ্জতের দামটা সবচেয়ে বেশি। যার কোন ইজ্জত নেই, তার সম্ভ্রমও নেই। সে একটা ফালতু। তুমি না চাইলেও দুর্বাসার মন্ত্রই তোমার ইজ্জত বাঁচানোর অস্ত্র।

কথাটা আমার খুব মনঃপুত হলো না। অপমানে ঘেন্নায় বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। বলল: তুমি জানো না তিনি কতো নিষ্ঠুর, আর কত নীচ। সব কথা শুনলে তোমারও ঘেন্না হবে। আমি তাঁকে ঘেন্না করতে চাই। এভাবে আমাকে শাস্তি দিও না।

সুদর্শনা বলল: তোমার গর্ভে তো তাঁর সন্তান এসেছে। এটা তো সত্যি। এতো তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না।

হ্যাঁ, জানি। উত্তেজনায় আমি হাঁফাচ্ছিলাম।

তা হলে, জেদ করছ কেন? তাঁর অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত তো তোমাকে করা হবে। উপায়ও তিনি বলে গেছেন সে তো তুমি জান। বিপদ এবং সঙ্ক এড়ানোর এর চেয়ে ভালো উপায় নেই। ঋষিদের বাক্য লোকে মান্য করে সমীহ করে। মানুষের সমাজ ঋষিদের কথা বিশ্বাস করে বলেই আমাদে কৈফিয়ৎটা সহজ হয়ে গেছে। তুমি তো প্রাতে রোজ স্নান কর। অনেকক্ষণ ধ সূর্যস্তব কর। সবাই তোমাকে সূর্যের উপাসক বলে জানে। একদিন দুর্বাসা মন্ত্র পরখ করে দেখার জন্যে কৌতূহল বশে ইষ্ট দেবতা সূর্যকে আহ্বান করলে ভক্তের আহ্বানে দিবাকর তৎক্ষণাৎ সশরীরে উপস্থিত হয়ে তোমার প্রার্থনা পূরণ করল। ধর্মপ্রাণ মানুষ একথা অবিশ্বাস করবে না। বরং দেবতা কৃপালাভের জন্যে রমণীরা সমালোচনা না করে তোমার দুর্লভ সৌভাগ্যকে ঈ করবে।

সুদর্শনার এরকম একটা কৈফিয়তে হঠাৎই আমার ভেতরটা বিদ্যুৎ চম

মতো মুহুর্মুহু চমকাতে লাগল। মস্তিষ্কের অন্ধ কুঠুরিগুলোতে কে যেন দীপ জেবলে দিতে লাগল। অবাক বিস্ময়ে আমি এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার সম্মতি না পেয়ে সুদর্শনা বেশ একটু অসহিষ্ণু এবং বিরক্ত হলো। উষ্মা প্রকাশ করে বলল ঃ দুর্বাসাকে ঘেন্না করা সহজ। কিন্তু তার কপট মন্ত্রকে নিয়ে শঠতা করা কোন অধর্ম নয়। কপটের সঙ্গে কপটতা করা কিংবা মিথ্যের জবাব মিথ্যে দিয়ে দেয়ার নামই শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। বিষ দিয়ে বিষ তোলার অন্য নাম সঞ্জীবন অর্থাৎ বেঁচে উঠা।

তখন গভীর এক চিন্তায় মগ্ন। আমি দেখতে পাচ্ছি সুদর্শনা হাত নেড়ে মুখের বিভিন্ন ভঙ্গি করে কথা বলছে। কিন্তু তার কোন কথাই আমি শুনছি না। কেবল ওর মুখের উপর চোখ মেলে ছিলাম। হঠাৎই আমার আমিটা বিদ্রোহ করে বসল। দরজা খুলে ঘর থেকে আচমকা বাইবে এলাম। মাথায় আগুন জবলছে। ভালো মন্দ বিচার করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। ভেতরটা বিদ্রোহে ফুঁসছে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার মধ্যেকার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙেছে। আগ্নেয়গিরির গর্ভদেশের আগুন যতক্ষণ নিঃশেষ হয়ে বাইরে না বেরোয় ততক্ষণ তার গর্ভদেশ জবলে ; তেমনি এক জবলন্ত ক্রোধ নিয়ে ভোজ রাজের ঘরে ঢুকলাম।

অপরাহ্ন।

ভোজরাজ রাণী চিত্রলেখার সঙ্গে জমিয়ে পাশা খেলছিল। অসময় আমায় দেখে তারা দুজনে আশ্চর্য হলো। চিত্রলেখা বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল ঃ তুমি ? বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এমন করে কারো শয়ন ঘরে যে ঢুকতে নেই, তা-তো তুমি জান।

আমার মুখে চোখে একটা থতমত ভাব ফুটে উঠে। অপমানে মুখখানা গনগন করে। রাগ হয় চিত্রলেখার উপর। থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকি। বুকটা তোলপাড় করে। বুক জুড়ে অভিমানের মুদ্র।

চিত্রলেখা ভোজরাজের প্রিয়তম মহিষী। ভোজরাজের সঙ্গে যখন এবাড়ীতে লাম, তখন আমাকে দেখেই বলেছিল ঃ মেয়েটি কে গো ? একে কোথা থেকে নলে ?

ভোজরাজ বলল ঃ একে দত্তক নিলুম শূরসেনের কাছ থেকে। এখন থেকে ই বাড়ীর মেয়ে। এই বংশের সঙ্গেই ওর জীবনসূত্র গাঁথা হয়ে গেল। এখন থেকে ও আমাদের মেয়ে। আমরাই ওব বাপ মা।

চিত্রলেখা বুকের মধ্যে আমায় টেনে নিয়ে সস্নেহে বলল ঃ বড় ভালো মেয়ে গো। চোখে মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ, কথাবার্তায় বুদ্ধির ধার। কোথায় যেন একটা শিষ্ট্য আছে। তাই না ? আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা।

ভোজরাজ বলল ঃ শুধু আলাদা নয়, বিশেষ একজনও বটে। সংসারে ষের জঙ্গলের মধ্যে এই মেয়ে আলাদা। একটা রক্তকমল। আমার ছেলে নেই, মেযে থেকেই আমাদের সব হবে, আবার। আমাদের আর হারিয়ে যাওয়ার

ভয় থাকল না, শূন্য ঘর আমার ভরে যাবে আনন্দে, সুখে।

কথাগুলো দুর্বোধ্য লাগল। কিন্তু ক'দিনের ভেতর সন্দেহ কেটে গেল। এক সংসার থেকে আর এক সংসারের একেবারে অন্দর মহলের ভেতর ঢুকে পড়ল। অচেনা সবাই। আত্মীয় পরিজন সকলে। ক'দিনের মধ্যেই সব একেবারে একাকার হয়ে গেল। মনে হয় না, আমি বাড়ীর মেয়ে নই। এদের সকলের সঙ্গে আমার বহুকালের সম্পর্ক।

এর পেছনে যা কিছু কৃতিত্ব তা মহিষী চিত্রলেখার। মেয়ের মতো যেমন শাসন করে ভালো-মন্দ বলে তেমনি সোহাগে, আদরে, স্নেহ-মমতায় ভরিয়ে দেয় আমার বুক। রাগ, দুঃখ, অভিমান, কষ্ট থাকে না। চিত্রলেখাকেই মনে হয় আমার পূর্ব জন্মের মা।—বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাগুলো মনে পড়ে মিলিয়ে গেল।

এক বুক উত্তেজনা নিয়ে দৌড়ে আসার জন্যে হাঁফাচ্ছি তখন। ভেতরটা তেতে ছিল। চিত্রলেখার ভর্ৎসনায় এবং শাসনে মেজাজটা চড়ে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝাঁঝাল গলায় বললাম: জানি। খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু ঘরে আগুন লাগে যখন নিয়ম মানামানির সময় থাকে না। তেমনি, জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যা বাধাধরা পথ ছেড়ে হঠাৎ-ই অন্যপথ ধরে চলে। তখন সাধারণ নিয়মগুলোও মেনে চলতে পারে না।

চিত্রলেখা আর কথা না বলে চুপ করে গেল। ভোজরাজের দিকে চেয়ে বলল: আমি উঠে যাচ্ছি। তোমরা কথা বল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম: না। তুমি উঠতে পারবে না। তোমার যাওয়া চলবে না। এখানেই থাক।

তোমার হুকুম।

মা। তোমাকে আমি যেতে দিলে তবে তো যাবে?

চিত্রলেখা হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় বসল।

ভোজরাজ মিনমিনে গলায় বলল: তোমার মনটা আজ ভালো নেই। কী হয়েছে? আমাদের কাছে বস।

ঝংকার দিয়ে বললাম: বসতে আসিনি, বলতে এসেছি। মার সামনেই কথাটা তোমাকে জিগ্যেস করব। ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। মনে মনে পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পাইনি। আজ তোমাকেই তার জবাব দিতে হবে। আমাকে দত্তক নেয়ার এই নাটক করলে কেন?

চিত্রলেখা তিরস্কার করে বলল: ছিঃ। ওঁর মতো মানুষের নামে এমন অপবাদ দিতে তোমার মুখে বাঁধল না। ওঁর নিজের মেয়ে হলে এমন কঠিন কথা বলতে বুক ফেটে যেত।

সত্যি, বুক আমার ফেটে যাচ্ছে? চৌচির হয়ে যাওয়া বুকে কোন আগল নেই। তাই সব কথা গুছিয়ে বলতে না পারি যদি আমাকে ক্ষমা কর। আচ্ছা মা, আমি তো মেয়ে। সুবিচারের জন্যে আমি তোমাকেই প্রশ্ন করছি। তুমি

এর জবাব দাও। বাবার বংশরক্ষা কিংবা সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যা তো আমাকে দিয়ে সার্থক হবে না। তা হলে কোন উদ্দেশ্যে আমাকে দত্তক নিল? শুধু কি মেয়ের হাতে সেবা, যত্ন, পাওয়ার লোভে? মেয়ে সন্তানকে কে কবে ধরে রাখতে পেরেছে? তাকে তো পরের ঘরে যেতে হবে? সেখানে নতুন বংশের ধাত্রী হবে। তা-হলে, বাবার দত্তক নেয়ার উদ্দেশ্যটা কেমন করে আমি মেটাব বল? হাজার সদিচ্ছা থাকলেও মেয়ে হয়ে আমি কি তার ইচ্ছে মেটাতে পারি? মেয়ে মানুষের দ্বারা তা কি সম্ভব? — তুমি চুপ করে থাকলে যে আমার প্রশ্নের জবাব পাই না। বল? বল? উত্তর হয় না বলেই দিতে পাচ্ছে না।

বলতে বলতে আমার নেশা লেগে গেল। প্রশ্নটা তাদের দুজনের কাছে ছুঁড়ে দেবার জন্যে একটু দম নিয়ে আবার বলি ঃ কিন্তু দত্তক মেয়েকে দিয়ে বংশরক্ষা করা সম্ভব জেনেই বোধ হয়, এ বাড়ীতে আসার দিনেই বাবা তোমায় বলেছিল, আমাদের আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকল না। আমাদের সব হবে আবার এর অর্থ তো দত্তক মেয়েকে দিয়ে বংশরক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া। তাই তো বংশদীপের অভাবে হারিয়ে যাওয়ার কোন ভয় থাকল না। দত্তক কন্যা থেকেই তার সব আশা পূর্ণ হবে। ঘর ভরে উঠবে আনন্দে। আর সেজন্য আমার আসার বৎসরকাল মধ্যে দুর্বাসাকে আমন্ত্রণ করে আনা হলো। এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল তাতে। দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করে জরাসন্ধর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করা গেল এবং বংশরক্ষাও হলো।

চিত্রলেখা এবার চিৎকার করে উঠল। বলল ঃ কুন্তী! তুমি ভোজরাজকে মিথ্যে দোষারোপ করছ।

বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম ঃ মিথ্যে! না, না। বাবা কতদিন, কতসময় আমার সামনে তোমার কাছে আক্ষেপ করে বলেছে, কে আমাদের রাজ্য দেখবে? কার জন্যে রাজ্য সিংহাসন আগলাচ্ছি? মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় রাজ্য ঐশ্বর্য ছেড়ে বানপ্রস্থে যাই? কোন সুখের জন্যে লোকে বিয়ে করে? কিসের আশায়? বংশই যদি না রইলো তো এ ছাই রাজ্য নিয়ে আমি করব কি? কে রক্ষা করব কার জন্যে? কুন্তী বা আমাদেয় কতখানি সাধ পূরণ করবে? কিন্তু ও ছাড়া আমাদের আছে কে? আশার প্রদীপ বলতে তো ও। আমার দুঃখটা বুঝবে কি? আমার প্রত্যাশা কি খুব বেশী? এ রকম কিছু চাওয়া কিংবা আশা করা কুন্তীর কাছে অন্যায় কী?—এ সব কথার আমি অন্য মানে করতাম। কিন্তু হেঁয়ালীটা এখন স্পষ্ট। পরিকল্পনা করে, অনেক ভেবেচিন্তে তোমরা আমায় দত্তক নিয়েছ। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যে দুর্বাসাকে আমন্ত্রণ করে এনেছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। আমি ভোজরাজের বংশরক্ষার যন্ত্র মাত্র।

আমার সমস্ত গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ঘরের মধ্যে থমথমে আব-হাওয়া। ভোজরাজ-চিত্রলেখা আমার আচমকা প্রশ্নের আক্রমণে বোবা হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরম যেন ভেতরের সব রসটুকু শুষে নিচ্ছে। তাদের নিরুত্তর দেখে বললাম—আমার অভিযোগগুলো কী মিথ্যে? এসব অস্বীকার করতে পার? চুপ করে থেক না। আমার কথার জবাব দাও। পাথরের মূর্তির মতো মাথা হেঁট করে থাকলে, কিন্তু অপরাধ লঘু হয় না। দোষের মাত্রা

কমে না।

চিত্রলেখা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলল ঃ তবে কি তুমি কোন কেলেঙ্কারীর কাজ করছ? নিজের সাফাই গাইবার জন্যে এখন ভোজরাজকে দূষছ। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। একজন ভালো মানুষকে এভাবে হেনস্তা করে কেউ? ছিঃ

রাজমহিষী চিত্রলেখার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ একটু কৌতুক বোধ করলাম। বললাম ঃ চমৎকার! এখানে আমার মা নেই, বাবা নেই। তোমরাই আমার সব। আমার ইহকাল, পরকাল। তুমি তো মা। তোমার কাছেই আমি প্রশ্ন রাখছি। দুর্বাসার সেবা, যত্ন, পরিচর্যার ভার আমার উপর চাপানো খুব দরকার ছিল কি? এখানে তো বিশ্বস্ত, সেবাপরায়ণা সুন্দরী দাসী কিংবা পরিচারিকার অভাব নেই। তবু, ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলে, যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে তাঁর দেখাশোনার সব দায়িত্ব আমার মতো একজন অনভিজ্ঞা কিশোরীর উপর ছেড়ে দিলে কেন? এ কাজ তো যে কোন রাণীর তত্বাবধানে হতে পারত। কিন্তু করা হলো না কেন? তুমি তো বাধা দিতে পারতে। দিয়েছিলে কি? বরং শেখালে, পুরুষ মানুষকে একান্ত অনুগত ও বাধ্য রাখা, তাকে বশীভূত করা-মেয়ে জন্মের সার্থকতা। ব্যর্থ হওয়া তার লজ্জা। চিত্তজয়ের খেলায় মেয়ে মানুষের হেরে যাওয়ার মতো লজ্জা, অপমান কিছুতে নেই। একজন মেয়ের কাছে পুরুষের অনেক দাবি, আব্দার থাকে। মায়ের মতো হৃদয় দিয়ে সে সব ব্যথা, কষ্ট, দুঃখ যে মেয়ে বুঝতে না পারে তার মেয়ে হয়ে জন্মানোই বৃথা। আমার নিজের মাও হয়তো এসব কথা বলতো। কিন্তু তাঁর সস্নেহ, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি সর্বক্ষণ আমাকে পাহারা দিত। ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় একা ছেড়ে দিয়ে কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। একজন বয়স্থা আইবুড়ো মেয়েকে সর্বক্ষণ ঋষির সেবা-যত্ন, দেখাশুনার কাজে কিছুতে সম্মত হতেন না তিনি। অভিশাপের ভয়েও না। নিজের মা হলে যা করতো, তুমি কি তাই করেছ? একদিনও জানতে চেয়েছ কি, ঋষির আচরণ কেমন? আমার শরীরে মেয়েলী চিহ্নগুলোর পরিবর্তন দেখেও উদ্বিগ্ন মায়েদের মতো প্রশ্ন করেছ কখনও?

বলতে বলতে আমার লজ্জায় দম বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু কথাগুলো এভাবে বলতে পারায় বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম। মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম। আমার তখন কথা বলার নেশা ধরে গেছে। প্রতিরোধহীন যুদ্ধে একাই যুদ্ধ করছি নিজের সঙ্গে নিজে। একটা আত্মপ্রশান্তিতে মনটা যখন ভরে গেছে, সেই সময় ভোজরাজ মিনমিন করে বলল ঃ তুমি আমায় মিথ্যে দোষী করছ।

মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই মানুষটার উপর অভিমান, রাগ, আক্রোশ সব চেয়ে বেশি। বুকটা দুরন্ত উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ঘৃণায়, কপটতায়। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কি ঘটে গেল, জানি না। কানের মধ্যে ভোজরাজের সস্নেহ কথাগুলিই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে হেসে উঠল যেন। বাবা-মার কাছে সন্তানের কোন লজ্জা থাকে না। তাদের মতো বড় বন্ধু আর নেই।' অধরে বিচিত্র কৌতুক হাসি। চোখ দুটো খদ্যোতের মতো ধক ধক করছে। মেয়ে বলে আমার মধ্যে কোন আড়াল ছিল না। মার খাওয়া নির্যাতিত মানুষের

প্রতিহিংসা প্রতিশোধ আমার ভেতরটাকে কঠিন আর হিংস্র করে তুলল। এক বিষধর আমার মধ্যে ফণা তুলে ধরল যেন। বিষপূরিত দন্তে গরলের সুতীব্র যন্ত্রণা উগরে দেবার জন্যে বিষধর যেমন ছোবল দেয় তেমনি আমার বুকে দীর্ঘকাল ধরে জমানো ক্ষোভের সব বিষটুকু উগরে দিলাম ভোজরাজেকে। বললাম ঃ তা-হলে তোমার কাছে প্রশ্ন রাখছি। তুমি বল, বিদায় গ্রহণের সময় দুর্বাসা আমাকে দেখেই তোমায় বললঃ কুন্তী এক আশ্চর্য গুপ্ত মন্ত্রের অধিকারী। জননী হতে ইচ্ছে করলে ঐ মন্ত্রবলে যে কোন দেবতাকে সন্তানের জন্যে আহ্বান করতে পারে। এরকম একটা অদ্ভুত কথা আচমকা বলার কোন কারণ ছিল না। তবু তুমি বোবা সেজে রইলে। তোমার একবারও মনে হলো না, আমি কুমারী। আমার জননী হওয়ার জন্যে ঋষির এত ভাবনা কেন? আর কোন মন্ত্র নয় জননী হওয়ার মন্ত্র পাঠ দেয়ার তাঁর প্রয়োজন হলো কেন? তবু এ সম্পর্কে ঋষিকে কোন প্রশ্ন করলে না কেন? কোন কুমারী মেয়ে অনূঢ়া অবস্থায় স্বেচ্ছায় সন্তান চায়; না চাইতে পারে? তার কলঙ্কের ভয় নেই? স্বেচ্ছায় কুলটার অপবাদ নেবে কেন? সাধ করে, স্বেচ্ছায় কোন মেয়ে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে? এসব অতি সাধারণ প্রশ্ন, তোমার মতো বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে পড়েনি এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল? তা-ছাড়া জননী হওয়াটা তো বিবাহোত্তর কালের ব্যাপার। তখন যদি কোন রমণী জননী হতে না পারে তখন অন্য উপায়ের কথা ভাবে। আর এ তো বিবাহ পরবর্তী জীবনের সমস্যা। আমার সে ধরণের কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়নি। তবু ঋষির এ রকম একটা আচমকা কথায় তোমার কোন সন্দেহ হলো না দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এটা চমকে দেবার মতো কোন কথা নয়, তবু তুমি নিরুত্তর থেকেছ। একটা অপরাধবোধে ঋষি তাঁর অপকর্মকে গোপন করার কৈফিয়ৎ দিতেই আমার কলঙ্কের উপর দেবতার নামের ছাপ দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর, তুমি সব জেনে শুনে না জানার ভান করেছিলে। ষড়যন্ত্র করে আমার জীবনটা নোংরা করে দিলে। বাবার ভূমিকায় অভিনয় করে তুমি আমায় সঙ্গে শত্রুতা করলে, কিন্তু আমি তোমার কি করেছি? তোমার সব কথা বর্ণে বর্ণে শোনার জন্যে আমার এই দুর্দশা। এর দায় নেবে কে? আমি কোন অন্যায় করেনি, তা-হলে আমাকে সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কার স্বার্থে? কেন?

ভোজরাজ অপরাধীর মতো মতো মাথা হেঁট করে রইল। পাথরের মেঝের উপর তার চক্ষুদ্বয় স্থির। একটা অচল মাংসপিণ্ড বসে আছে যেন পালঙ্কে। একটুও নড়াচড়া নেই মানুষটার। ক্রুদ্ধ আক্রোশে আমি তাকে নাড়িয়ে দিয়ে বলি, কথা বলছ না কেন? আমার কথায় জবাব দাও।

সেই ঝাঁকুনিতেই ভোজরাজ বাস্তবে ফিরল। চমকে উঠে বসল। হাঁ, এসব আমার কিছু মনে হয়নি। আমি ভেবেছিলাম, ঋষি গোপনে তোমাকে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের পাঠ দিয়েছেন। সেই শিক্ষাকে পরিশীলিত মার্জিত শব্দে "জননী হওয়ার মন্ত্র" বলেছেন।

রাগে বিষধরের মতো ফোঁস করে উঠে বলি ঃ ছি! এখনও কপটতা করছ? একটা বড় সত্যকে মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে তোমার জিভে বাঁধছে না। প্রকৃতির নিয়মে

সব মেয়ে মা হয়। এটা ঋষির কাছ থেকে শেখার মতো কিছু নয়। নর নারীর গোপন সম্পর্কের কথা মাতাও কন্যাকে সসংকোচে বলে। লজ্জাও পায়। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝায়। আর ঋষি সেই সম্পর্কটি পরিশীলিত মার্জিত শব্দে প্রয়োগ করেছেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য কোন যুক্তি নয়। একটা হেঁয়ালী সৃষ্টি করে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্বামীর অপমানে এবং অসম্মানের আগুনে চিত্রলেখার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। মাথার উপর ছাদ না থাকলে মানুষ যেমন নিজেকে অত্যন্ত আশ্রয়হীন, বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করে তেমনি এক নিরুপায় অস্থিরতার বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে বলল ঃ এত যখন অবিশ্বাস তোমার তখন তুমি অভিযোগ করলে না কেন ?

লোকলজ্জার ভয়ে পারেনি বলতে। তবু মনে মনে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছি ঃ ছিঃ ঋষি ! তুমি মিথ্যাবাদী, ভণ্ড প্রতারক। তোমাকে বড় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি খেলা করেছ। আমার অপরাধ কী ? বিশ্বাসের অমর্যাদা করলে কেন ? আমি তোমায় শত্রুপক্ষের মেয়ে বলে কি শত্রুতা করে প্রতিশোধ নিলে ? পরিহাস করার জন্যেই কী হেঁয়ালী করা ? জননী হওয়ার জন্যে মানুষ নয়, দেবতাকে বরণ করার কথা বলে কার্যত তোমার নীতিহীন দুষ্কর্মকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছ। মানুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে বদনাম হয়, কিন্তু দেবতার সঙ্গে হয় না। কুমারীত্বের গায়ে কাদা লাগে না। ঋষিবর ! তোমায় এ শঠতা ঋষি পদবাচ্য নয়। একজন শত্রুর মতো। এরকমই একটা প্রতিবাদ ভোজরাজের কাছে প্রত্যাশা করা আমার কি খুব অন্যায় হয়েছিল ? কিন্তু বাবা সেজেও ভোজরাজ মুখে কুলুপ এঁটে থাকল।

চিত্রলেখা মরিয়া হয়ে বলল ঃ তাতে তোমার লাভ কী হতো ?

সত্যটা তো প্রকাশ পেত। কে কার সঙ্গে শঠতা, কপটতা করল তার রহস্য উদ্ঘাটিত হতো। আমার সন্দেহের অবসান হতো। মিথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াতে হতো না। এক বুক ঘৃণার ভার বয়ে বেড়ানোর কোন কষ্ট থাকত না। এটা কী কম লাভ !

এসব কতদিনের কথা। তবু কী আশ্চর্য, বুকের ভেতর তার স্মৃতির দীপ আজও তেমন জ্বলছে। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি। তখন সবে রাত হয়েছে।

প্রসব বেদনা ভয়ঙ্কর। একটা তীব্র কাঁটা ফোটা যন্ত্রণায় দেহটা মুচরে, দুমড়ে যাচ্ছে। সারা শরীর জুড়ে এক অব্যক্ত খিঁচুনি। এ যেন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে অদৃশ্য একটি শক্তির প্রাণপণ লড়াই হচ্ছে। যে লড়াই আমার আত্মজার সঙ্গে। চোখ ফেটে জল আসছে। অসহায়ের মতো তার কাছে মার খাচ্ছি। পেটের উপর কী দৌরাত্ম্য তার! কখনও খামচে ধরছে পেটটা, বাইরে বেরোনোর দরজাটা ধাক্কা দিচ্ছে এত জোরে যে, মুঠো করে দুহাতে বিছানা ধরে প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝছি। অবশেষে, সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে, আমার শক্তিকে পরাভূত করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জানিয়ে দিল জয় হয়েছে নবাগতের। আর, আমি পরাভূত, রক্তাপ্লুত, শ্রান্ত। নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছি শয্যায়। এক গভীর অবসন্নতায় ডুবে যাচ্ছে আমার চেতনা।

ভয়ে দু'চোখে বুজে আছি। এক কঠিন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্বেগ আর আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন করছি নিজেকে। চারপাশে অদৃশ্য ভীড়ের অস্তিত্ব অনুভব করছি। শত সহস্র সন্দেহ, কৌতূহল, জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে আমার ভয় করছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যি ঠোঁট, গলা শুকিয়ে আসছে। বড় অসহায় আর বিপন্ন বোধ করছি। এতদিন একরকম ছিলাম। সকলের চোখের আড়ালে নির্জনে একা থেকেছি। ভোজরাজ আর চিত্রলেখা ছাড়া রাজ অন্তঃপুরে আর কেউ জানে না আমার অজ্ঞাতবাসের রহস্য। কিন্তু এবার কী করবে? লোক জানাজানি হলে কী বলবে? তাদের সামনে আমি মুখ দেখাব কী করে? ভোজরাজও চুপ করে নেই। মনে মনে এক গল্প তৈরী করা আছে তার। লোকের কৌতূহলে জল ঢেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভোজরাজ নিজেই ঘোষণা করে বলবে যে, ইষ্টদেব সূর্য প্রসন্ন হয়ে এই শিশু সন্তান দিয়েছে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যা আর রইল না। এতে কি সব সমস্যা মিটে যায়? আমার অপবাদ, দুর্নাম কলঙ্কের ভার বহন করবে কে? আমার বাকী জীবনটার পরিণামই বা কী?

এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা যেন আমার জন্যে আমাকে ভাবতে বলল। একটাই তো জীবন। অন্ধকার ঘরে মিষ্টি প্রদীপ শিখার মতো তির তির করে কাঁপছে জীবনের স্বপ্ন, বাঁচার তৃষ্ণা, অনন্ত বাসনা।

এক লড়াই শেষ করে, আর এক লড়াই শুরু করেছি নিজের সঙ্গে। আশ্চর্য। পৃথিবীতে যাকে আনতে কত কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করলাম তার প্রতি হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম। স্নেহ, মমতা, দরদের পুকুর শুকিয়ে গেছে। হৃদয় আমার পাষাণ হয়ে গেছে। এক অব্যক্ত ঘৃণায় তার মুখ পর্যন্ত দর্শন করেনি। এটা ঠিক নিষ্ঠুরতা নয়, আমার এক ধরণের নীরব বিদ্রোহ। তাকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিয়েছি। তবু বিবেচক মন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—নবজাতকের অপরাধ কী? তার জন্মের জন্যে কতটুকু দায়ী সে? তাহলে, মায়ের ঘৃণা, বিদ্বেষ, উপেক্ষার পাত্র সে হবে কেন? কেন? বিবেকের প্রশ্নে চমকে উঠি। নবজাতকের দিকে তাকালে পাছে কোন দুর্বলতায় মন গলে যায়, মায়া হয়ঃ তাই চোখ বুজে রইলাম। একটা হাহাকার হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই বেজে যাচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে। শরীর মন কণ্টকিত হচ্ছে। তবু আমার মধ্যে তার প্রতি একটা কঠিন

উপেক্ষা ও ঘৃণাকে খুব স্পষ্ট করে টের পাই। আপন গর্ভস্থ-সন্তানের প্রতি জননীর এরূপ বিরূপতা স্বাভাবিক নয়। এর শেকড় অন্য কোথাও। তবু থেকে থে ক মনে হতে লাগল, ও আমার শত্রু। শত্রু ছাড়া কি? বিশ্বাসঘাতকের ছেলে ও। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? বড় হয়ে তো পিতার মতোই বদমেজাজী হয়ে মানুষের জীবনে অকল্যান এবং অশুভকে ডেকে আনবে। দুনিয়াতে সৎ বস্তু কিছু রাখবে না। সমাজ বলে কিছু থাকবে না। স্বেচ্ছাচারে, ব্যাভিচারে, দুর্নীতিতে সব নীতিবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। দুর্বাসার বিকল্প হবে। বিষবৃক্ষে বিষফলই ফলে। এই সন্তান তো দুর্বাসার শরীর থেকে জাত, তাঁরই আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এক প্রাণ। তাঁরই বীজ, তাঁরই রক্ত—কেমন করে আলাদা হবে! এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে প্রদীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশ-গতি। দুর্বাসা রইল না, কিন্তু তার প্রাণের অম্লান শিখা তো রয়ে গেল। এ সন্তান তো তাঁর সৃষ্টি আমার মাধ্যমে শুধু সৃষ্টি হয়েছে। এসব মনে হলে দুর্বাসার উপর আমার রাগ বিদ্বেষ, ঘৃণা হয়। নবজাতকের মধ্যে আমি তখন দুর্বাসাকেই দেখি। নবজাতকের রূপ ধরে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছে। তাকেই তখন মনে হয় প্রধান প্রতিপক্ষ। আমার জীবনকে তছনছ করতেই যেন দুর্বাসার প্রতিনিধি হয়ে আমার সঙ্গে আছে। মাথাটা গরম হয়ে যায়। কারণ, রক্তের ধারা তো আর বদলায় না। ভাঁটার মতো উল্টো স্রোত বওয়াও সম্ভব নয়। তাই বোধ হয় বুকটা এমন পাথর হয়ে গেছে। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমার এমন একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে যে তার দিকে ফিরে তাকানোর কোন কৌতূহল নেই। বিরূপতাকে জয় করার কোন চেষ্টা নেই।

সুদর্শনা থমথমে মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার কোলে নবজাতক। আমার নির্বিকার তার ভালো লাগছিল না। ভয়ে জিগ্যেস করতে পারছিল না। রক্তমাংসের দলাটা দু'হাতে নিয়ে তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছিল। আমার মন গলানোর জন্যে বলছিল—ছেলে তো নয় দেবদূত। স্বর্গের কবচ কুণ্ডল নিয়ে যে জন্মে তাকে জীবনযুদ্ধে হারায় কার মধ্যে? এই কবচকুণ্ডলই তোমাকে রক্ষা করবে। মা রাগ করলে হবে কি? তুমি নিজে তোমার রক্ষাকর্তা। কারো উপর ভরসা করে আসনি বাপু! অনেক ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে তোমাকে যেতে হবে, তাই তৈরি হয়ে এসেছ। কে, কি ভাবছে তোমায় নিয়ে, কী বদমতলব করছে, ওসব তোয়াক্কা না করেই তুমি তোমার নিজের পথে ধেয়ে যাবে। কোন বাধাই মানবে না। কারো সাধ্য নেই তোমার ক্ষতি করার। ঈশ্বর তোমার সহায়।

বিরক্ত স্বরে বললাম: একটু চুপ করবি। আমায় কি শান্তিতে থাকতে দিবি না। কথাগুলো বলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুলাম।

সুদর্শনা নির্বিকার গলায় বলল: কেন, তোমার কি ধারণা, তুমি শান্তিতে আছ? তোমার মধ্যে মায়া দয়া নেই সে তো জানি। কিন্তু এতখানি নিষ্ঠুর হবে ধারণা ছিল না। এখন কি করবে শুনি? তোমার রকম সকম দেখে ভোজরাজকে সংবাদ দিয়েছি।

ঝংকার দিয়ে বললাম: অপদার্থ। সংবাদ দেয়ার কথা তোকে বলেছে কে? ভোজরাজের গুপ্তচরগিরি করতে কি আমার সঙ্গে আছিস তুই।

তোমার অভিযোগ যে সত্য নয়, তুমিও জান। ভোজরাজের নাম শুনলে আজকাল তুমি এত খেপে যাও কেন?

আমার ভেতর সেই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াটা সুরু হলো। রাগ, অপমান, অভিমান শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মতো ছড়িয়ে গেল। কণ্ঠরুদ্ধ যন্ত্রণায় বললাম: মনে হয় মহৎ কিছু হওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু ভোজরাজ আমাকে সেটা হতে দিল না। আমাকে নিয়ে এমন এক নিষ্ঠুর পুতুল খেলা না করলে বোধ হয় আমার জীবনটা অন্যরকম হতে পারত। ভোজরাজ জীবনের গোটা ছকটাই উল্টে দিল। আমিও তার প্রত্যাশাকে ছিন্নভিন্ন করব নিজের হাতে। তুই আর দেরী করিস না। জানাজানি হওয়ার আগেই মঞ্জুষা করে অশ্বা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আয়। তোর কোন পাপ হবে না। সব পাপ তো ওর বাপের। ওর বাপ আমার বড় শত্রু। অমন হাঁ করে চেয়ে দেখার আছে কী? যা বলছি তাই কর। অন্ধকার পাপ ঢেকে দেবে। একটা অদ্ভুত চক্রান্তের অর্থহীন অধ্যায়ের এখানেই অবসান হোক।

সুদর্শনা বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করতে অন্ধকারে একা বেরিয়ে গেল। আর আমি বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম। অনেকক্ষণ দুটো ঠোঁট বজ্রের মতো এঁটে থেকে ভিতরকার সব যন্ত্রণা এবং আর্তির শব্দকে প্রাণপণে আটকে রাখলাম। বাইরে থেকে আমার সে কান্না কেউ শুনতে পেল না।

বোধ হয় আমার খুব পুণ্য ছিল। তাই, আমার শিশু সন্তানের কোন অনিষ্ট হয়নি। ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখল। স্রোতে হারিয়ে গেল না। এক জননী বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তো, আর এক জননী স্নেহ মমতার কোল পেতে কুড়িয়ে নিল। কুমারী জীবনের লজ্জা এবং কলঙ্ক মনে করে যাকে অশ্বা নদীতে বিসর্জন দিয়ে সমস্ত দায় থেকে, পাপ থেকে বিবেককে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম সে যখন ভীষণভাবে বেঁচে আছে – এই বাস্তব সত্যটা জানার পরে আমার ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। চোখের জল রাখতে পারি না। আমার কান্নাও চাপা রইল না।

সুদর্শনা আমাকে কাঁদতে দেখে হতভম্বের মতো চেয়ে রইল। অপ্রস্তুত বিস্ময়ে বলল: আরে! তুমি কাঁদছ কেন? ও ছেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

পেটে ধরলে যেমন মা হয় না, তেমনি পেটে না ধরেও মা হওয়া যায়। সেজন্যে তোমার কাঁদার কী আছে ?

সুদর্শনার প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা এবং বিদ্রূপ একটু বিঁধল আমাকে। সত্যিই তো আমি কাঁদছি কেন ? সে কথা সুদর্শনাকে বলব কী করে ? বুকটা ব্যথিয়ে উঠে। শ্বাস দ্রুত হয়। আবার একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে ভেতরটা। নিজেকে কৈফিয়ৎ দিতেই যেন বলি : আশ্চর্য হওয়ারই কথা। পাথর তো নই। মানুষের মন। কোথায় তার কত ধরনের ব্যথা, কতরকমের দুর্বলতা, শূন্যতা আছে,তা যদি মানুষের জানা থাকতো তা হলে মনের মনকে এত কষ্ট পেতে হতো না। নিন্দিত এবং ধিকৃত ছেলের প্রতি আমার অপরিমেয় দুর্বলতা ব্যাখ্যার অতীত এবং যুক্তিহীন। এই দুর্বলতা ঠিক পুত্রস্নেহ নয়, অন্য কিছু। একটা কিছু চিন্তা করে আমি আতঙ্কিত। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওর বেঁচে থাকার ভেতর আমি এক বিপুল ভাঙচুরের কাল্পনিক ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমার অপরাধের কৈফিয়ৎ চাইতে একদিন যে, ও বিদ্রোহ করবে না কে বলতে পারে ? তার বিদ্রোহ সহনীয়, কারণ তা স্বাভাবিক। আমারও প্রাপ্য। কিন্তু ওর ঘৃণার আগুনে আমার মর্যাদা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেই ভয়ে বিপন্ন বোধ করছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে সুদর্শনা বলল : তোমার এ ধরণের চিন্তা আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। তোমার ভাবনা তো সত্য নাও হতে পারে। ভুলও হতে পারে। তাকে ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। সংবাদ বাহকের মুখে শুনেছি ছেলেটির যেমন দীর্ঘ গড়ন তেমনি দেবতার মতো পবিত্র মুখশ্রী। দেখলে মন ভরে যায়। ও কখনো নিষ্ঠুর প্রতিশোধপরায়ন হতে পারে না।

স্বস্তিতে, তৃপ্তিতে এবং আনন্দে দুচোখ আমার বুজে গেল। চোখ বন্ধ করে তার স্পর্শ অন্তর মধ্যে অনুভব করলাম। কল্পনায় পলকের জন্যে তার মুখ দেখলাম। বুকটা আনন্দে বিষাদে উথাল পাথাল করে আর চোখ বারবার ভরে যায় জলে। চোখের উপর দিয়ে একটা অন্তহীন সময় বড় মন্থর গতিতে পার হয়। নিজের মনেই বলি ; পৃথিবীটা বড় মায়ার।

এসব কবেকার ঘটনা। আজ, এতদিন পরে অতীতের সমস্ত পথগুলো পরিক্রমণ করতে গিয়ে, সেদিনকার সব কিছু খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো মনে পড়তে

লাগল। সদ্যোস্ভিন্না যৌবনবতী কুন্তীকে নিয়ে আর এক নতুন নাটকের মহড়া আরম্ভ হলো। এই নব-নাট্যের নির্দেশক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। আর তার প্রধান প্রধান কুশীলব হলো, মহারাজ কুন্তীভোজ, হস্তিনাপুরের বিদুর এবং কুরুবংশের সর্ব প্রধান পিতামহ ভীষ্ম, যুবরাজ পাণ্ডু। এই নাটকের নায়ককে চোখে দেখা যায় না। তিনি একটা জালের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু নায়িকা আমি।

অপূর্ব এক নাট্য ঘটনার অবতারণা হলো আমার সামনে। সত্যিই সুন্দর। সময় যেন এখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। অপূর্ব এক স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে আমি অতীতকে দেখতে লাগলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছিল কক্ষের অভ্যন্তরে। প্রদীপ জ্বলছিল। তার আলোয় সুঠাম দীর্ঘদেহী এক ঋষিকে দেখলাম, ভোজরাজের মুখোমুখি বসে আছেন। তাঁর গায়ের রং কালো। এত গভীর কালো যে প্রদীপের স্বল্প আলোয় তাঁকে ভালো করে চেনা যাচ্ছিল না। বুক পর্যন্ত তাঁর কাঁচা পাকা মেশানো দাড়ি নেমে এসেছিল। পরনে গেরুয়া বসন, গায়ে কষায় রঙের পট্টবস্ত্রের উত্তরীয়, মাথায় চুড়া করে বাঁধা চুলের গোছ। হাল্কা আলো তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দুটি চোখে ঋষির অপার মহিমা হয়ে ঝরে পড়ছিল। মাথার চারিদিকে একটা জ্যোতিবলয় সৃষ্টি হয়েছিল। কেমন একটা উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার ভেতরটা। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সেই ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাব ঋষির কথায় দূর হয়ে গেল। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। এক অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা হলো আমার সামনে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই বক্তা।

ঋষিবর বললেন ঃ মহারাজ, সাম্রাজ্যের আয়তন, অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি—এই তিন ক্ষেত্রেই রাজগৃহের জরাসন্ধ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির চাইতে অনেক বড় ও শক্তিশালী। ভারত রাজনীতিতে সর্ব ব্যাপারে তার ভূমিকাও মুখ্য হতে বাধ্য। রাজনৈতিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে ভারতের ছোট ছোট চুরাশিটি রাজ্য জরাসন্ধের রাজনীতির ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে এক বিরাট রাষ্ট্রজোট গড়ে তুলেছে। এবং সে জোটে জরাসন্ধের ভূমিকাই যে বড ছায়া ফেলবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর এখানেই জরাসন্ধের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির সাফল্য। পরিবর্তিত অবস্থায় হস্তিনাপুরের কুরুবংশের ভীষ্ম জরাসন্ধের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা ভাগ করে নেয়ার দায়িত্বের ভিত্তিতে তারা নিজেদের ভেতর ঠাণ্ডা লড়াইর উত্তাপকে শুধু কমিয়ে ফেলল না, একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল। উভয়ের ভেতর মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারত রাজনীতির পটপরিবর্তন ঘটে গেল দ্রুত। পাল্টে গেলে রাজনীতির মানচিত্র। এরকম একটা অচেনা পরিবেশে রাষ্ট্রজোটের বাইরের রাজ্যগুলিকে নতুন করে শত্রু মিত্র ঠিক করে নিতে হচ্ছে। নতুন করে চিনতে হচ্ছে প্রতিবেশীদের। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে জরাসন্ধের অঙ্গুলি হেলনেই চলেছে গোটা ভারতরাজনীতি। জরাসন্ধের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ

নীতির বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো রাষ্ট্রশক্তি আর রইলো না। ফলে, ভারতে জরাসন্ধের প্রভুত্বই শেষ কথা। যাদব রাজ্যগুলি যদি এই বাস্তব সত্য ভুলে বিবাদে মেতে থাকে তা-হলে তাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে খুব দেরী নেই।

কুন্তীভোজের ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক রাজনীতিক তাকে সাবধান করে রাখল। অকপটে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করা নিরাপদ নয় মনে করে চুপ করে রইল, মুখ তুলে অনেকবার মহর্ষিকে দেখল। প্রত্যয়ের অভাবে বিপন্ন গলায় বলল: মহর্ষি, যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গে আপনার প্রীতির সম্পর্ক তো আজকের নয়, অনেক কালের। বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে আপনি কোন না কোন রাজ্যে ফি-বছরে আসেন। পরামর্শ যা দেয়ার আপনিই অযাচিতভাবে দিয়ে থাকেন। তবু বিচ্ছিন্ন যাদব রাজ্যগুলি পরস্পরের বিবাদ বিসংবাদে মেতে আছে। নিজেদের রেষারেষি কমিয়ে এনে পরস্পরের স্বার্থে এবং উপকারে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ভিত্তিতে কেউ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা ভাবে না। আমার একার উদ্যোগের দাম কী? আমি কি বা করতে পারি?

দ্বৈপায়ন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল: তা বটে। তবে, আপনি একটা কাজ করতে পারেন। পৃথার বিয়েটা হস্তিনাপুরের তরুণ নরপতি পাণ্ডুর সঙ্গে দিতে রাজি হলে জরাসন্ধের আগ্রাসী রাজনীতি থেকে যাদবদের দূরে রাখা সম্ভব। পাণ্ডু ও কুন্তীর বিয়েটা একটা উপলক্ষ্য। কুন্তী বুদ্ধিমানী, উচ্চাভিলাষী, শিক্ষিতা, রাজনীতি জ্ঞানও প্রখর। পাণ্ডু নরম মনের মানুষ। কুন্তী নিজের মতো করে গড়ে-পিঠে নিয়ে তাকে চালাতে পারবে। তুমি আমি না চাইলেও কুন্তী ও পাণ্ডুর পরিণয় বিধি নির্দিষ্ট। এ পরিণয় হবেই।

সে কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল থর থর করে। মুখখানা সহসা কে যেন আবীর মাখিয়ে দিল। কুন্তীভোজ বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল দ্বৈপায়নের দিকে। মুখেতে একটা বিব্রত অস্বস্তির ভাব ফুটল। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা ভাল করে ভেজাল। তারপর হতাশ গলায় বলল: মহর্ষি কুন্তীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সত্যি ভয় পাই।

দ্বৈপায়ন সরল চোখ দুটো তুলে ধরে বললেন কেন? হয়েছে কি?

কুন্তীভোজ হতাশ গলায় বলল: মহর্ষি, পাণ্ডুর মতো নিরীহ, সৎ ছেলেকে ঠেকাতে পারব না। তার সঙ্গে মিথ্যাচার করতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে! মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকা রাখা যায় না। একদিন অসাবধানে সত্যটা প্রকাশ হয়ে যাবে। সেদিনের কথা ভাবলে বুক কাঁপে। আজ না হলেও, পৃথার কলংক প্রকাশ পাবে। সেদিন স্বামী, সংসার সন্তানের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? নিজের মর্যাদা গৌরব হারিয়ে কত ছোট হয়ে যাবে সবার কাছে, ভাবলে আমি আর শান্ত থাকতে পারি না। এমন একটা কথা শোনার পরে কেউ কি শান্ত থাকতে পারে?

মহারাজ, আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন মানে হয় না। সবই আগে

কতে নির্ধারিত থাকে। বিধাতার কি মহান উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে কুন্তীর জন্ম। পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ তার পরিণাম। বলতে পারেন, দুর্বাসা কিংবা কানীন পুত্র তারই অঙ্গ। কোন ঘটনই বিচ্ছিন্ন নয়। হয়তো বিধাতার অভিধানে তারও প্রয়োজন আছে। ওসব নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই। এসব অদৃষ্টের আয়োজন। আপনি তার বিবাহের আয়োজন করুন। স্বয়ম্বর সভায় কৌরব নরেশ পাণ্ডুকে বররূপে আমি হাজির করব। আপনি কুন্তীকে তার গলায় বরমাল্য দিতে রাজি করুন।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম—আমি কি স্বপ্ন দেখছি। নিজের হাতে নাড়ী দেখছি সত্যি বেঁচে আছি তো? অদৃষ্ট আমায় নিয়ে এ কোন নতুন নাটক শুরু করল? বিধাতার মহান কাজ করতে কি সত্যিই আমার জন্ম! তাই কী সকলের থেকে একটু আলাদা আমি! এমন করে এক একজন মানুষকে নিয়ে ইতিহাস আপন গতিপথ পরিবর্তন করে, নইলে শূরসেন ছেড়ে ভোজরাজ্যে এলাম কেন? পিতা শূরসেনের তো বসুদেব ছাড়া আরো নয়জন পুত্র ছিল, কুন্তীভোজ তাদের দত্তক না নিয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্যে আমাকে দত্তক নি ল কেন? ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এমনি করে আসল নকল যাচাই হয়ে যায়। সে রকম এক ইতিহাসের পাত্রী হব ভাবতে বুকের ভেতর এক অনির্বচনীয় সুখের শিহরণের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

গর্ব করে বলার মতো স্বয়ম্বর সভা হয়নি আমার। এরকম অনাড়ম্বর, নিরুত্তাপ, স্বয়ম্বরসভা কোন রাজকুমারীর হয় না। রাজপুরীতে কোথাও বিবাহোৎসবের আমেজ ছিল না। অতিথি অভ্যাগতদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রের সংখ্যাও মুষ্টিমেয় ছিল। কন্যাপণ কিছু ছিল না। বীর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোন বীর আমাকে জয় করেনি। আমার জন্যে প্রার্থীদের কাউকে কপালের ঘাম এক বিন্দু ঝরাতে হয়নি। এ হেন স্বয়ম্বর সভায় দাঁড়িয়ে বহু প্রার্থীর মধ্যে থেকে ইচ্ছেমত স্বামী নির্বাচনের এক গৌরবময় অধিকার ছিল শুধু আমার। অন্যেরা কৃপাপ্রার্থীর মতো অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যাকুল ছিল। তবু আমাকে পাওয়ার জন্যে কারো ভেতর কোন হানাহানি উত্তেজনা কিংবা প্রতীক্ষা ছিল না। নির্বাচনের সময়

যে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দরকার হয় আমাকে তার পরীক্ষা দিতে হয়নি। মানে মর্যাদায়, বংশগরিমায় হস্তিনাপুর নরেশ পাণ্ডু ছাড়া আর কেউ সম্মানিত ব্যক্তি ছিল না। তাই স্বয়ম্বর সভায় ঢুকে উপবিষ্ট প্রার্থী রাজপুত্রদের দিকে তাকিয়ে আমার মাথাও ঘুরে যায়নি। অকুণ্ঠচিত্তে পাণ্ডুর গলায় মালা দিলাম। ভোজরাজের আনন্দের সীমা নেই। উৎফুল্ল হয়ে সকলকে শুনিয়ে বললেন: দ্যাখো, আমার মেয়ের পছন্দ দ্যাখো। সেরা জিনিষটি বেছে নিতে ভুল করেনি। যে যেমনটি চায়, তেমনটিই সে পায়।

ভোজরাজের কথা শুনে আমি চমকে উঠি। আমার মনের কথাটা ভোজরাজের তো জানার কথা নয়। সত্যি, আমি কোনদিন বুদ্ধিমান স্বামী চাইনি। বীরত্বকে যদি স্বামীত্বের ভূষণ করতাম তাহলে স্বয়ম্বর সভায় বীর্যশুল্কা হতাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। সভায় দাঁড়িয়ে বহু প্রার্থীর মধ্যে থেকে ইচ্ছেমত স্বামী নির্বাচনের গৌরবময় অধিকার নিজের হাতে রেখেছিলাম ওর ভেতর ভোজরাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব কতটা ছিল তা আমি জানিনে। তবে, কাকতালীয়ভাবে তাঁর চাওয়ার সঙ্গে আমার ইচ্ছেটা মিলে গিয়েছিল। আমি শুধু স্বামী নির্বাচন করেনি, সেই সঙ্গে তার রাজ্যের একজন রাণীর মতো রাণী হয়ে উঠার কথা বেশি ভেবেছি। আমার বর যে হবে বংশগরিমায়, মানে মর্যাদায় সকলকে ছাড়িয়ে যেন যায়। তাকে বিয়ে করে আমি হতে পারি যেন সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজপরিবারের রাজবধূ এবং কর্তৃত্বশালিনী রাণী। এমন স্বামী আমি চাই, যাকে পেলে তার উপর আমার অবাধ কর্তৃত্ব থাকবে, যে আমার রাজ্য পরিচালনার বুদ্ধি ও পরামর্শকে স্বাভাবিকভাবেই সমাদর করবে। পাণ্ডুর মতো শান্ত নিরীহ ভীরু মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে মনে হলো, স্বপ্নের রাজপুত্রের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। মুহূর্তে কি যেন ঘটে গেল বুকের ভেতর। আত্মবিস্মৃতি ঘটল। অকুণ্ঠচিত্তে হাতের বরমাল্যখানি তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বললাম: ভাগ্যের নির্দেশ মেনে আমি তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করলাম।

পাণ্ডু আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। তারপর হাত ধরাধরি করে পায়ে পায়ে বাসর ঘরে যাই। মুগ্ধ দুটি চোখে মেলে ধরল পাণ্ডু আমার চোখের উপর। বলল: আমিও তোমাকে পাওয়ার জন্যে, দেবার জন্যে এসেছি কুন্তী। আমি চাই তোমায়।

লাজুক হেসে মাথা হেঁট করে সবিনয়ে বললাম: আমার আছে কী, যা তোমাকে দিতে পারি।

যে চোখ দিয়ে আমাকে দেখেছ, যে মন নিয়ে আমার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিলে, সেই চোখ আর মন আমাকে দাও। তাহলেই আমার সারা জীবনের চাওয়া পাওয়ার ঘর ভরে উঠে আমি ধন্য হয়ে যাব।

ওর গলায় স্বরে খুশিতে ভরে যায় মন। কে জানে? কি ছিল ওই কণ্ঠস্বরে? ভালোবেসে ফেলেছি শুধু কথার জন্যেই।

ফুলশয্যাররাতে ও আমাকে বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আদর করল। বলল: আমার প্রাণে অনেক ভালোবাসা আছে। এসবই তোমার জন্যে জমিয়ে রেখেছি।

কথার যাদুকর ও। কথা দিয়েই আকাশে মেঘ জড়ো করে অলকানন্দ নামাতে পারে। আমার বুকের ভেতর বর্ষণ শুরু হয়েছে। ওর মুখ আমার কানের কাছে, গালের উপরে, ও আমাব কানে ফিসফিস করে বলছে আমার প্রাণের ভেতরে সুধা আছে চাও কি? ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট আমার অধর স্পর্শ করে রইল। নরম মধুর স্পর্শে আমার মুখটা খুলে গেল। আমি মুখে ওর মুখের স্পর্শ পেলাম। আমার সারা শরীর গান গেয়ে উঠল। আমিও ওর গলা বেষ্টন করে আমার অনাবৃত বুকের উপর মুখখানা চেপে ধরলাম। শৃঙ্গারমোহিত নারীর মতো আসঙ্গের আনন্দঘন আশ্লেষে তাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার অতৃপ্ত উল্লাসে অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে সঙ্গমে প্ররোচিত করি তাকে। এক আশ্চর্য স্থবিরতার শিকার হয়ে শায়িত দেহের উপর উপুড় হয়ে অক্ষমতার অপমানে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। কুন্তী, আমি পারছি না। সত্যি আমি পারছি না। আমি অক্ষম। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

আমার শরীর মন চমকে উঠল। আকাশ জোড়া বিদ্যুৎলেখার মতো চমকিত হতে লাগল আমার বুকের ভেতরটা। আশাভঙ্গের নিদারুণ বেদনায় আমার শরীর অসাড়। শরীর থেকে রক্তমাংস যেন উধাও হয়ে গেছে। আমি চোখ বুজে আছি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এর মধ্যে যেন পৃথিবীটা আমার কাছে বদলে গেছে। আমার জীবনে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবতেই পারি না।

হঠাৎ, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বলে পাণ্ডু দু'হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধরে করপল্লব চুম্বন করল। ও আমার হাত ছাড়ল না। আমার হাতের পাতা দুটো ওর হাতের মধ্যে নিপীড়িত হতে লাগল। আশাভঙ্গের ছাই হয়ে গিয়ে ও নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করছিল প্রাণপণে। সম্বলহীন মানুষের মতো, নিরাশ্রয়ের মতো আমার হাতের উপর মুখ রেখে ও ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করছিল। আমি বাধা দিলাম না। হাতখানা টেনেও নিলাম না। তার কাছ থেকে ছুটে পালাতেও চাইনি। একই সঙ্গে শরীর ও মনের বিচ্ছেদের বোবা যন্ত্রণা নিয়ে নিজের মনে কাতরাচ্ছি, এ কি অন্যায়! এ কি নিষ্ঠুরতা! কী করি এখন? আমার শরীর মন অবসন্ন হয়ে আসছে। আশ্চর্য! এই সময়েও আমাকে একটুও কাছে টানল না। আমাদের মধ্যে এখন অনেক ব্যবধান ও জানে। পৌরুষের লজ্জা, ব্যর্থতা, অপমান, পরাভবের দুঃখ, গ্লানি, অসম্মান নিয়ে ব্যবধানকে দৃঢ়তার সঙ্গে ও রক্ষা করছিল। ওর আত্মনিপীড়নের ক্ষমতা দেখে আমারই করুণা হলো। করুণা ছাড়া কি বা করতে পারি? আমার কপালটাই মন্দ।

মনে হচ্ছে, আমার মতো দুখী আর কেউ নেই। শূন্যতা শুধুই শূন্যতা ঘরে বাইরে চারধারে। সাতপাকের বিয়ের বাঁধনটা গলায় ফাঁস মনে হলো। এক অদৃশ্য দড়ি দিয়ে আমি আষ্টে পিষ্টে বাঁধা ওর সঙ্গে। সাধ্য কি, বেঁচে থাকতে ঐ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলি। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর অবসাদ। সত্যি এই অবুঝ এলোমেলো জোড়াতালি দেওয়া মিথ্যে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে আর কোন আকর্ষণ নেই। কেবল পাণ্ডু অচল পাষাণের মতো আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। এইটেই বাস্তব সত্য। ব্যর্থ জীবনের এক জ্বালা-

ধরা অনুভূতিতে আমার বুকটা টনটন করতে লাগল। বাজপাখির মতো পাণ্ডু ছোঁ মেরে আমার বিয়ের সামান্য সুখটুকুও ছিনিয়ে নিল। নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা শরীরী আকর্ষণের বাইরে কিছু নয়। বিয়ে হলো সেই ইচ্ছে পূরণের বন্দোবস্ত। সমাজ অনুমোদিত পথে একজন পুরুষকে ও একজন নারীকে পরস্পরের দেহের উপর পূর্ণ অধিকার অর্পণ করার অন্য নাম বিয়ে। এটা বিয়ের শেষ কথা না হলেও অন্যতম শর্ত। সেই অধিকার ও সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অসহনীয় শরীর ও মনের কষ্টের কাছে রোগের কষ্ট কিছু নয়। সেই প্রথম বুঝলাম আমি। বোধ হয়, মুখে একটা ভয়ের চিহ্নও ফুটল।

হস্তিনাপুরের দিকে রথ ছুটল। কুন্তীভোজের একটা ছোট্ট অশ্বারোহী দলের পাহারায় আমাদের পাঠানো হলো। এমন প্রাণহীন, উৎসবহীন, অনাড়ম্বর যাত্রা কোন রাজার বিয়েতে হয় না। যাত্রার এহেন দৈন্যের কারণ কী, জানি না। বিয়ের সুরু থেকে বিদায় দৃশ্য পর্যন্ত রাজকীয় কোন আড়ম্বর নেই। অথচ, সব মেয়ে স্বপ্ন দেখে বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হবে। কিন্তু বাস্তবে যখন তা হয় না, এক নিদারুণ আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় তখন বুকের ভেতর রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। বাইরে তার কষ্টটা চোখে দেখা যায় না! অনুরূপ এক যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হতে হতে চোখ ভরা জল নিয়ে রথে উঠলাম। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী আমি।

রথ ছুটছে: চাকার একটানা ঘর্ঘর শব্দ আর অশ্বের ক্ষুরধ্বনি জনমানবহীন, লোকালয়বর্জিত পথের নৈঃশব্দ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে শনশন করে বাতাস কেটে ছুটছিল। দ্রুত পিছিয়ে পড়া পথের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে বারবার পিছনে ফেলে আসা ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল। পাণ্ডুর সঙ্গে আমার বিয়েটা পারিবারিক নিয়ম মেনে হয়নি। এর ভেতর কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে। হয়তো বা গোটা ব্যাপারটাই একটা চক্রান্ত। স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডু ছাড়া হস্তিনাপুরের আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল না। আশ্চর্য! বিয়ের পরেও হস্তিনাপুর থেকে কেউ এল না আমাকে নিতে; কোন দায়িত্বশীল রাজ-প্রতিনিধিও পাঠানো হলো না। সব কেমন অদ্ভুত লাগল। একটা অশুভ ভাবনা মনটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। শীঘ্রী একটা কিছু ঘটবে আমার জীবনে। এরকম একটা আশঙ্কায় মনটা মুষড়ে গেল। নিঃশ্বাস আটকে এল। বুকের

কাছে একটা কষ্ট হয়।

পাণ্ডু অপরাধীর মতো ভীরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল অন্যদিকে। যেন আমার কাছে তার অপরাধ রাখার জায়গা নেই। তাই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল।

এক উৎকর্ণ বোবা জিজ্ঞাসা নিয়ে আমিও পাণ্ডুর মুখের দিকে সংশয়ে তাকিয়ে আছি। এই সুদর্শন ও অদ্ভুত মানুষটির প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ এবং একে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশা আমাকে পেয়ে বসল।

ঝাঁকুনির চোটে পাণ্ডুকে ক্লান্ত লাগছিল। কথা বলতে পারছিল না। চোখে তুলে তাকাতেও তার সাহসে কুলোচ্ছিল না। এক উদাস অন্যমনস্কতা নিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। চোখে অপমানের লজ্জা। কূট সন্দেহে ভেতরে ভেতরে সে একটা অস্বস্তি ভোগ করেছিল।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় স্বগতোক্তি করে বললাম: সবাই আমাকে নিয়ে খেলার পুতুলের মতো যা খুশি করছে। ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার। আমাকে নিয়ে একটা অদ্ভুত ষড়যন্ত্র চলেছে। এসব কথা তো কেউ মুখ ফুটে বলে না। কিন্তু আমি মানুষের হাব-ভাব, চাল-চলন দেখলে টের পাই। বাতাস শুঁকলে বলতে পারি কী হতে চলেছে। সত্যি কী হয়েছে আমাকে খুলে বল তো।

অপ্রস্তুত ভাবেই পাণ্ডু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল মানে, আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এ রকম একটা ঘটনার জন্যে আমার কিছু করার ছিল না। বিশ্বাস কর, আমি নির্দোষ।

নির্বিকারভাবে বলি: বললাম তো কেউ মুখ ফুটে সত্যি কথা বলে না। ভয় যে পায় তা নয়; রহস্য সৃষ্টি করে সন্দেহের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। আর সেই বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পেরে যায়।

পাণ্ডুর চোখ মুখে একটা অস্বাভাবিক অপ্রকৃতিস্থ ভাব ফুটে উঠেছিল। কথা বলতে একটু সময় নিল। নিজের হাতের রেখাগুলোর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা জাগল। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল: প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা আচমকা ঘটে যার কোন প্রস্তুতি থাকে না তার নিজেরও। আমার বিয়েটা তেমনি এক ঘটনা। এখন মনে হচ্ছে ঋষি দ্বৈপায়নের কথা শুনে আমি মহাপাপ করে ফেলেছি। তোমার চোখে আমি অপরাধী হয়ে গেছি। কিন্তু আমার দোষ কী? তোমাকে সব কথা বলার সুযোগ পেলাম কোথায়?

পাণ্ডুর উপর বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললাম: তুমি তো ছেলেমানুষ নও। একটা দেশের রাজা। তোমার উপর সে দেশের ভালো মন্দ নির্ভর করছে। আর তুমি বোঝ না, তোমার দোষ কী? এসব কথা কেউ শোনে না, বিশ্বাসও করে না। এটা কোন যুক্তি নয়। রাজার কোন দুর্বলতা থাকতে নেই। দুর্বলতাই তোমার দোষ, অপরাধ, এবং পাপ।

অসহায়ের মতো পাণ্ডু বলল: পিতামহী সত্যবতী বললেন, দ্বৈপায়ন তোর

বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে। মেয়েটি দেখতে খাসা। যেমন মুখশ্রী তেমনি গায়ের রঙ আর গড়ন। এক ঢাল চুল, গোল মুখ, টানাটানা চোখ, টিকলো নাক, দেবী প্রতিমার মতো। বিশ্বাস কর, বিয়ের কথা শুনে একটুও খুশি হয়নি। দুচোখের দৃষ্টির কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হয়। বুকের ভেতর কী যেন ঢেউ দিয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলি ঃ পিতৃব্য ভীষ্ম তো অন্যত্র মেয়ের সন্ধান করছেন। শুনেছি কথা বার্তাও পাকা হয়ে গেছে। এখন অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ করা তোমাদের উচিত হবে না।

সত্যবতী বেশ একটু ক্ষুন্ন হয়ে ধমকে দিয়ে বলল ঃ সে ভাবনা তোমার নয়। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতেও হবে না। ওজন্যে তোমার দুশ্চিন্তারও কারণ নেই। বরং তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবলে আমার দুশ্চিন্তা যায়। চিরদিন বোকাই রয়ে গেলে। তোমার এই সরলতার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হবে। নিজের অবস্থায় ভাল মন্দ বোঝ না।

তবু পিতৃব্যের পরামর্শ ছাড়া কিছু করতে—

কথা শেষ হওয়ার আগে পিতামহী তিরস্কার করে বলল ঃ ভীষ্মকে যা বলার আমি বলব। তোমার বিয়েটা দ্বৈপায়নের পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গেই হবে। দ্বৈপায়ন আমার ছেলে, তোমার পিতা। সন্ন্যাসী মানুষ। তার উপর আমার বেশি আস্থা থাকা স্বাভাবিক। তোমার প্রতি তার দরদ, মমতার ভেতর কোন স্বার্থ কিংবা কৃত্রিমতা নেই। তার মতো হিতৈষী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভীষ্ম কখনও হতে পারে না। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে দ্বৈপায়নই তোমার অভিষেকের পথ সুগম করেছে। রাজপদে তোমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করলে ভালো হয় দ্বৈপায়নের চেয়ে বেশি বোঝে কে? সব দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে ফেলে কালই দ্বৈপায়নের সঙ্গে চুপি চুপি ভোজরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিয়ে ভীষ্মকে তাক লাগিয়ে দাও।

বিশ্বাস কর কুন্তী, পিতৃব্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি একটু শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু আমার সে মনের খবর কে রাখে? মিছিমিছি তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে গেলাম। একটা কষ্ট বিন্ধ ব্যথায় আমার ভেতরটা টন টন করতে লাগল। প্রতিমুহূর্ত আমার চেতনার ভেতর এক বিন্দু আলোর মতো পিতৃব্যের মুখখানা জ্বল জ্বল করছিল।

আমাকে মৌন থাকতে দেখে মহর্ষি দ্বৈপায়ন মৃদু মৃদু হাসছিলেন। পিঠের উপর হাত রেখে মধুর কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে বলল : ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও বীর্যবান, চতুর উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতালোভী এবং অসাধারণ তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। আর তুমি সুদর্শন হয়েও ভীরু, দুর্বল সরল আপোষকামী। তোমার মধ্যে একটা শিশু সুলভ ভাব আছে। তাই স্বাবলম্বী হতে পারছ না। নির্ভরতা তোমাকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখছে। এটা ভাল নয়। ভীষ্ম তোমাকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের অভিষেক করতে চাইনি। চাতুরী করে আমি তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছি। ভীষ্ম নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছে। বিয়ে করে তুমি সংসার ধর্ম কর, ভীষ্ম চায় না। আমি তার মনের কথা জানি। বিয়ে দেবার নাম করে তোমাকে তার অনুগত ও বাধ্য রাখবে।

তারপর যথেষ্ট ক্ষমতা সঞ্চয় করে, রাজ্য পরিচালনায় তোমার অপটুতা প্রমাণ করে, রুগ্ন এবং অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সিংহাসনচ্যুত করবে। আমি দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তোমার জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টাআসবে। তাই দেশে দেশে ঘুরে তোমার উপযুক্ত সহধর্মিনী খুঁজে বেরিয়েছি। অবশেষে তার দেখা পেলাম ভোজরাজ্যে। সে এক অসাধারণ রমনী। সে সুন্দরী বুদ্ধিমতী আর শিক্ষিতা। মানবিক সব গুণের মধ্যমনি—তার বহু রূপ, তার লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ভীষণ। সে জানে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তাকে। কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সময় সময়। একজন সেনাধ্যক্ষের মতো তার চোখ, বুদ্ধি, কৌশল, এবং সহিষ্ণু তার হৃদয়ও বিশাল, করুণা কি অসীম। যৌবনের দাগিদে তোমার হৃদয় জ্বলতে চাইছে? তাকে সে নির্বাপিত করতে পারে। তুমি যদি উচ্চাভিলাষী না হও, সে তোমার অন্তর বিকশিত করবে। তোমাকে দেখিয়ে দেবে জয়ের পথ। তুমি ক্লান্ত, অবসন্ন হও যদি, তার অন্তরে লুকানো সান্ত্বনা দিয়ে তোমাকে সঞ্জীবিত করবে, উদ্দীপিত করবে। হতাশায় তুমি নিরুদ্যম হলে সে তোমাকে উন্নীত করতে সক্ষম, সক্ষম তোমাকে বিজয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে। আর এই ভাবেই একজন স্ত্রীলোক অক্ষম অযোগ্য পুরুষকে পরিচালনা করে পৃথিবী শাসন করে। আমি সেই রমণীকে দেখেছি। প্রতিকূল অবস্থাকে ধৈর্য ধরে উত্তীর্ণ হওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে তার মধ্যে। তার শক্তি, প্রভাব পুরুষের চারপাশে অদৃশ্য বায়ুর মতো ঘিরে থাকে। এরকম রমণীকে সহধর্মিনী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন সত্যিই যে পাণ্ডুর কাছে আমার নামের এরকম প্রশস্তি করতে পারেন ভাবতে অবাক লাগল। মুগ্ধতা সারা শরীরে ঢেউ দিয়ে গেল। অধরে মৃদু হাসির আভা ফুটল। নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে পাণ্ডুর মুখের উপর জিজ্ঞাসা নিবিড় দৃষ্টি মেলে ধরি। দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। অবাক বিস্ময় নিয়ে ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলাম। পাণ্ডু চুপ করলে বললাম: তুমি কি বললে?

পাণ্ডু হঠাৎ লজ্জা পেয়ে হাসল। বলল: আমার ভাগ্যে যা লিখিত তা তো হবেই। স্বয়ম্বরে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হলে, সে সাফল্য হবে গৌরবময়, আর ব্যর্থ হলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জার।

ওর দিকে দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম: এখন তোমার মনে কোন অবস্থা চলেছে? সাফল্যের গৌরবতৃপ্তি, না দুর্ভাগ্যের অতৃপ্তি আর আশঙ্কা!

পাণ্ডু অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বলল: দুটোই। হস্তিনাপুরের দূরত্ব যত কমে আসছে ততই আমার ভয় করছে। মনে অজস্র চিন্তা। শেষ ভরসা তুমি। দ্বৈপায়নের কথায় তুমিই দেখাবে জয়ের পথ, বাধা উত্তরণের রাস্তা।

পাণ্ডুর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা শক্তির উৎস বেজে উঠে। ওর কথাশুনে আমার ভেতরটা চমকায়। বুকের মধ্যে কেমন যেন দামামা বাজতে থাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! পাণ্ডুর মনে এখন আর দ্বিধার কষ্ট নেই। আমার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: তুমি চুপ করে আছ কেন?

একটু হাসার চেষ্টা করি। বলি: উত্তর জানা নেই বলে চুপ করে আছি।

তুমি এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছ আমাকে। একটা চাপের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

কেন ?

আমার জন্যে তো ভয় তোমার। আর সেই আমাকে তোমার রক্ষাকর্তা ভাবছ। কিন্তু আমি কী অন্যায় করেছি যে আমাকে এত শাস্তি পেতে হবে? মহর্ষি দ্বৈপায়নের নির্দ্দেশে তোমাকে বরমাল্য দিয়েছি। তিনি তো দেখেশুনে পছন্দ করে. লোক দেখানো স্বয়ম্বর করে আমাকে হস্তিনাপুরের রাণী করে আনছেন। তাহলে সেই মহাপুরুষ অন্তরালে থাকবেন কেন? তাঁর কী কোন দায়িত্ব নেই? হস্তিনাপুরের রাতবধূ হওয়ার পথে যখন এত বাধা-বিপত্তি তখন সত্যগোপন করে আমাকে প্র ারিত করলেন কেন তিনি? বেশ তো ছিলাম! মিছিমিছি আমার জীবনে এই সংকট সৃষ্টির দরকার কী ছিল? জেনে শুনে, তুমিই বা আমাকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে আনলে কেন? তোমার পিতামহী তো আছেন মেয়েমানুষ হয়ে তিনি যদি মেয়েমানুষের অসুবিধেটা না বোঝেন, তা-হলে বুঝবে কে? তোমরা সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করলে কেন? রাগে. ক্ষোভে, অপমানে, মনের জ্বালায় আরো অনেক কিছু বলতে গিয়ে গলাটা কথার মাঝখানে বুজে এল। দু'চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল।

পাণ্ডু অসহায়ের মতো মাথা নাড়াল কয়েকবার। তারপর বলল: ভয়টা হয়তো আমার কল্পনা। এমনটা নাও হতে পারে। আসলে, আমার মনের জোর নেই তেমন। কোনরকম গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলেই আমার মধ্যে পালাই পালাই ভাব জেগে উঠে? যারা বিপর্যয়ের মুখোমুখি সাহসের সঙ্গে দাঁড়ায়, তারা লড়াই করে বুদ্ধির জোরে। কিন্তু আমার বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়। বিপদ বাধার বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার বুদ্ধি এবং মনের জোর তোমার আছে বলে শুনেছি। তাই নির্ভয়ে তোমাকে আঁকড়ে ধরে আশ্রয় চাইছি। আমার তুমি ছাড়া আর আছে কে?

পাণ্ডুর নির্ভরতা, আস্থা শিশুর মতো। আমিই ওর নিরাপদ আশ্রয় এরকম-ভাবে আত্মসমর্পণ করলে কি তার উপর রাগ, বিদ্বেষ থাকে? আমার ঘৃণার আগুনে জল ঢেলে দিল। যা কিছু গ্লানি ছিল তাও মুছে গেল। আস্তে আস্তে বলি: তুমি কী বলতে চাইছ বুঝছি না। আমি নতুন বউ। অচেনা পরিবেশ। কারো সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। এখানে কোন ব্যাপারে আমি তর্ক করতে পারি না। নিজের বলে অধিকার দাবি করা নতুন বউর ধর্ম নয়। তার ধর্ম সমস্ত কিছু মান অপমান, অনাদর, অসম্মান, আঘাত, তিরস্কার মুখ বুজে সহ্য করা। সব কিছু মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া। সহিষ্ণুতা দিয়ে একদিন তার সব প্রতি-কূলতাকে জয় করে ঘরে ও মনে শান্তির বাতাবরণ রচনা করা। এটাই হলো মেয়ে-মানুষের টিকে থাকার নীতি, তার লড়াই-র ধর্ম। পুরুষ হয়ে মেয়ে মানুষের অসহায়তা তুমি বুঝবে না। তোমার প্রত্যাশাকে পাওয়ায় পর্যবসিত যদি না হয় তা-হলে সেরকম আস্থা নিয়ে প্রত্যাশা করলে আমার অক্ষমতাই তোমার কাছে আমাকে ছোট করে দেবে। তাই বড় ভয় করছে।

হস্তিনাপুরে পা দেয়ার ক'দিন পরেই টের পেলাম পরিবারের ভেতরে আমাকে নিয়ে একটা টানা পোড়ন চলেছে। কেউ কিছু না বললেও বুঝতে তো পারি। আমায় নিয়ে মূল সমস্যাটা কোথায়? অবাঞ্ছিতের মতো আমি হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি। যাকে বলে অনধিকার প্রবেশ। এখন ভদ্রতা করে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিতে সংকোচ বোধ করছে, আমার এই অনধিকার প্রবেশটাকেও মানিয়ে নিতে পারছে না। একটা কঠিন সংকটের মধ্যে পড়েছে সবাই।

দেবর বিদুর আর পিতামহী সত্যবতী ছাড়া আর কেউ ভালো করে কথা পর্যন্ত বলে না। পরিচারিকা এবং দাস-দাসীরও চাল চলন কেমন অস্বাভাবিক। তাদের কারো সান্নিধ্য আমার ভালো লাগে না। বোকার মতো আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। কী দেখে তারাই জানে। যেন কোন আজব বস্তুর সন্ধান পেয়েছে আমার মধ্যে। যেন আমি তাদের ভেতর একজন নই। যেন অন্য জগতের জীব। তাই চেয়ে চেয়ে দেখে। ওদের ওই চাহনি আমার ভালো লাগে না। নতুন পরিবেশে নিজেকে বড় একা আর অসহায় লাগে। ভয়ও করে। আমার দোষটা কী, অপরাধটা কোথায়, জানি না।

এখানে আমার আসার পরে থেকেই সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। শুরু হলো এক আত্মক্ষয়কারী সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ নিজের সঙ্গে নিজের, আবার নিজের সঙ্গে পরের। এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভবের সত্যিই কি কোন কারণ ছিল? আমিই এর কারণ ভেবে মনে মনে কষ্ট পেতাম। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতো। আমাকে নিয়ে পরিবারের অভ্যন্তরে যে ঝড় উঠেছে তা সহজে থামবে বলে বোধ হলো না।

যত দিন যায় ততই বুঝতে পারি, বিরোধটা আসলে ছিল দৃষ্টির বাইরে। ঘুণ পোকার মতো এই পরিবারের শিকড়কেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আমি আসার পরে তার জীর্ণদশা বেরিয়ে পড়ল। তবে কি ইতিহাসের কোন প্রয়োজন মেটাতে মহর্ষি দ্বৈপায়ন ভীষ্মের তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আমায় হস্তিনাপুরে রাণী করে এনেছেন? কুরুবংশের সঙ্গে আমার অদৃষ্ট কী তবে কোন রহস্যসূত্রে বাঁধা? উত্তর মেলে না। এলোমেলো হাজার প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হয় মস্তিষ্ক।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে একটা উদ্দেশ্য সাধন করতে আমায় রাণী করে এনেছেন, এটা আমার কাছে স্পষ্ট। পিতৃব্য ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর স্বার্থের বিরোধটা সেখানেই।

তাঁদের এই বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছি আমি। তাই পিতৃব্য ভীষ্ম আমায় নিয়ে এক দোটানায় পড়েছেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি নিজেকেই ছিন্নভিন্ন করছেন। আমাকে পাণ্ডুর বিয়ে করা অন্যায় হয়েছে, না এই বিয়ে দ্বৈপায়নের হস্তক্ষেপ হয়েছে বলে তাঁর রাগ। বোধ হয় কর্তৃত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে দুই ভাইর লড়াই। কৌশলে কে কতখানি জয় আদায় করল, কে হারাল কতখানি তার চুলচেরা হিসেব বিশ্লেষণের এক অদ্ভুত উত্তেজনায় তাঁরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রু। আমায় নিয়ে তাঁদের হার জিতের লড়াই লড়াই খেলা। এই বাস্তব সত্যটা অনুভব করার পর থেকেই একটা অশুভ চিন্তায় সর্বক্ষণ আতঙ্কিত থাকি।

ভীষ্মের ভেতর এক বিপন্ন অসহায়তা এবং অস্থিরভাব লক্ষ্য করেছি। দ্বৈপায়ন, আমার সঙ্গে ভীষ্মের সম্পর্ক ভালো করার পথে একমাত্র অন্তরায়। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। তা নিয়ে বিবাদ-বিরোধ জীইয়ে রাখা মানে আমার মতো নিরীহ, নিরপরাধিনীকে কষ্ট দেয়া। বাস্তবকে অস্বীকার করে চলতে চান বলেই তিনি নিজেও কষ্ট ভোগ করছেন আমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন। এই ধরণের মানুষগুলো একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। তাঁরা নিজেকেও ক্ষমা করেন না, পারি-পার্শ্বিককেও না। পারিপার্শ্বিক যখন প্রতিশোধ নিতে আসে তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেই ছিন্নভিন্ন-হন শুধু। কখনো কখনো ইতিহাসের প্যাতায় সেই রেষারেষি, সংঘর্ষ একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। এই উপলব্ধিই আমাকে চোখ খুলে দেখতে শেখাল।

ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই এসব হাজার এলোমেলো চিন্তা মাথার ভেতর জট পাকায়। কারণ আমি তো আর আগের মতো নেই। আমার সত্তা এখন দ্বিখণ্ডিত। বিয়ের আগের যে জীবন তা একটা খণ্ড মাত্র। পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ের পর আমার আর এক সত্তার জন্ম হলো। জীবনের শাখা-প্রশাখা ফুল কুঁড়িতে ভরে দিয়ে, নারী সত্তাকে-ধন্য করে, মুক্ত, দৃপ্ত, পরিপূর্ণ জীবনের দিকে অনন্ত উৎসারে ধেয়ে চলাই দ্বিতীয় জন্মের সার্থকতা। যা আগের জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের এই জীবনের সূচনাতেই ঘটল নানা বাধা-বিপত্তি। এ বাড়ীতে আমার অবস্থা তো বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়া বাইরের লোকের মতো। বেশ বুঝতে পারছি একটা কঠিন সংকটের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে। ঘর সংসার সাজিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে যে, পুতুল খেলা করতে ভাগ্য দেবতা এ বাড়ীতে আমাকে নিয়ে আসেনি, ফুলশয্যার রাতেই বুঝেছি। এই কথাটা বিধাতা জানান, দেবার জন্যেই প্রথম মিলন রাতে নির্দয়ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। তা হলে, এখানে আমার ভূমিকা কি? সে কথা ভাবতে গেলেই চোখে ঘুম নামে। বেশি ভাবনা-চিন্তা করা কোনো মেয়ের অভ্যাস নয় বলেই, তাড়াতাড়ি ঘুম জড়িয়ে আসে তাদের চোখে।

একদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। ঘুম খুব গভীর নয়। বেশ বুঝতে পারছি, পাণ্ডু আমার পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। এ পাশ-ও পাশ করছে। আমাকে ঘুমোতে দেখে ও আমার গা ঘেঁষে শুলো। একখানা পা তুলে দিল আমার গায়ে। চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে লাগল

আস্তে আস্তে। মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় দেখতে লাগল। আলতোভাবে একটা চুমু দিল গালে। স্তনে হাত রেখে তারপর নিজের ঠোঁট রাখল আমার ঠোঁটে। চুমু খাওয়ার জন্যে নয়, তার সব ব্যথাকে নিঃশেষে সমর্পণ করে তার অক্ষমতাই প্রকাশ করল যেন। ওর যখন উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে আমার গায়। আর আমি কিছুই করছি না। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছি। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শুলাম।

তখন স্বপ্নে বিচরণ করছি আমি। আমার শরীর হাল্কা হয়ে গেছে। আমি হাঁটতে পারছি না। শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। আমার কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, আমার বিশ্রস্ত কেশদাম পাখীর ডানার মতো হয়ে গেছে। এক ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে আমি কাল পেঁচার মতো উড়ে বেড়াচ্ছি।

হঠাৎ পুরুষের গলায় আমায় কে যেন ডাকল। ভেতরটা আমার চমকে উঠল। স্বপ্নে চোখ খুলে কাউকে দেখলাম না কোথাও। কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি, কে যেন হেঁকে বলল ঃ আমি মহাকাল। তোমার মধ্যে আছি। এ পরিবারে আমার ইচ্ছেতেই তুমি এসেছ। তোমার নিজের বলে কিছু নেই,—এমন কি স্বপ্ন কল্পনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও না। উথাল পাথাল ঘটনা স্রোতে তুমি মথিত হওয়ার জন্যেই আছ। যন্ত্রী যেমন যন্ত্রকে দিয়ে তার কাজ করে নেয়, তেমনি তোমাকে দিয়ে আমিও করব। তুমি হলে আমার কালচক্র।

স্বপ্নেই আমি নিজেকে চমকাতে দেখলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবছি এ আমার বিভ্রম। আমি যা শুনেছি, ভুল শুনেছি। কারণ, আমি তো সব সময়ে ভাবি, সংসারে—যার জীবনের যাত্রাপথ প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, কপটতা দিয়ে অভিষিক্ত হলো তার শেষ পরিণতি যে কোথায়, কেমন করে কোন চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা যেমন আমার কল্পনায় আসে না, তেমনি আমায় সৃষ্টিকর্তাও হয়তো বলতে পারে না। মনের অভ্যন্তরে এই উদ্বিগ্ন অসহায়তাই হয়তো স্বপ্নে মহাকালের বাণী হয়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক হুঁশিয়ারী পরোয়ানা জারি করে গেল যেন। কথাটা মনে হতেই ঘুমের মধ্যে এক কম্পন অনুভব করলাম। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। মনে হলো সত্যিই বড় অভাগা আমি। অদৃষ্টের শিকার। আমার কেউ নেই। অভিযোগ জানানোর আব্দার করার, আত্মসমর্পণ করার কোন প্রিয়জন আমার নেই যেন। নিজেকে বড় অসহায় এবং একা লাগল।

সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মতো একজন ঋষি এক গাল হাসি নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। সস্নেহে তাঁর পাশে বসাল। বলল ঃ তোমার কেউ নেই। একথা ভাবছ কেন? আমি তো আছি। তোমার একান্ত আশ্রয় এবং বিশ্বস্ত অবলম্বন। তুমি আমার পুত্রবধূ। তোমার সব দায়িত্ব আমার। আমি থাকতে তোমার ভয় কি? তোমার কাছে আমার অনেক দাবি। কত আশা, স্বপ্ন নিয়ে যে, তোমার দিকে তাকিয়ে আছি—তুমি জান না। তোমাকে জানতে হবে এবংশের ইতিহাস। এমনি করেই হয়তো ইতিহাস তার আপন গতিপথ পরিবর্তন করে। কখনও কখনও সেই পরিবর্তন ইতিহাসের পাতায় সংঘর্ষ,

বিরোধের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যায়। ইতিহাস ঘুমোয় না বলেই যযাতির বংশধরের মধ্যে আর এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে তোমাকে পুত্রবধূ করে এই পরিবারে এনেছি। এই পরিবারে তুমি, আমি দু'জনেই বাইরের লোক। সুতোয় বাধা অধিকার নিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছি। ইতিহাস তৈরীর এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করা কি যায়? তা-হলে ইতিহাস সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয়। ইতিহাস তো আর নিজে সৃষ্টি হয় না। এক একজন মানুষকে দিয়ে ইতিহাস তৈরী হয়। যাকে সেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়—আর সকলের চেয়ে একটু আলাদা হয়। নরমে কঠিনে, কোমলে নির্দয়ে মেশানো এক অসাধারণ মানুষ। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই, আবার কারো মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও তার হয় না। তাকে নির্বিকার, নিরাসক্ত হয়ে আরেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ইতিহাসের হাল ধরতে হয়।

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসি! চারদিক চেয়ে খানিকক্ষণ থম ধরে বসে থাকি। সমস্ত অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি। নিজের অজান্তে চোখ দুটো জলে ভরে আসে। নিজেকেই প্রশ্ন করি; এসব চিন্তার শিকড় কোথায়? স্বপ্নের শেকড় কি বাস্তবের মাটিতে থাকে? তা না থাকলে তো চুকেই গেল। সে কল্পনার কোন দাম থাকে না। সে কল্পনা হলো ফানুস। ফানুস ফেটে গেলে ফানুসের আর কোন মূল্য থাকে না; তেমনি আমার অদ্ভুত স্বপ্নও অর্থহীন। ঐ নিয়ে ভেবে মন খারাপ করা কিংবা কষ্ট পাওয়ার কোন মানে নেই।

এসব অনেককাল আগের ঘটনা। কিন্তু কী আশ্চর্য আমি সব ঘটনার মধ্যে অবাধে প্রবেশ করছি। সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে সব এমন করে মনে আসে কি করে? কাল তাকে জীর্ণ করেনি, পুরনোও করেনি। বরং কৌতূহলী উৎসুকী মনে তা একটা নতুন মানে বয়ে এনেছে। এই অনুভূতি ও উপলব্ধি কালের সৃষ্টি। তার সামনেও নেই, পেছনও নেই। মনের আলো পড়ে তার অন্ধকার ঘরের ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্য পরিবেশে মানুষ-জন স্থান সব তেমন আছে। কেবল আমিই বদলে গেছি। চুলে পাক ধরেছে, চামড়া লোল হয়েছে, মুখে বলি রেখা পড়েছে।

এতকাল ধরে জানতাম কাল শুধু পুরানো করে, নতুন করে না। কিন্তু

সেই জানাটা দাবানলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বদলে গেল। সময় বিশেষে পুরনোও নতুন হয়। ফেলে আসা অতীতের দিকে যখন পিছন ফিরে তাকানো হয় তখন সে আর পুরনো থাকে না। তার গায়ে নতুন, অনুভূতি, উপলব্ধির ছাপ পড়ে। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে সে নতুন হয়ে যায়। পুরনো বলে ভাবাটাই তখন ভ্রম বলে মনে হয়। কারণ, তখন সে আর স্মৃতি নয়, মনে করাও নয়, বাস্তব অনুভূতি। তখন তো তার বাইরেটা দেখি না, সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে, মিলিয়ে তার আত্মাকে দেখি।

পৃথা-কুন্তী-ঈ—ডাকটা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে এল যেন। কেবল, পাণ্ডুই সোহাগ করে এ নামে ডাকে আমাকে। কতকাল পরে সে ডাকটা শুনতে পেলাম। আমার ভেতরটা চমকে গেল। দৌড়ে দরজার কাছে ছুটে যাই। পর্দা ফাঁক করে দেখি বরের সাজে পাণ্ডু আসছে। পরীর মতো এক ঝাঁক মেয়ে ফুলের পাঁপড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তার গায়। আর সেই ফুল বিছানো রাস্তা দিয়ে পাণ্ডু রাজার মতো হেঁটে আসছে। পিতৃব্য ভীষ্ম পথ আগলে চলেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে। পাণ্ডু কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। মুখে তার প্রসন্নতার ছোঁয়া পর্যন্ত নেই। যন্ত্রের মতো ভীষ্মের পাশে পাশে হাঁটছিল। অন্য পাশে ছিল রক্তবসন পরিহিত রাজ পুরোহিত। গা ছুঁয়ে কানে কানে কত কী ফিসফিস করে বলছে। তা-হলে, পৃথা কুন্তী বলে আমাকে ডাকল কে? তবে কি, মনের ভ্রম আমার। পাণ্ডুর ডাক নয়, তবু বুকের গভীর অভ্যন্তরে এই ডাকটা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম। সেই আকুল প্রত্যাশাই হয়তো হাঁক দিয়ে আমাকে বাইরে বার করে আনল।

আমার ঘরের সামনে দিয়ে গেল পাণ্ডু। কিন্তু একবারও ঘরে ঢুকল না! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলও না। অভিমানে দুঃখে আমি ও ঘরের বার হলাম না। চৌকাঠের কাছে মোটা কাপড়ের পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণের জন্যে বোধ হয় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়েগেছিল। শ্রবণ যন্ত্র বিকল হয়েছিল—উলুধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি, বাদ্যধ্বনি কিছুই আমার কানে গেল না। পুত্তলিকাবৎ ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি। বুকের ভেতরটা উথাল-পাথাল করছে। নিজের মনে বলছি এ কী অন্যায়! এ কী অন্যায়! অবশেষে ঘেন্না হলো পাণ্ডুর উপর। আর রাগ! পারলে ওকে আমি খুন করতাম। কিন্তু আমার বিবেক বলল : ওর দোষ কি?

সত্যি ওর কোন দোষ নেই। বিয়ের খবর পাণ্ডুই দিয়েছিল আমাকে। উদ্বিগ্ন গলায় বলল : পৃথা কুন্তী আমার বড় বিপদ। পিতৃব্য সত্যি কী চায় আমার কাছে বুঝতে পারি না। তাঁর জুলুমটা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। সিংহাসনে আমার আর রুচি নেই। রাজ্যের প্রতি কোন মোহ নেই। আমি শুধু মুক্তি চাই।

ওর কথা শুনে বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী? পাণ্ডুর কাছে পিতৃব্যের এমন কী প্রত্যাশা থাকতে পারে যে তার জন্যে বেচারা দুশ্চিন্তায় এবং ভয়ে আছে। একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। জিগ্যেস করি—তোমার খারাপ হয় এমন কিছু পিতৃব্য করবেন না। তুমি মিছে

ভয় পাচ্ছ।

পাণ্ডু একটু হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল ঃ পিতৃব্য, আমার দ্বিতীয় বিয়ের সব বন্দোবস্ত করেছেন। আমার কোন ওজর আপত্তি শুনবেন না।

উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করি—তার মানে?

নির্লিপ্তভাবে পাণ্ডু বলল ঃ কারণ আছে তাই। ও তুমি বুঝবে না।

রেগে গিয়ে বলি ঃ সব সময় তোমার রসিকতা ভালো লাগে না। আমার মরণ বাঁচনের সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে তুমি কি খুব সুখ পাও?

অসহিষ্ণু হয়ে পাণ্ডু বলল ঃ সত্যিই সুখ পাই না। কিন্তু আমার সুখ দুঃখের মূল্য কি? কিসে আমার সুখ সে কথা বোঝার মতো পিতৃব্যের মন কোথায়? হার-জিতের কাজিয়ায় কে কতখানি জয় আদায় করল—আমায় নিয়ে তার হিসাব করছে। আমি কে? আমায় কথা শুনছে কে? মদ্র রাজকন্যা মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করতেই হবে আমায়।

কী কারণে?

কারণ তো বললাম।

তুমি কিন্তু চেপে যাচ্ছ। প্রকৃতই কী হচ্ছে আমার জানা দরকার।

জেনে কী লাভ? পিতৃব্য একবার যখন মনস্থ করেছেন, তার অন্যথা করা সাধ্য কারো নেই। এই পরিবারে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে তুমি এসেছ। অনধিকার প্রবেশের শাস্তি এখন তোমাকে পেতে হবে। সেই সঙ্গে আমাকেও। তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা রাজপরিবার স্বীকার করেনি। লোকলজ্জার ভয়ে, নিন্দুকের মুখ বন্ধ করতে শুধু মানিয়ে নেয়া হয়েছে। রাজপুত্রদের অনেক অপকর্মের মতো এটি কুকীর্তির উদাহরণ বলে মনে করেন পিতৃব্য। মাদ্রীর সঙ্গে আমার বিয়েটা পরিবারের প্রচলিত নিয়ম মেনে ধুমধাম করে জাঁকজমক করে হবে। কৌরববংশের মর্যাদার জন্যে এবং রাজনৈতিক সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে এই বিয়ে একান্ত জরুরী।

কথাটা শুনে আমার বুকটা ঝাঁৎ করে উঠল। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল মনে। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এবং ভীষ্মের রেষারেষি, ঈর্ষা, ঝগড়া, আমার জীবনকে বিষময় করে তুলছে। রাজা বলেই পাণ্ডুকে তাঁরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্য অর্জনের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তার ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে ভীষ্ম দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহে বাধ্য করেছে। একবারও তার মনের দিকে ফিরে তাকানোর গরজ পর্যন্ত বোধ করলেন না। তিনি নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর। দ্বৈপায়নের উপর রাগের প্রতিশোধ নিতে আমাকেই শাস্তি দিচ্ছেন। পাণ্ডুকে কেড়ে নিয়ে আমাকে একেবারে একা করে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য। জীবনেব সব প্রাপ্তিকে এক ভয়ঙ্কর অপ্রাপ্তিতে ভরিয়ে দেয়ার ভেতর বোধ হয় তাঁর এক ধরণের গভীরতর সুখ নিহিত আছে। সেই জন্যেই ভালো মানুষদের কপালে ভালোবাসা জোটে না। ভীষ্ম ভালোবাসার কী বুঝবে? যে মানুষ নিজেকে ভালোবাসেনি, প্রেমকে শ্রদ্ধা করেনি, তার জীবনই বৃথা। ভালোবেসে নরনারী পরস্পরের কাছে যে কত দামী, কত মহার্ঘ্য হয়ে উঠে তা পিতৃব্য ভীষ্মের মতো

ব্যর্থ মানুষ জানবে কেমন করে ? তা অনুভব করার ক্ষমতাই তাঁর নেই।

প্রত্যুত্তরে বলি : পিতৃব্য ভীষ্ম আমাকে মেরে দ্বৈপায়নকেই শিক্ষা দিলেন যে, এই পরিবারে তিনি কেউ না। তাঁর কথাই শেষ কথা। দ্বৈপায়ন টেক্কা দিয়েছে বলেই ভীষ্ম সমঝে দিলেন তাঁকে। দ্বৈপায়নের উপর তাঁর রাগের সব ঝাপ্টা আমাকে একা বুক পেতে গ্রহণ করতে হলো। এই অনাদর অপমানের কাঁটা হয়ে বিদ্ধ করেছে আমাকে। আমি অবাঞ্ছিত। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেললাম। ধরা গলায় বললাম : তুমি কি গো ? রাজা হয়েও হাতের পুতুল হয়ে থাকবে ? তোমার কথাই তো শেষ কথা। তা-হলে, তুমি কেন ভীষ্মকে অমান্য করতে ভয় পাচ্ছ ?

পাণ্ডু কিছু বলতে দ্বিধা করল। কী যেন বলি বলি করেও সামলে নিল। কয়েকবার ঢোক গিলে বলল : পৃথা-কুন্তী তোমার কষ্ট আমি বুঝি। মানুষ যেহেতু তার মনের কারণেই মানুষ তাই তার কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে। খুব কম মানুষই তার ভাষা বোঝে। তুমিও নিজের দুঃখটাকে বড় করে দেখলে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা যে আমাকেও ছিন্ন ভিন্ন করছে ভিতরে তার রক্ত ক্ষরণ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না বলে, আমার উপর তোমার রাগ।

দিশেহারা রাগের চোটে পাণ্ডুর জামা দু'হাতে খামচে ধরে নাড়া দিতে লাগলাম প্রবল জোরে। আর সে অসহায়ের মতো আমার হাতে নিপেষিত হতে লাগল। প্রবল ঝাকুনি খেয়ে তার মাথাটা লটপট করতে লাগল ঘাড়ের উপর। চোখ দুটো তার কষ্টে বোজা। তবু আমার বুকে একফোঁট দরদ কিংবা করুণা নেই। মেয়ে শকুনের মতো ফ্যাসফেঁসে গলায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলি : আমি কি গাঙের জলে ভেসে এসেছি ? আমি ফেলনা ! তোমাদের ঘরে তো নিজের পায়ে হেঁটে আসেনি ? তা-হলে আমাকে নিয়ে এত হেনস্তা কেন ? আমাকে অপদস্থই বা করা হচ্ছে কেন ? আমি তোমাদের কী করেছি ? আমার দোষই বা কী ? ভীষ্ম দ্বৈপায়নের ঝগড়ার খড়্গ আমার উপর পড়বে কেন ? তোমায় বিচার বুদ্ধি বলে কি কিছু নেই ? তুমি রক্তমাংসের পাথরের মূর্তি ? তোমায় হৃদয় মন বলে কিছু নেই আমার জীবন তো নষ্ট করেছ। আর একটা মেয়ের জীবনকে নষ্ট করতে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ব্যর্থ করতে, তোমার বিবেক তোমাকে বাধা দিল না ? ছিঃ! তোমাকে আমার ঘেন্না করছে।

পাণ্ডু চুপ করে থাকাতে আমার রাগ আরো চড়ল। ঝাঁকুনির চোটে তার রুগ্ন শরীরটা কেমন যেন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ও হাঁফাচ্ছিল। কথা বলতে পারছিল না! অতি কষ্টে উচ্চারণ করল : আমি তো তোমার উপর কোন অবিচার করেনি। এ বিয়েটা সত্যি আমি চাইনি। মাদ্রীর কাছে নতুন করে ছোট হয়ে যেতে সত্যি আমার অপমান লাগছে। ভয়ে নয়, উত্তেজনায় নয়, একধরণের চাপা অপ্রকাশ্য অক্ষমতার অনুশোচনায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। আমার দু'চোখে ঘেন্নার আগুন। পাণ্ডু জানে, তার মতো নির্বীর্য অক্ষম অযোগ্য পুরুষ মানুষকে দয়া করুণা করা যায়, অনুগ্রহ দেখানো যায়, কিন্তু ভালোবাসা যায় না। জোর করে জীবনের লজ্জা পাওয়া যায়, গ্লানি পাওয়া যায়, কিন্তু জোর করে কি কোন আনন্দ

পাওয়া যায়? ভালোবাসা জনের শরীর পাওয়ার জন্যে কাঙালপনা থাকে সমর্পণের নীরব স্বীকৃতিতে তা আনন্দময় হয়ে উঠে। যাকে ভালোবাসি তাব যদি শরীরই সাড়া না দেয় তো কিসের ভালোবাসা? কিসের সম্পর্ক? সব নারী পুরুষের তারুণ্যের সম্পর্ক শরীরে উপর গড়ে উঠে। শরীর ছাড়া মনের কানাকড়িও দাম নেই তখন। পাণ্ডুর মতো পুরুষত্বহীন পুরুষ যার স্বামী হয় তার মতো হতভাগিনী নারী হয় না। সাতপাকের বাঁধনটা ছেঁড়া যায় না বলে নিজের সঙ্গে ঝগড়া করে, ছেলে ভুলোনো ভালবাসার কথা বলে, হতাশ ও গ্লানি বুকে জমিয়ে রেখে মৃত্যু অবধি এভাবে জীবনের প্রবৃত্তিগত ভালোবাসার আবেগকে গলা টিপে মেরে ফেলার নাম মেয়েদের আনুগত্য, তার সতীত্ব। ছিঃ বলে নিরুচ্চারে নিজেকেই ধিক্কার দিই। যতদিন বেঁচে থাকব ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস, সন্তানহীনতার হাহাকার, বুক ভরা অভিমানের বোঝা নিয়ে, বোবা কান্না নিয়ে পথ হাঁটতে হবে একা। এ জীবনে স্বামীর কাছে নারীর প্রত্যাশার কিছু নেই, দাবি করারও কিছু নেই। এভাবে জীবন কাটানো বড় কষ্টকর, একঘেয়ে। কিন্তু পাণ্ডুর বিয়ে হওয়াতে এখন আমি একা হয়ে গেলাম! বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। সব রাগ অভিযোগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অসহায়ের মতো ওর বুকের উপর মুখ রেখে দুহাতে আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলি—সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে একা পেতে দিলে না আমাকে। ছাই ভালোবাস আমাকে? তুমি আমার হলে না। তোমার আগুণে পুড়ে ছাই হতে দিলে না। শুধু বুকের ভেতর আগুন জ্বালিয়ে রাখলে। বড় নিষ্ঠুর তুমি। আমি তো তোমার মতো মানুষ নই। একজন অতি সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু কী নিয়ে আমি থাকব? অথচ, তুমি চাইলেই এ বিয়ে হতো না। তুমি চাও না বলেই আমার কথা একবারও না ভেবে, মদ্ররাজ্যে যাচ্ছ

পাণ্ডু বলল: সাধ মিটিয়ে তোমরে অভিযোগ, অনুযোগ কর। তোমার যা খুশি আমাকে বল। আমি নিরুপায়। আমার ভবিতব্য। একজন রাজাকে অনেক বিয়ে করতে হয়। রাজা বলেই তার প্রাণে অনেক ভালোবাসা থাকে। কোন রাজার কাছে আগামীকালের ভরসা প্রত্যাশা রেখ না। রাজারা প্রয়োজনের জীব।

কথাগুলো বলে পাণ্ডু চলে গেল আর দাঁড়াল না। এই কঠিন কথাটা বলার জন্যেই হয়তো এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওর চলে যাওয়ার পরে আমার বুক জুড়ে দেখা দিল হারানোর ভয়! ও কি আমার কাছ থেকে সত্যি দূরে সরে যাবে? ওর উপর আমার কোন দাবি থাকবে না? আমি একা হয়ে যাব? অনাথ হয়ে যাব? বুকটা হায় হায় করে উঠল। নিজের মনে প্রশ্ন করি ওকে ছাড়া আমি বাঁচব কী করে?

সারা রাত সেদিন জেগে কাটিয়েছি। চিত্রার্পিতের মতো পাণ্ডুর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকেছি। সার রাত ধরে শুধুই মনে হয়েছে। এই মানুষটিকে কাল থেকে আমার পাশে দেখতে পাব না আর। অন্য এক রমণীর সাথে নিশি যাপন করবে। ও আমার আর কেউ নয়! ওর সঙ্গে বিয়ে বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। বলা যেতে পারে একটা পুরুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ

সহবাস। সত্যি ঐ মানুষটির কী আছে? ও কোনদিন আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও সমর্থ হবে না। তবু ওকে ছাড়া এই মুহূর্তে আমি আর কিছু ভাবতে পারি না কেন? এই মানুষটি আমার জীবন ব্যর্থ করে দিল বলে ওকে অস্বীকার করতেও পারছি না। পুরুষত্ব হীন, দুর্বল, ভীরু লোকটির নিঃশর্ত আনুগত্যের যাদুবলে আমাকে দখল করে আছে। এ থেকে আর মুক্তি নেই! কত যে পাপ করেছি গত জন্মে। চকিত বিদ্ধ একটা শূন্যতার হাহাকার বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণায় ক্রিয়াশীল তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল।

রাত বাড়ছে। চারদিক নিঝুম। অবসাদে ক্লান্ত লাগছে। ঘুমে দু চোখ বুজে আসছে। পাতলা তন্দ্রার মধ্যে মনে হলো পাণ্ডু আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আদর করছে। চুলের ভেতর বিলি কেটে দিতে দিতে থমথমে গম্ভীর গলায় বলছে ঃ পৃথা কুন্তী তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করছ কেন? তোমার আমার জীবন আলাদা আলাদা। তোমার জন্যে জীবনে করার মতো কিছুই করতে পারলাম না। একটা সন্তানও তোমার কোলে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সমস্ত দীনতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই। আমি স্বার্থপর নই! তোমাকে মিথ্যে বিয়ের তেতো বাঁধন থেকে চিরতরে মুক্তি দিলাম। জীবনটা বাঁচবার জন্যে, নষ্ট করবার জন্যে নয়। কে কি বলল, মনে করল সেই ভয়ে তোমার জীবনের সাধ-আহ্লাদ ব্যর্থ করে দিও না। নিজেকে ঠকিও না। তোমার যা ভালো লাগে। তাই করে তুমি সুখী হও। কী ভাবে কেমন করে সে সুখ তুমি পাচ্ছ, তা আমার জানার পর্যন্ত দরকার নেই। পাপ পুন্য মনের ব্যাপার। মনে যদি পাপ বোধ না জাগে শরীরে তার কোন দাগই লাগে না। লাগালেও ধুলো-বালির মতো ঝেড়ে ফেলা যায়। আমি বুঝেছি, শরীরকে খুশী না রাখলে মনটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনের মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য নয়। কাম হলো প্রাণের পূর্ণ এবং সুস্থ প্রকাশ। প্রকাশ উদ্বেল জীবনী শক্তির।

পাণ্ডুর কথা শুনে আমি তো অবাক! এই মানুষটা বলছে কি? আমার জীবন নষ্ট করে কার সাধ্য? আমার সমৃদ্ধ জীবন এত অল্পে তা বিপন্ন হওয়ার নয়। আমার মাথার মধ্যে শিরাগুলো দপদপ করছে। আর আমি উত্তেজিত হয়ে পাণ্ডুর বুকে মাথা কুটছি। হাউ হাউ করে কাঁদছি, আর বলছি—না, না। আমি পারব না, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

গায়ের উপর একটা কৃশ হাতের ঠাণ্ডা স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে গেল জেগে উঠে চোখ মেলে দেখি পাণ্ডুর হাত আমার গায়ে।

আমার সকল দুর্ভাগ্যের সঙ্গী সুদর্শনার ডাকে চমকে তাকালাম। এক মুহূর্তে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরলাম। এভাবে আর কতক্ষণ শূণ্য চোখে তাকিয়ে থাকবে? যে যাবার সে তো গেছে চলে। এখন তুমি কী করবে? তোমার কপালটাই মন্দ। দাক্ষিণ্য যদি বা জোটে, কপালে সয় না। দুর্ভাগ্য তোমার পিছন পিছন দৌড়ায়, সৌভাগ্য তাই আর নাগাল পায় না।

ওর কথা শুনে আমার দু'চোখ ভরে জল নামল। আমি কথা বলতে পারলাম না। ভাগ্যের কাছে আমি ক্রমাগত হেরে যাচ্ছি। এক একজন মানুষ

থাকে সংসারে যারা শুধুই হারবার জন্যে বেঁচে থাকে। হেরে যাওয়াটা কী বেদনাদায়ক তা কেবল হেরে যাওয়া মানুষই জানে। আশ্চর্য! কোন মানুষই হারতে চায় না। তবু একজনকে হার মেনে নিতে হয়। হার আছে বলেই জেতার কথাটা ভাবি। জেতাটা বড় আনন্দের।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মনে মনে বলি, কোন হারাই হার নয়। হেরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় জেতা। জন্মালেই যেমন মানুষকে মরতে হয়, মরার জন্যেই মরবার আগে মানুষকে অনেকবার মরতে হয় তেমনি জেতার জন্যে অনেকবার হারতে হয়—এ কথাও সত্য। হেরে জেতার শিক্ষানবিশি করতে হয় মানুষকে অনেককাল ধরে। তবে কি ভাগ্য জেতানোর জন্যে আমাকে শিক্ষানবিশি করছে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। জেতার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না করছি। তবু ভয়, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে। ভিতরটা কিছু করার দুঃসাহসী উন্মাদনার আবেশে থর থর করে কাঁপছে। আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না। দুপুর কাটিয়ে অপরাহ্নে পিতৃব্য ভীষ্মের ঘরে পা রাখলাম।

আমার অবাক হওয়ার পালা। ভীষ্ম নিজে এক দোটনায় কষ্ট পাচ্ছেন। নিজের বিচার বুদ্ধির সঙ্গে অবিরাম বিবেকী সংঘাতে নিজেকই ছিন্নভিন্ন করছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল লড়াইটা তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের। এক অসহিষ্ণু উত্তেজনায় ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন যেন। তাঁকে দেখে রাগ করার বদলে দয়া হলো। মানুষটা কত অসহায়, কত দীন একা যে চোখে না দেখলে জানাই হতো না। কিন্তু কেন তাঁর এই কষ্ট?

আমার পায়ের শব্দে চমকে তাকালেন। এরকমভাবে তাঁর কক্ষে যে আমি প্রবেশ করতে পারি, তিনিও বোধ হয় চিন্তা করেননি। শুনেছি, কৌরব বধূ গান্ধারীও কখনও তাঁর ঘরে সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে আসেনি। আমিই সর্বপ্রথম তাঁর কক্ষে তাঁরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মতো কাঁপছি। হঠাৎ ই গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করি। কিন্তু তিনি প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন। মুগ্ধ কণ্ঠে বললেম: আমাকে তুমি অবাক করে দিয়েছ। সেই আমায় কাছে এলে, কিন্তু বড় দেরী করে ফেললে। সময়ে না এলে, আসাটাই বৃথা হয়ে যায়। এই আসার কোন মানে হয় না। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

আপনাকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। স্বপ্ন দেখতাম, আমার অপমান ভাঙতে আপনি দৌড়ে আসছেন আমার ঘরে। স্বপ্ন কখনও সত্য হয়? সে জন্যই দেরী হয়ে গেল। তার জন্যে আমার ক্ষোভ কিংবা অভিযোগ নেই। বরং আশ্চর্য হয়েছি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আপনাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে। মিছিমিছি কার জন্যে এই কষ্ট পাচ্ছেন? কিসের কষ্ট? আপনার মনোবেদনার উপশম হয় এমন কিছু করতে পারলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। কোন অপরাধে আপনার কাছ থেকে দূরে রেখেছেন আমায়? আমি আপনার কী করেছি?

বিস্ময় নিবিড় চোখ মেলে ভীষ্ম চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। আমার আকুল

করা সমবেদনায় তাঁর ভেতরে কি যেন গলে গলে পড়ছিল। মুখের অভিব্যক্তিতে অপরাধ রাখার জায়গা নেই যেন। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে বলল জীবনভোর এমন মরমী মন নিয়ে কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। কেউ জানতে চায়নি আমি কেমন থাকি? আমার মনে কত ব্যথা, যন্ত্রণা সে খোঁজও নেয়নি কেউ। তোমার কথাতেই আমার পাওয়ার ঘর ভরে গেল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর তীব্র ভালোবাসা। আচমকা আমার বন্ধ দরজার উপর করাঘাত করে জাগিয়ে তুললে কেন? কী দরকার ছিল এই দরদ দেখানোর? আমি তো কারো অনুগ্রহ, দয়া, করুণা চাই না। আমার কাছে তোমাকে পাঠাল কে?

এরকম একটা পাল্টা প্রশ্নে আমি থতমত খেয়ে যাই। একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। পাছে আমার বিব্রত ভাবটা ধরা পড়ে যায় তা লাজুক অপ্রতিভ হেসে বলি: কেন আসতে নেই? আপনি তো আমাকে কখনো ডেকে নিলেন না। তাই নিজের অধিকারে এসেছি আপনার স্নেহের ভাগ নিতে। দূরে সরে থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন?

আমার কথা শুনে ভীষ্মকে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে দেখলাম। মনে হলো তিনি কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমার কথাটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। একেবারেই মামুলী। তবু ভীষ্ম তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে দুর্বল গলায় বললেন: নিজেকে বঞ্চিত ভাবার মতো কিছু হয়েছে কী?

আমার দুচোখে বিস্ময়, অধরে মৃদু হাসি। উত্তর দিতে বিপন্ন বোধ করছি। অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চাইছি। চোখের দৃষ্টিতে একটু লজ্জা লজ্জা ভাবও। সাবধানে, তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলি: চারদিকে ছোট মনের ছোট স্বার্থের মানুষ জনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে মনটা অন্যরকম হয়ে যেতে চায়। নিজের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে বসি। আর তখন আপনার উপর খুব অভিমান হয়। দুঃখও হয়। কিন্তু সে সবের আর দাম কী?

ভীষ্ম প্রত্যুত্তরে বলল: সত্যিই তো যে দাম দেয় রাগ, দুঃখ অভিমান তার উপরেই করা যায়।

ধরা-ছোঁয়ার বাইরের মানুষটির কথা শুনে আমার হাসি পেল। ম্লান, বিষন্ন হাসি হলেও বুকের গভীর থেকে উঠে এল। মাথা নেড়ে বললাম: জানি। কিন্তু বাঁচবার জন্যে তো একটা স্থির প্রত্যয় ভূমি তো চাই। জীবনের সুখ দুঃখগুলিকে অহরহ সহ্য করা যায় না। সহানুভূতি, সমবেদনার মরমী স্পর্শ তখন নতুন প্রাণ দেয়। বীতশ্রদ্ধ জীবনকে নবীকৃত করে তোলে।

আমার কথায় ভীষ্ম খুব আপ্লুত হলো কিনা বোঝা গেল না। শুকনো ঠোঁটে কাষ্ঠ হাসল। কষ্ট করেই হাসল। বললেন: জীবন রহস্যকে গভীর করে বোঝার কিংবা জানার অবকাশ ঈশ্বর দিল কৈ? হস্তিনাপুরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে বহু স্বার্থের রাজনৈতিক তমসায় আচ্ছন্ন। কী করলে হস্তিনাপুরে কৌরববংশের স্বার্থ নিরাপদ করা যায় তার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দিনরাত কেটে যায়। হৃদয়চর্চা করার সময় পাই না।

সিংহাসনের তাবেদারী করতে করতে এমন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে যে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় রাজত্ব আমি চালাই না, আমাকে রাজত্ব চালায় ?

উত্তর দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকি। যে কথা বলতে এসেছি ভূমিকা না করে সেকথা বললে বড় স্বার্থপর মনে হয় নিজেকে। তাই একটু জোর খাটানোর নাটক করতে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। এখন তাঁকে সত্য কথাটা জিগ্যেস করব কি ? না, যা ঘটেছে বা হয়েছে নীরবে মেনে নেব তাকে। কিছুই স্থির করতে পারছি না। একটু ইতস্তত করে চলে যাব বলে পা বাড়াই। ভীষ্ম পিছন থেকে ডাকলেন। বললেন : তুমি তো কিছু বলতে এসেছিলে। শুধু ভূমিকা করে চলে যাবে ? সাবধানে একটা দূরত্ব রক্ষা করে আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন সত্যি আমি বুঝি না। বুঝতে চেষ্টা করছি ; যে অধিকার নিয়ে তুমি দাবী জানাতে এসেছ তা কতখানি আন্তরিক। নাটকের অভিনয় আর জীবনের স্বাভাবিকতা এক নয়। জানি, আমার বিরুদ্ধে তোমার অনেক নালিশ আছে। কিন্তু খোলাখুলি আমাকে জানাতে পারলে না। জানালে হয়ত দেখতে নালিশ করার কিছু নেই। সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি তোমাকে আগলাতে চেয়েছি।

হঠাৎ-ই ক্ষোভের বশে বলে ফেলি, আমাকে নয়, আপনাদের ছেলেকে আগলেছেন তা জানি। কিন্তু সে আমার জন্যে নয়, আপনার জন্যেই।

ভীষ্ম হেসে বললেন : এটা তোমার কথা নয়, শেখানো বুলি। তারা তোমাকে অমন বুঝিয়েছে।

দৃঢ়স্বরে আমি প্রতিবাদ করলাম। এসব শেখাতে হয় না। একটু চোখ, কান খোলা রাখলেই টের পাওয়া যায়। কারুর কথায় ওঠ-বোস করার মেয়ে নই আমি।

আমার স্পষ্ট ভাষণে ভীষ্ম কিছুমাত্র রুষ্ট হলেন না। বরং মৃদু হেসে বললেন : তা কি জানি নে। তোমার শক্তিও যেমন আছে, দুর্বলতারও তেমনি শেষ নেই। তুমি বুদ্ধিমতী, ধৈর্যশীলা, কোন সময় কোন কাজ করলে সুফল লাভ বেশি হয় সে বোধও তোমার তীক্ষ্ম। যত দেখছি, অবাক হচ্ছি। হস্তিনাপুরে আজ পাণ্ডুর রাজমর্যাদা, গৌরব এবং সম্মান বেড়ে গেছে, সে তো তোমার জন্যে। তোমার কৃতিত্বে আমি গর্ব অনুভব করি।

ভীষ্মের কথা শুনে কান জ্বালা করে উঠল ! ঠিক বুঝতে পারলাম না, তিনি ব্যঙ্গ করছেন, না মনের কথা অকপটে বলছেন। তবু, অবিশ্বাসে, সংশয়ে প্রতিবাদে ভেতরটা সোচ্চার হলো। শান্তভাবে বললাম : কী জানি ? বিশ্বাস করতে মন চায় না।

ভীষ্ম মৃদু হেসে বলল : বিশ্বাস করা সহজ নয়। কিন্তু তোমার জানা উচিত ছিল ভীষ্ম মিথ্যে বলে না। কাউকে তোয়াজ করে কথা বলতে জানে না। তাছাড়া, তুমি আমাদের ঘরের বৌ, তোমার স্তুতি করে আমার কোন লাভ নেই। কিন্তু যা বলেছি, তা সত্যি।

আমার কথা হারিয়ে যায়।

বাঁকা হাসিতে ভীষ্মের ওষ্ঠাধর ধনুকের মতো বঙ্কিম হলো। বললেন: চুপ করে থাকলে কেন?

কী বা বলব? আমার নিজের জন্য বড় ভাবনা হয়।

ভাবনা? তোমার জন্যে? কেন? কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কী করে বোঝাই আপনাকে? মেয়ে মানুষের মুখে অনেক কথাই মানায় না। তাই তো তার বুক ফাটে মুখ ফোটে না।

বেশ তো, নির্দ্বিধায় তোমার নালিশ জানাতে পার।

নালিশের যেখানে প্রতিকার হয় না, সেখানে অর্থহীন নালিশ করে নিজেকে অসম্মান করার কোন মানে হয় না। মদ্র রাজকন্যার সঙ্গে হস্তিনাপুর নরেশের পুনর্বিবাহের ভূমিকা তো আপনি ভালো করে জানেন। সুতরাং নতুন করে বলার কিছু নেই। বড় একা হয়ে গেলাম। মাথায় উপর হঠাৎ ঘরের ছাদ উড়ে গেলে মানুষের যেমন অসহায় লাগে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, আশ্রয়হীন মনে করে তেমনি একটা বোধে আমার ভেতরটা টাটাচ্ছে। আমাকে রাণীর আসন থেকে জোর করে ধুলোমাটির মধ্যে যেন টেনে নামালো হলো। এই অপমানটা ভুলতে পাচ্ছি না। এ এক আজব শাস্তি।

আমার কথাগুলো ভীষ্ম খুব কৌতুক ভরে শুনলেন। সহসা একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া পড়ল তাঁর গৌরবর্ণ মুখে। সহসা কথা খুঁজে পেলেন না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। দুই চোখের কোটরে তাঁর ব্যথা জমে উঠল। প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন। ধনুকের মতো ওষ্ঠাধরে পাথর কঠিন দৃঢ়তা। ধীরে ধীরে বললেন: তোমার কথা আমিও যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। তোমার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়। হস্তিনাপুরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দ্বন্দ্বে, অন্তর্কলহের মধ্যে যারা তোমাকে টেনে আনল জবাব দেবার দায়িত্ব তাদের। হস্তিনাপুরকে রক্ষা করার সে দায়িত্ব আমরণ পালন করতে হবে। যারা হস্তিনাপুরের সুনাম নষ্ট করতে চায়, করতে চায় তাদের দুষ্ট অভিসন্ধির মূলোচ্ছেদ করতে আমাকে যদি নির্দয় হতে হয়, সে কি আমার দোষ!

তিক্ত ভারি মন নিয়ে পিতৃব্যের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এক বুক অপমান নিজের ঘরে ঢুকতে যেন নিজেরই কেমন অপ্রস্তুত লাগছে। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করলে যেমন ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, পাণ্ডুর দ্বিতীয়

বিয়েতে তেমনি এক অন্ধকার নামল আমার চোখে। বড় একা আর শূন্য লাগল। ভাগ্যের কাছে হেরে যাওয়ার দুঃখটা বুকে দামামার মতো বাজতে লাগল। সেই সময় বিদুর এল অপ্রত্যাশিতভাবে। ওকে দেখে আমার ভীষণ কান্না পেল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে মাথার বালিশের মধ্যে মুখ, গুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। দুঃখে অভিমানে নয়, একান্ত নিরাশ্রয়ের পরম আশ্রয় লাভের মতোই অসহায় কান্না। হেরে যাওয়ার কান্না। এ কান্না যেন একজন সমব্যথীর বুকে সাগর হয়ে মিশে যেতে চায়।

আমার ঘর নিঝুম। থমথম করছে। চারদিকে এক অদ্ভূত শূন্যতা। বিদুর কী করবে ভেবে স্থির করতে পাচ্ছিল না। বিছানায় যে দিকে মাথা ছিল সে দিকেই বসল। আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল বিদুর।

এ ভাবে আমার বিছানার পাশে বসে নি কোনদিন। কেমন একটা লজ্জায় ভীষণ কুঁকড়ে গেল ভেতরটা। মুখ লাল হয়ে গেল। তাই-ই নয় এই বাড়াবাড়ি ঔৎসুক্যে লজ্জাও করছিল ভীষণ। লজ্জাটা গোপন করতে তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ গুঁজলাম। কিন্তু বিদুর নড়ল না। ওকে চলে যেতে বললে আহত হবে। তাই কিছু বললাম না।

আমার বুকে তখন ঝড়ের দোলা। কত কথাই মনে হচ্ছিল। পান্ডুর সঙ্গে বিয়ে না হলে ভালোই হতো। মানুষটা বড় রুগ্ন। একটুতেই ভোগে। কটা দিনই বা ভালো থাকে? ভালো করে তুলতে বিদুর প্রাণ ঢেলে সেবা করত! তার সেবা, যত্ন, শুশ্রূষায় পান্ডু সুস্থ হয়ে উঠতো দ্রুত। বিয়ের পরেও বিদুর এই দায়িত্বটা ত্যাগ করেনি। নিন্দুকের নানা কথা সত্ত্বেও বিদুর পান্ডুর দেখাশোনা করতে আনন্দভবনে যাতায়াত একদিনও বন্ধ করেনি। পান্ডুর দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের ইচ্ছেতেই সে নিয়েছিল। কারো কথাতে নয়। সুতরাং লোকে কী বলল তার ভয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে যাবে কেন? এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারাতে বা অন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সে প্রস্তুত ছিল না। এই স্বাতন্ত্র্যের জোরেই বোধ হয় বিদুর কৌরব পরিবারে সর্বময় ছিল। সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব খাটত। সবাই তাকে ভালোবাসত। সব কাজেই সে ছিল দক্ষ। তার নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, কর্তব্যজ্ঞান, সহানুভূতিবোধ আমাকে বিদুরের দিকে প্রবলবেগে টানতে লাগল।

বলতে বাধা নেই, একা থাকলেই নিজের কথা বেশি করে মনে হয়। ছোট্ট জীবনটার তখন একটা মূল্যায়ণ করতে বসি। অবৈধ পুত্র জন্ম দেয়ার জন্যে আমার মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধ ছিল। এই বোধটাই আমাকে ভীষণভাবে অন্তর্মুখী করেছিল। সংকোচে, ভীরুতায় আমি নিজেকে সর্বক্ষণ গুটিয়ে রাখতাম। আমার মনের কাছেই বন্দী ছিলাম। আর বিদুর ছিল মুক্ত। প্রাণবন্ত, আলাপচারী। তার তারুণ্যভরা আনন্দোজ্জ্বল উষ্ণ হৃদয়ের সাহচর্য আমাকে বার করে আনল ভেতর থেকে। আমার অসঙ্গতিকে সে আবিস্কার করল। নৈরাশ্য, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা এবং যন্ত্রণাকে সে ভাগ করে নিল আমার সঙ্গে। আমার দুঃখ, বেদনা, বিচ্ছিন্নতার কষ্ট তাকে করে তুলেছিল প্রচন্ড সংবেদনশীল। আমার দিকে এই পরিবারের কোন লক্ষ্য নেই বলেই যে একজন মানুষের, বিশেষ করে

একজন পুরুষের একটু মনোযোগ এবং সাহচর্য দরকার বিদুর সেটা ভালোই বুঝত। আমি যে আশ্রয়হীন, আমার যে একটা অবলম্বন চাই। বিদুরের মতো এমন নিবিড় করে কেউ বুঝতে চায়নি। তার এই সমবেদনা আমার মধ্যে বন্ধনের কাজ করত। সে বন্ধন বন্ধুত্বের, একজন সত্যকারে আত্মীয়ের। বিদুরের সমবেদনা ও ভদ্রতা আমার মনকে ছুঁয়েছিল। যতদিন যায় ততই মনে হতে লাগল এই শক্ত-সমর্থ, বিশ্বস্ত, মিষ্টভাষী যুবকটি আমার জীবনের পরম আশ্রয়। আমার জীবন তরীর নোঙর।

পাণ্ডুর কাছে আমি কিছুই পাইনি। অথচ, সব মানুষ চায় এমন একজন মানুষের সাহচর্য, প্রেম, দরদ সহানুভূতি যে তাকে আনন্দ দেবে, আশ্রয় দেবে, পালন করবে, ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে একটা ছোট্ট গৃহ, সংসার আর সন্তানের স্বপ্ন সফল করবে। কিন্তু পাণ্ডুর সে আবেগ কোথায়? সে ক্ষমতাও তার নেই। তাই বোধ হয় তার মনের কাছ থেকেও আমি দূরে সরে গেছি। সেই শূন্য জায়গাটা বিদুরের সান্নিধ্য, স্বপ্ন এবং স্মৃতিতে একটু একটু করে ভরে যাচ্ছে।

বিদুরই আমার দুঃখের বন্ধু। সবচেয়ে কাছের মানুষ। সত্যিকারের শুভার্থী। আমার অসহায় অভিযোগের সান্ত্বনা দিতে কতবার বলেছে, যত মানুষ আমাদের চেনে, তার চেয়ে কম মানুষের ভেতরে যদি আমরা বাস করতাম তা-হলে জীবনটা অনেক শান্তির হতো। হয়তো সুখেরও হতে পারত। এখানে এত মানুষের মধ্যে তুমি আছ, কিন্তু তারা কেউ তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। তাদের চেনাও কষ্টকর। একটা কথা বলব। উপদেশ বা জ্ঞান বলে নিও না। কারণ তা দেবার যোগ্যতা আমার নেই। তোমার বিবেক, মনকে যারা মানুষের বলে ভাববে, কেবল তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখবে। বেশি লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেয়ে দু চার জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অনেক দামী। আবার, এটাও ঠিক বাঁধা-ধরা নিয়মের ভেতর সব সময় চলা যায় না। যখন যেমন দরকার বুদ্ধি করে তেমন তেমন পথে চলতে হয়।

বিদুরের কথার সুগন্ধে আমার বুক ভরে গেল। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি। ওকেই পরম বন্ধু বলে সেইদিন থেকে মেনে আসছি।

ধীরে ধীরে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠলাম। আমাদের বিবাহিত জীবন খুবই সাদামাটাভাবে কেটে যাচ্ছিল। অপ্রাপ্তির পাল্লাটা আমার ভারী হচ্ছিল প্রতিদিন। সে কথা কেউ জানে না। সেই জানার মতো গভীরতা কৌরব পরিবারে কারো ছিল না। আমিও সেকথা বাইরের সকলের কাছে গোপন রেখেছিলাম। নিজের হাসি আর উচ্ছলতা দিয়ে সব কিছু ঢেকে রেখেছিলাম। নিজের বুকের দুঃখকে বাইরে কারো সামনেই একমুহূর্তের জন্যে কাছে আনেনি পাছে পাণ্ডুকে ছোট করা হয়। তাই নিজের কষ্টে নিজে পুড়েছি। বিদুরই একটু একটু করে ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল। থমথমে গম্ভীর মুখে আমার দিকে চেয়ে বলল: তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাব তাই না? কিন্তু মানুষের মুখ চুপ করে থাকে না। সে কিন্তু ঠিক বলে দেয় শরীর মনে কোথায় আগুন

লেগেছে, কোথায় তার যন্ত্রণা, ব্যথা, কতরকমের কাতরানি সব মুখ ফাঁস করে দেয়। তুমি লুকোতে চাইলেও আমি বিশ্বাস করব না। দর্পণ আর মুখ কখনও মিথ্যে বলে না।

বিদুরের কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। এক গভীর বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল মন। দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। তবু দারুণ লজ্জার কাছে মনের সে যন্ত্রণা কিছুই নয়। মুখে এক গভীর বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। বললাম-চমক লাগানো কথা বলে নিজের কাছ থেকে ছাড়া অন্যের কাছে হাততালি পাওয়ার আশা কর না।

বিদুর ভুরু কুঁচকে বলল : যে মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চায়, ধরা পড়ার ভয়ে ছুটে পালায়, মিথ্যে ভান করে সত্যকে এড়িয়ে যায় তার দুঃখ দূর করার ক্ষমতা বিধাতারও নেই।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। লজ্জায় মাথা নুয়ে এল। মুখ নিচু করেই বললাম : তোমার ভাইর সম্মান বাঁচাতে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি। আজ ধরা পড়ে গেছি যখন কৌতূহল ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। আমরা একই শয্যায় কেউ কারো নই। আকৃতিটাই শুধু পুরুষ মানুষের। কিন্তু পুরুষের শরীরের উত্তাপ ওর নেই। মৃতের মতো শীতল শরীর। আমার কোন সান্ত্বনা নেই। নিজের অতৃপ্ত বাসনার আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমরা কেউ-কাউকে ঘৃণা করি না। আবার তীব্রভাবে ভালোবাসি না। মাঝে মাঝে নিজেকে জিগ্যেস করি ভালোবাসা কি শুধু শরীর? মানুষের সঙ্গে জীব-জন্তুর পার্থক্য কি আছে? কিন্তু শরীরটা সন্তান ধারনের যন্ত্র। শুধু সেজন্যে শরীর শরীরকে চায়। নারী মাত্রই সন্তান চেয়ে এসেছে। জীবনকে ভালোবেসে নারী শরীরকে ভালোবাসে। এই জন্যেই নারীর জীবনে পুরুষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার দুঃখটা শুধু সেজন্যেই। মেয়ে মানেই জননী। এই অনুভূতিটা আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়। বড় নিঃস্ব আর দীন মনে হয়। সারা জীবন এই দুঃসহ একাকীত্ব নিয়ে থাকব কী করে? চিকিৎসা করলে হয়তো ও আবার ভালো হয়ে উঠবে।

বিদুর জ্বালা ধরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। মুখে তার কথা জোগাল না। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম : কী আর হবে? সবই অদৃষ্ট। আমার জীবন এত অসহায়, একা একা। কষ্টের জীবনে নিত্যসঙ্গী একাকীত্ব। কী পাপ যে করেছিলাম আমি, কার কাছে, কোন জন্মে, তা জানি না। এ জীবনে বোধ হয় সন্তানের মুখ দেখা হবে না। কেন যে জীবনটা আমার এমন এলোমেলো হয়ে গেল।

আমার বিস্রস্ত চুলের মধ্যে হঠাৎ হাত ডুবিয়ে বিদুর অসহায়ের মতো চুপ করে বসে রইল। অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়ার ক্ষমতাটা ওর এত আন্তরিক যে সেটাই আমার প্রতি তার ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এ রকম একটা অনুভূতিতে আমার ভেতরটা যখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন আমার ব্যর্থ জীবনের সব অভিমান নিয়ে ওর হাতের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে চুপ করে রইলাম। বিদুর কোঁকড়ানো চুলের জটগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে

খেলতে লাগল। আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের সব রঙ, গন্ধ, বিদুরের হাতের ছোঁয়ায় বর্ণময় হয়ে উঠল। কী ভালো যে লাগছিল! কেমন করে বোঝাই?

কানের পাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল: তুমি ভীষণ বোকা? কেঁদে কিছু পাওয়া যায় না। মানুষের করুণা, দয়া, সহানুভূতিতে বুক ভরে। কিন্তু যে যা হারায় তা ফিরে পায় না। পাণ্ডুর বিয়েতে তোমার কাঁদার কি আছে? রাজ রাজরার ঘরে একাধিক বিয়ে নতুন কিছু নয়। তোমার পিতা শূরসেনেরও একাধিক পত্নী আছেন। আমাদের পিতামহ শান্তনুরও একাধিক মহিষী ছিল। এটা কোন ব্যাপার নয়। একজন মেয়ের জীবনে সেটা হয়তো অনেক বড় ব্যাপার। তবু সেজন্যে ভেঙে পড়লে তো হবে না। নিজের মনকে শক্ত করতে হবে। বুকের আগুন যদি চোখের জলে নিভে যায় তা-হলে হেরে যাওয়ার অপমানের প্রতিকার করবে কী করে? তোমার সামনে এখন অনেক কাজ। বলতে পার কাজের সূচনা হয়েছে। কাজ আরম্ভের নির্দেশ এসেছে। দুর্ভাগ্যের মেঘ চিরস্থায়ী হয় না। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তো তোমাকে লড়াকু মহিলা বলে জানেন। কিন্তু তোমার ভেতর লড়াইর সেই জোরটা কোথায়? বনে ঝড় উঠে। বড় বড় গাছও ঝড়ের দাপটে নুইয়ে পড়ে, ধাক্কা সামলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তুমি কেন মনে করছ না, সেরকম একটা ঝড় তোমার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে কিন্তু ভেঙে তছনছ করেনি। ঝড় যেমন আসে আবার চলেও যায়।

আমার যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে বিদুর ডুবুরির মতো মুঠো মুঠো সান্ত্বনার মুক্ত তুলে আনল। আর, আমি হারের মতো করে গলায় পড়লাম। আমার কোন দুঃখ নেই আর। এক একজন মানুষের গলার স্বরে কি যেন থাকে। আশ্চর্যভাবে ভালো লেগে যায়। সমস্ত শরীর যেন গলে যেতে চায়। জীবনের বাস্তব কী আশ্চর্য। স্থান কাল, পরিস্থিতি সেই মুহূর্তে প্রবলবেগে আমাকে বিদুরের দিকে টানতে লাগল। এমন বিপজ্জনকভাবে বিদুরকে ভালো লেগে গেল যে নিষেধের অনুশাসন কিংবা কোন নিয়ম বাঁধনই আর মানতে চাইল না মন। বিদুরের হাঁটুর উপর মাথা রেখে তার মুখের উপর চোখ মেলে ধরি। থমথমে বিষণ্ণ গলায় বলি: সব কথা সবার বোঝার নয়। কিন্তু কোথায় আমার দুঃখ, কিসে আমার অপমান, কত জায়গায় আমার ব্যথা মায়ের মতো কাঁদার আগেই কেমন করে বোঝ গো? তুমি আমার কে হও?

ও আমার টিকল নাকের আগাটি আলতোভাবে ধরে নাড়িয়ে দিল। এক ধরনের চাপা অপ্রকাশ্য খুশিতে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে বলল: বেশি জানতে নেই কখনও। জানতে চাইতেও নেই। আমার ছোট জীবনের এই দিগন্তের কোথাও লুকোচুরি নেই, সবটাই উন্মুক্ত। বিস্তৃত করে কিছুই চোখ পড়ে না। ভাবিও না। কেন ভাবব? জীবনে যা কিছু ঘটে তা সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। তার একটা মানেও থাকে। এক অদৃশ্য হাত বাজীকরের মতো সব কিছু নিপুণ পরিচালনা করে। তার কাজে কোন গলদ নেই। কোন কাজের পরে কোনটা করলে তার চমৎকার সুরাহা হয় সে ঐ বাজীকরই পরিকল্পনা করে। তুমি, আমি সকলে সুতোয় ঝুলোনো পুতুল। তার ইচ্ছেয় তার হাতে খেলছি, আর

অবিছি, আমিই করছি। কিন্তু আমরা কেউ কিছু করি না। পাছে আনন্দে, সুখে, তৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে তাই দিবারাত্র আমি আমি করছি। আমরা শুধু নিজেকে চিনতে শিখেছি। তাই মানুষমাত্রে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে। সেই ব্যক্তিসত্তা তার নিজের। নিজেরই একার।

বিদুরের গলার স্বর এমনিতে কানে গেলে খুশিতে ভরে যায় মন। হস্তিনাপুরে ঐ কণ্ঠস্বর শুনে প্রথম দিন যেমন চমকে উঠেছিলাম তেমনই এক চমক আমাকে জানিয়ে দিল নিজেকে পাহারা দেওয়া ভীষণ কঠিন কাজ। এই অনুভূতির সত্যি কোন মানে আছে কি?

বিদুরের শান্ত সৌম্য চেহারার মধ্যে এমন একটা লুকোনো আকর্ষণ আছে যার মতো চকিতে হৃদয় বিদীর্ণ করার মতো অস্ত্র নেই। চেহারার মতো গলার স্বরেও বিগলিত করুণার নির্ঝর যেন চলকে চলকে চলে। সমস্ত দেহ মনকে প্লাবিত করে উপচে পড়ে অবলীলায়।

কিন্তু হলে কী হবে? জাতে তো নারী। পুরুষ সহজে যা পারে, নারী চাইলেও তা করতে পারে না। তার সাহসে কুলোয় না। তাই মনের কথা মনেই থেকে যায়; মুখে বলা হয় না। মনের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়। মেয়েরা মুখে বলতে পারে না বলেই খুব বেশি করে চায় পুরুষ তাকে বীর্য বলে জয় করুক, দস্যুর মতো লুণ্ঠন করুক, জোর করুক, কেড়ে নিক, চালাক, পরাধীন করে রাখুক। এমন একটা উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে বিদুরের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। বিদুরের হাতটি হাতে নিয়ে কচলাচ্ছি, গালের উপর চেপে ধরছি। আঙুলে আঙুলে, হাতের পাতায় পাতায় উষ্ণতার মিলন হলো। বিদুরের সারা শরীরটাই যেন উষ্ণ প্রস্রবনের ধারা হয়ে আমার শরীরের প্রতি রোমকূপে স্নায়ুর মধ্যে আগুন ঢেলে দিতে লাগল। এ এক নতুন অনুভূতি। নিষিদ্ধ তীব্র উত্তেজক আনন্দে আমার জ্বর জ্বর লাগছিল। পাণ্ডুর ছোঁয়াতে যে শরীর শব এর মত শীতল, নিথর থাকে সেই শরীই বিদুরের স্পর্শে উষ্ণ প্রস্রবনের কূপে পরিণত হয় কী করে? আমার শরীরের মধ্যে যে এমন একটা আগ্নেয়গিরি লুকোনো ছিল জানা ছিল না।

বিদুরের মুখখানা আগুনের মতো গণ গণ করছে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, চাহনিতে কেমন এক ধরণের বিহ্বলতা নেমে এল। ওর দু হাঁটু থর থর করে কাঁপছিল। দু'জন দুজনের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছি। মন খারাপ করা আর্তি বুকে নিয়ে নিরুচ্চারে মনে মনে বলছি, বিদুর। তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ! একঘেয়ে ক্লান্তিকর বিষণ্ন দম বন্ধ ঘরের একফালি আলো হাওয়ার বারান্দা তুমি। বাইরে মস্ত আকাশ ঝুলছে মাথার উপর। চারদিকে কত আলো, হাওয়া, মুক্তির শ্বাস তবু কেন পুরানো একঘেয়ে অভ্যাসের বেড়া ভেঙে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না? তুমি তো অনায়াসে ছিঁড়তে পারতে বিদুর! তুমি তো পুরুষ মানুষ। তোমার ভয় কিসে? শাসন, বাঁধন, নিয়ম শৃঙ্খলা এসব তো আর তোমার জন্যে নয়! তবু তুমি সাহস করে একটা চুমু খেয়ে পর্যন্ত আমাকে ভালোবাসা নিবেদন করলে না। মিছি মিছি লজ্জায় দুচোখ রাঙা জবা করে তুলেছ।

অনন্ত সময় বয়ে চলে যায়।

হঠাৎই মনে হলো, এই মুখ বুজে থাকাটা বোধ হয় নর-নারীর প্রেমের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। মুখে কথা নেই, অথচ দুজনার বুকের মধ্যে কথার সাগর তোলপাড় করছে চিত্রকরের আঁকা চিত্রপটের মতো।

জানালার উপর অপরাহ্নের কমলা রঙের আলো পড়েছে। আকাশের গায়ে ডানা মেলে দিয়ে দু' একটা করে পাখি মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে নীড়ে ফিরছে। তাদের ডানায় এবং পালকের উপর হলুদ আলো পড়েছে। জীবনের আলো। মৃদু বাতাসে তাদের গায়ের গন্ধ উড়ছে। আর ঘরের মধ্যে যৌবনের গন্ধ আমাদের দুজনার বুকে ভুর ভুর করছে। একজন নারী তার স্বামীকে না পেলে যদি আরেকজন পুরুষের ভেতর তার স্বামীকেই খোঁজ করতে হয় তখন সেই দ্বিতীয় জনকে নিজের ভেতর আবিষ্কার রা, অনুভব করার এক আশ্চর্য অনুভূতিতে সারা শরীরে সিরসিরানি উঠে।

বিদুর চুপ করে চেয়ে ছিল। পুরুষের ঐ চাউনি আমি চিনি। মুগ্ধ করা মন্ত্র নিয়ে পুরুষ ঐভাবে আহ্বান করে নারীকে। কিংবা নারী করে পুরুষকে। চুপিসারে পা পা করে হাঁটে, যেমন করে বাঘ এগোয় শিকারের উপর নজর রেখে।

হঠাৎ স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে বিদুর মজা করে জিজ্ঞেস করল কী সুন্দর বলতো! এ রকম মহৎ বোধ আর কী আছে? আচমকা অপ্রস্তুত ভাবে বলে এইটে কী কম পাওয়া হলো! পুরুষ আর নারী যখন নীরব থাকে তখনই বুকের গভীরে স্বপ্নগুলো আলসের উপর বসা কপোত কপোতীর মতো ডানা ঝাপ্টা ঝাপ্টি করে, কিছু বলার জন্যে ঠোঁট নাড়ে চাড়ে। বড় সুন্দর অনুভূতি! নিজের সত্তা যে কত দামী; কত মহার্ঘ হয়ে উঠে তা এমন করে জানা হয়নি কখনও। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসে নিজেকে আবিষ্কার করার এক ধরণের গভীরতর সুখ পেলাম।

জলের নীচে দিনের আলো যেমন কাঁপে তেমনি মৃদু কম্পন ঘটে গেল আমার সত্তার মধ্যে। কথাগুলো বলার সময় বিদুরের মুখে এক প্রসন্নতামাখা প্রেম ছবি ফুটে উঠল। অস্ফুট চাপা গোপন কাম ভাবও আমার দৃষ্টি এড়াল না। তার ভালোলাগার ঘরে আগল দিয়ে নিঃশেষে নিবেদন করতে একটুও গোপন করল না নিজেকে।

সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কী যে ঘটে গেল কে জানে? জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চুপ করে চেয়ে আছি। অপরাহ্নের মরা আলো পড়েছে আমার মুখে। সামনের বনভূমিতে পাতা ঝরা গাছে নতুন কিশলয় মৃদু মন্দ বাতাসে জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এক ঝাঁক সবুজ টিয়ার উল্লাসী সমবেত চিৎকারের মতো এক দারুন মুগ্ধতা আমার জীবনের নতুন মানে বয়ে নিয়ে এল। বিদুরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটের কোনে। প্রশ্রয় ভরা তিরস্কারের দুটি উজ্জল চোখ মেলে ধরি ওর চোখের তারায়। মৃদু কণ্ঠে বলি: একজন নারীর কাছে নিজেকে অসামান্য করে তুলতে কত কপটতাই না করলে? তবু মুখ ফুটে চারটি অক্ষরের শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে না। তুমি একটা অদ্ভুত বাজে লোক।

বিদুরের মুখে অনির্বচনীয় হাসির আভা ফুটল। বলল : চারটি অক্ষরের শব্দ তো কত আছে ? কোন চার অক্ষরের শব্দের কথা বলছ ?

কপট রাগ করে মুখ ঝামটা দিয়ে বলি : ন্যাকা।

কাকে দিয়ে কখন কিভাবে ইতিহাস সৃষ্টি হয় সৃষ্টি কর্তা নিজেও বলতে পারে না। তেমনি কোন মানুষও জানে না কী করে সে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে যেতে পারে। মানুষের অজান্তেই ইতিহাস তৈরী হয়ে যায়। কখনও মন্থরভাবে কখনও দ্রুত। দেশ কাল এবং ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইতিহাস সাগরে যাওয়া নদীর চলাকানো স্রোতের মতো উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে চলে নিঃশব্দে। তবু যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয় ঈশ্বর তাকে অন্য ধাতু দিয়ে গড়ে। বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়। কোন কিছুতে ভেঙে পড়লে হয় না। আমার ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে বিধাতা এক অদৃশ্য কালি দিয়ে আমাকে ইতিহাসের উপাদান করে গড়েছেন। ইতিহাসের স্রষ্টা বলে নিজেকে দাবি করব এমন জোর পাই না মনে, তবে আমার ভেতর দিয়ে এক ইতিহাসের জন্ম হয়েছে। আমাকে তার জননী বা ধাত্রী বললে বোধহয় খুব বেশি বলা হবে না।

আমার চতুর্দিকে বনভূমি জ্বলছে দাউ দাউ করে। আমি তার মধ্যে বন্দী। নরমাংসভোজী আদিম উপজাতিরা তাদের শিকার জীবন্ত পুড়িয়ে মারার আগে যেমন বহ্ন্যুৎসব করে, আনন্দে নৃত্য করে তেমনি লেলিহান শিখা সদর্পে এবং কী বিপুল হর্ষে আমাকে ঘিরে নৃত্য করছে। আগুনের দ্বীপে বন্দীর মতো চাপা কান্না বুকে নিয়ে একা একা বেঁচে থাকার কষ্ট, ভয়, আতঙ্ক ও উদ্বেগের চেয়ে বেশি করে মনে হতে লাগল : ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষা এভাবেই মানুষকে দিতে হয়। অনেক রক্তে চোখের জলে লেখা হয় তার কাহিনী।

পিতৃব্য ভীষ্মের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। তবু আমাকে হস্তিনাপুরের বধূ বলে মেনে নিতে পারলেন না তিনি। রাজমহিষীর প্রাপ্য সম্মান থেকেও বঞ্চিত করলেন আমাকে। রাজসভায় পাণ্ডুর পার্শ্বে সম্রাজ্ঞীর আসনটি শূন্য রেখে আমাকে শুধু অবহেলা করলেন না, অপমানও করলেন। এ রাজ্যের মানুষের চোখে আমি যে কত ছোট হয়ে গেলাম সে কথা মনে হলে অভিমানে, দুঃখে দু'চোখ ভরে জল নামত।

আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট এই যে, পাণ্ডুকে কখনো কোন কথা বলা হলো না। কত কথা বলার ছিল। তবু বলা গেল না। কারণ মাদ্রী আমোদের দু'জনের সম্পর্ককে অনেক দূর করে দিয়েছে। মাদ্রী খুব ভালো মেয়ে। নিরীহ এবং অত্যন্ত নম্র, শান্ত, কোমল স্বভাবের। প্রথম সাক্ষাতেই সে আমার মন হরণ করেছিল। বড়'র আসনে বসিয়ে ছোটর মতো সে সর্বদা অনুগত থেকেছে। তবু তার সম্পর্কে আমি খুবই সতর্ক এবং সাধারণ ছিলাম। কারণ, মানুষকে বিশ্বাস করে আমি বারবার ঠকেছি। তাই বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস না করে ঠকা অনেক ভালো বলে মনে হয়েছে।

মাদ্রী তো পিতৃব্য ভীষ্মের পছন্দ করা মেয়ে! আর আমি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মনোনীত পাত্রী। আমার সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রটা এখানেই। দু'ভাইয়ের বিরোধ ও রেষারেষির ঘোলা আবর্তের মধ্যে পড়ে আমার জীবনটাই বিষময় হয়ে উঠল। এজন্য দায়ী কে? দ্বৈপায়ন, না ভীষ্ম, না আমার ভবিতব্য। বোধহয় ভবিতব্যই একে বলে!

ভবিতব্যের কারণে পিতৃব্য ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের পিতামাতা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দু'ভাই। একজনের শরীরে কৌরবংশের রক্ত, অন্যজন কৌরববংশের কেউ নয়, কিন্তু কৌরববংশধারায় দ্বৈপায়নের রক্তধারা এসে মিশল। দ্বৈপায়ন এই পরিবারের কেউ না হয়েও রাজমহিষী জননী সত্যবতী এবং বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে হস্তিনাপুরের উপর একটা অলিখিত দাবি ও অধিকার ছিল তাঁর। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর এই নিঃশব্দ প্রবেশকে মেনে নিতে পারলেন না। আবার দ্বৈপায়নও তাঁর সন্তানদের উপর পিতৃত্বের দাবি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নিজের অজ্ঞান্তে ভীষ্মের সঙ্গে এক গোপন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন। আমার বিয়েতে তার সূচনা হলো। ভীষ্মের কর্তৃত্বাভিমানের উপর দ্বৈপায়ন সরাসরি আঘাত করলেন। দুভাইয়ের রেষারেষি, কলহ দ্বন্দ্বের মধ্যবর্তী হয়ে রইলাম আমি। কাঁটার মতো তাঁদের বিবাদের সম্পর্কটা আমাকে শুধু বিঁধে থাকল না, জীবনটাকেও কণ্টকিত করল। ভীষ্মের বিশ্বস্ততা অর্জন করা আমার পক্ষে কঠিন হলো। তাঁর চোখে আমি দ্বৈপায়নের অস্ত্র শুধু। যেখানে যেমন দরকার সেখানে আমাকে ও পাণ্ডুকে ব্যবহার করে গোটা রাজশক্তিকে দ্বৈপায়ন নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান বলেই পাণ্ডুকে রাজা করলেন। ভীষ্মকে তোয়াক্কা না করে আমাকে হস্তিনাপুরের রাজমহিষী করে দ্বৈপায়ন কার্যত ভীষ্মের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করলেন। দ্বৈপায়নের কাছে এতবড় অতর্কিত পরাজয়কে ভীষ্ম নীরবে মেনে নিতে পারলেন না। তাই হস্তিনাপুর থেকে তাঁকে হঠানোর জন্যেই ভীষ্ম কঠোর হলেন। দ্বৈপায়নের প্রভাব কমাতেই আমাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে অবাঞ্ছিত করা একান্ত দরকার হলো। শুধু সেইজন্য পাণ্ডুর জীবনে আরো একটি নারীর আকর্ষণকে অনিবার্য করে আমাকে ফালতু করার ফন্দী করলেন ভীষ্ম। বলতে বাধা নেই, সপত্নীগত ঈর্ষা-বিদ্বেষের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো জটিল ও তিক্ত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তাই যাদব রাজ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে মদ্ররাজ্যের বিবাদ, কলহ ও বৈরীতার

সম্পর্ককে দৈনন্দিন জীবনের ভেতর টেনে এনে আমার জীবনকে বিষিয়ে তোলার সংকল্প নিয়ে মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গেই পাণ্ডুর বিয়ে খুব জাঁকজমক করে দিলেন ভীষ্ম। বহুদেশ থেকে নরপতিরা এলেন, ব্যবসায়ী, অভিজাত ব্যক্তিরা এবং বহু গুণীজন এলেন। মাদ্রী ও পাণ্ডুর বিয়েটাই সর্বজনসমক্ষে বড় করে তোলা হলো। লোকের মুখে মুখে এই বিয়ের ধুমধাম, আনন্দ, যতদিন মনে থাকবে ততদিন হস্তিনাপুরে সত্যি আমি নগণ্য হয়ে থাকব। অপমানের বিষ জ্বালায় আমার ভেতরটা যত জ্বলবে ততই তার বিষদংশনে মাদ্রী ও পাণ্ডু জর্জরিত হবে। তাদের জীবন থেকে আমিও ততই দূরে সরে যাব। ভীষ্ম এক ঢিলে দুই পাখী মারল। আমাকে ও দ্বৈপায়নকে হস্তিনাপুরে অবাঞ্ছিত করে, পাণ্ডুকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে হস্তিনাপুরের সব কর্তৃত্বকে ভীষ্ম নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে এলেন। পিতৃব্যের চতুর ছলনার পেছনে আরো একটা হিসাব ছিল—সপত্নীগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ রেষারেষির হলাহল পান করে আমরা দুটি রমণী বিবাদে, কলহে পরস্পরকে শুধু বিষদংশন করব না, পাণ্ডুকেও সেই বিষের সমুদ্রে টেনে এনে বিপন্ন করে তুলব। এক ঘোরতর ঘরোয়া অশান্তিতে তাকে যত বিব্রত ও ব্যস্ত রাখা হবে ততই রাজকার্যের সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যাঘাত হওয়ার অভিযোগে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে পিতৃব্যের করুণাপুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করা সহজ হবে।

মাদ্রী ও পাণ্ডুর বিয়েটা যে ভীষ্মের একটা ভয়ংকর ফাঁদ, হঠাৎ-ই আমার মধ্যে তার আলো ঝলকে উঠল। বুকে অপমানের হলাহল। কিন্তু তাঁর দুঃসহ জ্বালা মুখ টিপে বয়ে বেড়ানো বড় কষ্টকর। তথাপি সেই বিষজ্বালা নিয়ে আমি কাজ করছি, খাচ্ছি হাসছি. লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করছি, গল্প-গুজব করছি। হয়তো এমন করতে না পারলে জীবনের গতি রুদ্ধ হতো। এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। কিন্তু যাকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়, ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে তার জীবনের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারটা বোধ হয় অন্যদের সঙ্গে মেলে না। লোকে বাইরে থেকে দেখে বলেই, অভ্যেস আর একঘেয়েমি যে আমার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে তা দেখতে পায় না।

কিন্তু বিদুরের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। সে আমার আত্মাকে দেখতে চায়। আত্মাকে বাদ দিয়ে মানুষটাকে দেখতে চাওয়ার মতো বড় মিথ্যে হয় না। মানুষের শরীরের মধ্যে যে মন বাস করে ; সে কেমন ? বিদুর তাকে আবিষ্কার করতেই এসেছিল।

সেদিন রাত্রিটা এক আশ্চর্য রাত্রি।

চারদিকে জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলমল করছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি একা। আমার চুল বাঁধা হয়নি। বিষণ্ণ মন নিয়ে কেশ বিন্যাশ করতে. রূপচর্চা করতে ভালো লাগে না। কার জন্যে সাজব ? মৃদু বাতাসে চুলগুলো এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে। চোখ মুখ ঢেকে গেছে একেবারে। আলতো হাতে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছি যত্ন করে। আমার ছায়া পড়েছে পিছনের দর্পণে। আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে নিজেকে দেখছি। ঐ ছায়াটা তো মিথ্যে নয়। আমার মতনই

আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তার স্বাধীনতা, নিজস্বতা আমার পাশে এসে দাঁড়াল। চারধারে তখন কেউ ছিল না। ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম। চাপা উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল শরীরের কোষে কোষে।

ওকে দেখলে মনের মন যে আমার কী করবে ভেবে পায় না। পাছে আমাকে কোন প্রশ্ন করে বসে তাই ওর দিকে চেয়ে অকারণ হাসি। ওই বিব্রত করুণ হাসির মধ্যে অনেক কিছু ছিল। আমার মনের জ্বালা, যন্ত্রণা, অসহায়তা সব ঐ মোহন হাসিতে এমন করে নিঙড়ে দিলাম যে বিদুর সহসা কথা খুঁজে পেল না। বিহ্বল চোখের তারায় আমার প্রতি ওর মমতা, দরদ, সহানুভূতি যেন ঠোঁটের কোনে ব্যাথার হাসি হয়ে ফুটল। বলল ঃ তুমি হাসলে যে!

চোখের কোনে আমার বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললাম ঃ কাঁদলে কী সুখী হও তুমি? কী হলো? কথা বলছ না যে!

ভাবছি।

কী এত ভাবো? বেশি ভাবলে মানুষ স্থবির হয়ে যায়। পাগল হয়ে যায়।

আমার মন তোমার জন্যে ভাবতে বলে।

তাই বুঝি?

তুমিই বলো, পাণ্ডুর সঙ্গে তোমার মনের কোন মিল নেই, এমন কি শারীরিক সম্পর্কও নেই, তবু ভালোবাস তাকে? জবরদস্তি করে কাউকে ভালোবাসা যায়! আশ্চর্য লাগে।

বিদুরের কথা শুনে হাসি পেল আবার মজাও লাগল। বিষণ্ণ হেসে বললাম ঃ কী জানি। নিজেও বুঝতে পারি না নিজেকে।

বিদুরকে অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসতে দেখে অবাক গলায় শুধালাম ঃ হাসছ যে।

হাসছি তোমার কথা শুনে। রাতে মাদ্রী যখন পাণ্ডুর আদর খায় তখন তুমি নিশ্চয়ই খুব কাঁদ?

জানি না। বলতে গিয়ে চোখের পাতা কেঁপে যায়, মুখের ভাব পাল্টে যায়। গলার স্বর ভারী হয়ে উঠে।

স্বামী চাও না তুমি।

খুব চাই। কিন্তু আমার ভাগ্যের মধ্যে এত নিষ্ঠুরতা আছে যে তার জন্যে কষ্ট হয়। নারী পুরুষের ভালোবাসা কোন একটা অভ্যাস নয়। যেখানে আবেগ নেই, স্বতস্ফূর্ততা নেই, শ্রদ্ধা নেই; মমতা নেই, সেখানে সম্পর্ক আলাদা হয়ে যায়। তোমার ভাইর মতো স্বামী পাওয়া নারী জীবনের অভিশাপ। এই বন্ধনটাই আমার জীবনের একটা বড় ফাঁস।

কথাগুলো দুম্ করে দুঃসাহসের সঙ্গে বলে ফেলে বেশ ঝরঝরে লাগল।

বিদুরও থমকে গিয়ে চোখ তুলে তাকাল। ওর মুখে ঘাম ফুটে উঠল। আমতা আমতা করে বলল ঃ আমাকে চাও কী?

ওর কথা শুনে ভুরু কুঁচকে জিগোস করলাম ঃ কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

আমাকে তুমি কোনদিন বোঝার চেষ্টা করনি। কিংবা আমি পারিনি নিজেকে প্রকাশ করতে। আসলে মনে মনে তোমাকে যা বলতে চাই, বলব বলে ঠিক করে

রেখেছি, বলার সময় ঠিক তার উল্টোটা বলেছি। আমি এরকমই।

তুমি একটা পাগল।

কেন?

পাগলকে আর কী বলব?

অভিমানে বিদুরের গলার স্বর ভারী হলো। বলল: সত্যিই তো, আমি তোমার কে? খুশি বইবার মানুষ তো অনেকই আছে তোমার। আমি না হয় দুঃখ বইব।

বিদুরের শ্লেষ আমাকে বিদ্ধ করল। বুকটা সত্যিই হাহাকার করে উঠল। চোখের পাতা বন্ধ করে মনের কষ্ট রুদ্ধ করি। মনে মনে বলি: তুমি যে আমার কে, আমিই জানি। তুমি আমার সর্বস্ব। আমার সুখ, আমার জীবন মরণ, অস্তিত্ব—অনস্তিত্ব সব।

জানালার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়ালাম। বিদুর আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর খুব আস্তে আস্তে নম্র গলায় বলল: তোমার ভারাক্রান্ত মনের ভার একটু লাঘব করতে এসেছিলাম। বিশ্বাস কর শান্তি দিতে এসে ভুল বশে এক বুক অশান্তি নিয়ে ঘরে ফিরছে—একী কম দুঃখ আমার!

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা যন্ত্রণা চিরে দিয়ে যায় আমার ভেতরটা। হঠাৎ বিদুরের দিকে ঘুরে দাঁড়াই। প্রশ্রয় ভরা তিরস্কারে দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি বিদুরের দিকে। উদ্বিগ্ন গলায় বলি: সে কি? কেন? এ সব কথা বলে সত্যি কী কোন লাভ হয়? গলার দ্রবীভূত স্বর কান্নার মত শোনাল।

বিদুরের কণ্ঠস্বরে অভিমান, অপমান ছাপিয়ে উঠল। বলল: কী জানি? যে কারণে একটা মানুষ ভুল করে। সেই দুর্বলতা আমাকে তোমার কাছে হঠাৎ-ই চির অপরাধী করে রাখল।

কথাগুলো শুনে ভীষণই কষ্ট হলো। হঠাৎ ওর দু'খানা হাত আমার হাতের পাতার মধ্যে চেপে ধরে বলি: কী বলছ তুমি? তোমার জন্যে না হলেও আমার নিজের জন্য তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। তুমি ছাড়া এখানে আমার কে আছে? বিশ্বাস কর, আমার আমিময় এই জীবনটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম এত বেশি যে ভালো করে দেখাই হয়নি যে, তুমি এমন করে ভরে আছ আমার সমস্ত চেতনার ভেতরে। মর্মের ভেতর। আমার সমস্ত আমিত্ব যে তুমিময় হয়ে আছ আমার নিঃশ্বাসের ভেতর টের পাই।

কথাগুলো বলে ভীষণ লজ্জা হলো। লজ্জা পেয়ে বললাম: ছিঃ! কী লজ্জা বলো তো।

অবাক হয়ে বিদুর অস্ফুট গলায় বলল: লজ্জা কিসের? লজ্জা পাওয়ার মতো তো কোন কথা বলনি। আমার চোখের মধ্যে বিদুরের চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল যেন তার স্নিগ্ধ নিবেদনের নীরব ভাষা একটুও অপচয় না হয়। পুরুষের এই কাঙাল চাউনি সব মেয়েই চেনে। সারা শরীরের ভেতর এক অব্যক্ত সিরসিরানি উঠল। বিদুর আমার কাঁধে হাত রাখল। বুকে বুকে উষ্ণতার মিলন হলো।

কয়েকটা মুহূর্তের বিভ্রম। তারপর, ওর হাতখানা কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে

সরিয়ে দিয়ে বলি তুমি একটা পাগল। নিষিদ্ধ ফল ছুঁতে নেই। যে একবার ছুঁয়েছে সেই জানে।

বিদুরের হাসি হাসি মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে উঠল। চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকেই ওর মুখ লাল হয়ে গেছে তাই নয়, এই বাড়াবাড়ির ঔৎসুক্যে লজ্জিত হয়েছে অনেকখানি। হাসতে হাসতে বলি : লজ্জা! লজ্জা!

কিসের? তোমার লজ্জা? পুরুষ মানুষদের বেহায়া হওয়াটা মেয়ে মানুষও চায়। আবার অবহেলা অবজ্ঞা করে, তাকে মহার্ঘ করে তোলে মেয়ে মানুষই। এটা হলো নারী পুরুষের মুগ্ধতার এবং ভালোবাসার পুরনো খেলা। মেয়ে মানুষ চায় পুরুষ তার উপর জুলুম করুক আর নারী তার সব অনিচ্ছা নিয়ে চায় পুরুষের কাছে পরাভব মেনে ভরে উঠতে। এসব না বুঝলে মেয়েদের মনের নাগাল পাবে না কোনোদিন।

মুগ্ধ অভিভূত গলায় বিদুর ডাকল : বৌ-ঠান!

বুকের ভেতর কেঁপে গেল আমার : যাও। কুন্তী কারো অনুকম্পা চায় না, সমবেদনা চায় না। তাই তো সব দুঃখ, বঞ্চনা, কষ্ট ব্যর্থতা, হতাশার মধ্যেও তার মুখ ভরা হাসি সব সময়। দোষ তো আমার ভাগ্যের! তাই কারো কাছে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমিই মন্দ বলে অন্যকে মন্দ ভেবে ছোট করব কেন?

ভালোই বলেছ। মানুষ বিধাতার এক বিচিত্র প্রাণী। জন্তু জানোয়ারের তো মন নেই তার মনের উর্ধ্বগতি, অধোগতির খবর সে রাখে না। কিন্তু মানুষ অনুভূতির সংঘাতে প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, কিন্তু তার সব খবর মনের মালিকও বোধ হয় টের পায় না। তাই সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে নিজেকে। তোমার মুখ ভরা হাসির মধ্যে মনের যে কষ্ট লুকোনো আছে, মুখে না বললেও আমার সমস্ত অনুভূতির ভেতর অনুভব করি। সব পুরুষের একজন নারী সঙ্গী চায়, সব নারীরও একজন পুরুষ সঙ্গী চায়। পেয়েও তাদের এত কষ্ট কেন? আসলে সব মানুষই চায় এমন একজন মানুষের সাহচর্য, বন্ধুত্ব, প্রেম দরদ, মমতা সহানুভূতি যে তাকে আনন্দ দেবে, আশ্রয় দেবে, রক্ষা করবে, ছোট্ট নীড় রচনা, আর সন্তানের স্বপ্ন সফল করবে। কিন্তু যেখানে থেকে তা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না কিংবা পেয়েও তাকে বর-বৌর খেলা, কাল্পনিক ছেলে-মেয়ের সংসারের পুতুল খেলা করে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়টুকু ছাড়া তার কোন দাম নেই। মনের একান্ত চাওয়ার সঙ্গে ইচ্ছে ও পাওয়ার মিল না হলে পাওয়ার ঘর, সুখের ঘর ভরে উঠে না।

বিদুরের কথা শুনে আমার চোখ ভরে জল নামল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে কান্না কান্না গলায় বলি : 'সত্যিই, কজন আর কেঁদে তালাচাবি দেয়া দমবন্ধ ঘরে এই বোবা ভার থেকে মুক্ত করতে পারে নিজেকে। নিজের ব্যর্থ জীবনের কথা বলে শুধু লজ্জা পাওয়া যায়। গ্লানি পাওয়া যায়। কোন আনন্দ সত্যিই তার ভেতর নেই। তবু মনের মানুষটাকে মনই খুঁজে নিয়ে অকপটে সব কথা বলে। তেমন মনের মানুষ দু একজনই হয়। যার কাছে একজন মেয়ে হেরে যাবার মতো ভীরুতার কথাও অসংকোচে বলতে পারে।

বিদুর অনন্ত বিস্ময় নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় জোড়া পায়রা এসে জানলার কপাটে এসে বসল। সপ্রেমে গভীর স্বরে বক বকুম করতে লাগল।

হায়রে মানুষের আশা! হায় রে মানুষেব স্বপ্ন! কত আশা নিয়ে জীবনের নীড় বচনা করে, ভালোবাসাব কত চবপ্ন তার চোখে, জীবনের কত অদ্ভুত, অসম্ভব সব ছবি আঁকে সে। আব জীবন দেবতা অদৃশ্য হতে কী নিষ্ঠুরভাবে সেই স্বপ্নের তাজ ভেঙে চুবমাব কবে দেয়। অসহায় দর্শকের মতো তাকে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না মানুষের হাতে! হাতই যখন থাকে না তখন এমন এমন অদ্ভুত অসম্ভব সব স্বপ্ন মানুষ দেখে কেন?

শূদ্রক রাজা দেবকেব পরমা সুন্দরী কন্যা পবাশবীর সঙ্গে বিদুরের বিয়েটা জোর করে দেয়াব পব থেকে মনে হতে লাগল আমার জীবনটা অর্থহীন। এই পৃথিবীতে পিতৃব্য ভীষ্ম আমাকে বিদুরেব কাছ থেকে আলাদা করে দিল। আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম। ভীষণ শূন্য লাগল। মাথার উপব ছাদ না থাকলে যেমন অসহায় লাগে, ভীষণ আশ্রয়হীন মনে হয় তেমন একটা বিচ্ছিন্নতা-বোধের যন্ত্রণার এক জ্বালা ধরা অনুভূতি আমাকে ভীষ্মের উপর বিরূপ করে তুলল। মনে হতে লাগল, এই মানুষটি কৌরব পরিবারে আমার সকল সুখ আগলে রেখেছে। আমাকে একটু আনন্দে াকতে দেবে না। এক দারুণ আক্রোশে আমাকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে যেন। ঘুণপোকার মতো আমার সুখ-শান্তি, স্বস্তিকে নিঃশব্দে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। নিজের জেদে জিততেই যেন আমার জীবনটা মিথ্যে করে দিল। আমার ও বিদুরের মধুর প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে সহ্য করতে পারছে না বলেই আমাদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর গড়ে তুলতে এবং আমাকে একেবারে একা করতেই যেন পরাশরীর সঙ্গে বিদুরের বিয়ে হলো।

আমার উপয় পিতৃব্যের নিষ্ঠুর হওয়ার কারণ বুঝি না। তাঁর মতো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে আমার মতো নিতান্ত এক সামান্য রমণীর কোন সংঘাত থাকতে পারে না। কী নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিরোধ করব? আমার আছে কি? পায়ের তলায় মাটি নেই, বেঁচে থাকার আশ্রয় নেই, পাশে দাঁড়ানোর মানুষ নেই, আমার হয়ে কথা বলার প্রতিনিধি নেই, পরামর্শ দেয়ার মানুষ নেই

তবু পিতৃব্য আমার সঙ্গে এক অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ যুদ্ধ কার সঙ্গে? তবে কি, আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে বসিয়ে দ্বৈপায়নের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করছেন? ভীষ্মের সব যুদ্ধ দ্বন্দ্ব তো দ্বৈপায়নের সঙ্গে। দ্বৈপায়ন পাছে তাঁর কর্তৃত্বের উপর খবরদারি করে তাই কর্তৃত্ব এবং অধিকারকে সর্বদা আগলে থাকেন। বিদুরের বিয়েটা তাঁর কর্তৃত্ব আগলানোরই ব্যাপার। হস্তিনাপুরে কৌরব পরিবারে তিনিই সব। তাঁর আদেশ-নির্দেশ, ইচ্ছে-অনিচ্ছেই শেষ কথা।

কিন্তু দ্বৈপায়ন তাঁর অধিকার খর্ব করেছেন। বংশরক্ষার সমস্যার সমাধানে এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব কৌরব পরিবারে সুদৃঢ় করতেই এবং ক্ষেত্রজ পুত্রদের উপর পিতৃত্বের অধিকার ও কর্তৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতেই তাঁর ও ভীষ্মের মধ্যে একটা নীরব লড়াইর সূচনা হলো। রাজপরিবারের অনুমোদন না নিয়ে পাণ্ডুর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিয়ে কার্যত দ্বৈপায়ন ভীষ্মের সঙ্গে এক অঘোষিত শক্তি পরীক্ষার লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্তত, ভীষ্মের তাই মনে হয়েছে। দ্বৈপায়নের এই অনুপ্রবেশের পরিণাম ভালো হয়নি। বরং, পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়েছে, বিরোধ বেড়েছে। আভ্যন্তরীণ সংকট আরো জটিল হয়েছে। দ্বৈপায়নকে কৌরব পরিবারে প্রবেশের পথ করে দিয়ে পিতৃব্য ভীষ্ম একদিন যে ভুল করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে আর প্রস্তুত নন। দ্বৈপায়ন এই পরিবারের কেউ নয়। কী হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে, কী পরিবারের মধ্যে তাঁর কোন ভূমিকা কিংবা দাবি ভীষ্ম মানতে রাজি নন। এখানে শুধু অতিথি তিনি। তাঁর ঔরসজাত ক্ষেত্রজ পুত্রদের উপর তাঁর কর্তৃত্বের কোন অধিকার নেই, একথাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমার উপর অবিচার করে চলেছেন। হস্তিনাপুরে আমার অপমান, অনাদরের কারণ দ্বৈপায়ন। পিতৃব্যের চোখে আমি দ্বৈপায়নের দুরন্ত জেদের প্রতিরূপ। আমাকে তাঁর সহ্য করা তাই কষ্টকর।

যত দিন যেতে লাগল, আমি বুঝতে পারছিলাম এই রাজ্যের এবং পরিবারের সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠ মানুষটির সঙ্গে বিবাদ করে একত্রে বসবাস করা অসম্ভব। তাঁর বিরূপতায় আমি কষ্ট পাই। নীরব অবজ্ঞা আমাকে বিদ্ধ করে, অবহেলায় অপমান বোধ করি। অনাদরে জীবনটা প্রতিমুহূর্তে অর্থহীন মনে হয়। এই পরিবারে সত্যি আমার কোন জায়গা নেই। আমার জায়গা পূরণ করতে মাদ্রীকে আনা হয়েছে। পাণ্ডুর কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পাণ্ডুর ভালোবাসা হয়তো আমার উপর এখনও আছে। বিদুরের মনেও যে অনুরাগের পাত্র শূন্য হয়ে গেছে এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। তবু, ওরকম প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা, কিংবা ঔদাসীন্যে মোড়া ভালোবাসা দিয়ে জীবন চলে না। আমার জীবনটা এদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় সেটাও চাই না। আমি ফুরিয়ে যেতে চাই না। এ জীবনের একটা কোন অর্থ খুঁজে বার করা দরকার। অর্থ পাওয়া যাক বা না যাক সেই খোঁজটা আমি ফুরিয়ে যেতে দেব না। ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানি বোধ করছি। কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছি না। ইচ্ছে করল, জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়তে। সেই মুহূর্তেই

মৃত্যুর কথা মনে হলো। শুধু শুধু মরতে যাব কেন? অসময়ে মৃত্যু মানেই তো জীবনের অপচয়।

আরো মনে আছে, কী ভয়ঙ্কর মানসিক অস্থিরতায় সেই সময়টা কেটেছিল। বিছানা আমার বিষ লাগতো। রাতভোর এ-ঘর ও-ঘরে করে বেড়িয়েছি। মাথার ভেতরটা একেবারে শূন্য। কপালে ঘাম জমেছে। পোশাকের নিচে ঘামে ভিজে গেছে। একসময় থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এসব করছি কেন? কার জন্যে করছি? আমার কী হয়েছে? এসব করে, আমি যা হারাতে বসেছি তা কি ফিরে পাব? এভাবে কিছু ফিরে পায় কি? মিছেমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি কেন?

খানিক বাদে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসে ভিজে পোশাক বদলে খোলা জানলার পাশে এসে দাঁড়ালাম। ফুরফুরে হাওয়ায় দেহ-মন স্নিগ্ধ হলো। বাইরে স্তূপাকৃত অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মাথার উপর নীল আকাশ। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ দিগন্তের বুকে ঝুলে আছে। দু'একটা তারা করুণ চোখ মেলে আমাকে দেখছে যেন। করুণার কথা মনে হতেই মনের মন প্রশ্ন করল—কোথায় গণ্ডগোল হয়ে গেল? কিসে ভুল হলো? এইভাবে ঘরবার করে কী বেঁচে থাকা যায়? যায় না বলেই বোধ হয়, এভাবে হন্যে হয়ে অন্য কোন উপায় খুঁজছি? মনের ভেতর খোঁজটা রয়ে গেছে। কারণ, আমি তো বুঝতে পেরে গেছি হস্তিনাপুরে আমি অপ্রয়োজনীয়। আমি শুধু একবার দেখতে চাই; আমার নিজের কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য আছে কিনা?

ধীরে ধীরে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি। চোখের নিচে রাত জাগার ক্লান্তি এবং কালিমা পড়েছে। মুখেতে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ লেগে আছে, চোখের চাহনিতে রয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন। বয়সের সঙ্গে মনের সঙ্গে লাল আর সবুজ পোশাক বেশ মানিয়ে গেছে।

আমার স্মরণশক্তি প্রবল। সহজে কিছু ভুলি না। বহুকাল আগের ঘটনা। তবু জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনাই আমার মনে গেঁথে আছে। কেবল তারিখ আর বারটা মনে নেই।

বেশ ঝকঝকে রোদ উঠেছিল। ভোরের স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে আমি পাণ্ডুর

ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মৃদু টোকা দিলাম দরজার কপাটে। একবার। দুবার। তিনবার। ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। তবু ফিরে যেতে পা উঠল না। কল্পনায় দেখছিলাম মাদ্রীর গভীর আলিঙ্গনের মধ্যে পাণ্ডু নিশ্চিন্তে সুখে ঘুমোচ্ছে। মাদ্রীর সুকোমল উন্নত বক্ষযুগলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে যৌবনের ঘ্রাণ নিতে নিতে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়তো পাণ্ডুও। অথবা শরীরী আনন্দের আকর্ষণ ছেড়ে শয্যাত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে না তার। তাই হয়তো দরজায় বারংবার টোকার শব্দ শুনেও সাড়া দিচ্ছে না। খুব ইচ্ছে করছিল জড়াজড়ি অবস্থায় তাদের ঘুমের দৃশ্য দেখতে। শান্ত সকালেব রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক আশ্চর্য শরীরী দহনের তাপ উষ্ণতায় আমাকে ভরে দিচ্ছিল যেন। বুক থেকে এক গভীর শ্বাস পড়ল।

ফিরেই যাচ্ছিলাম। খুট্ করে দরজার খিল খোলার শব্দে থমকে দাঁড়ালাম। দরজায় যাকে দেখলাম সে মাদ্রী নয়, পাণ্ডু। বেশ বাসে একটুও শৈথিল্য নই। অনন্ত বিস্ময় নিয়ে কয়েকমুহূর্ত আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। বুকের মধ্যে আমার দামামা বাজছে।

পাণ্ডুর মুখে চোখে একটা উচ্ছলতার ভাব ফুটে উঠল। বলল ঃ ভেতরে আসবে না!

ক.ক্ষর ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম ঃ সাত সকালে এসে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম ন তো? তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম। তোমার শরীর ভালো আছে তো!

পাণ্ডুই দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। উত্তর দিতে গিয়েও একটু দ্বিধায় পড়ল। জিগ্যেস করলাম ঃ মাদ্রীকে তো দেখছি না? কোথায়?

পাণ্ড. এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাদ্রীর কথা এড়িয়ে গিয়ে অভিমানী গলায় বলল ঃ এতদিন পর সময় হলো আমার কথা জানবার?

বসবার ঘরে পাণ্ডুর মুখোমুখি বসে আছি। ওর প্রশ্ন শুনে ম্লান হাসি। বললাম ঃ তোমারও তো সময় হয়নি আমাকে দেখার। কেমন আছি কী ভাবে দিন কাটছে জানতে চেষ্টা করেছ। দায়িত্ব শুধু কি আমার একার?

তোমার সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই আমার।

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রয়োজনের সম্পর্ক তো আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে সে সম্পর্ক না রাখলেও বোধ হয় চলে যায়। এখানে তোমার সব আছে। তুমি হস্তিনাপুরের রাজা, কৌরব পরিবারের সন্তান। এখানে তুমি ব্যস্ত মানুষ। তোমার আরো একজন স্ত্রী আছে। তাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ। তোমার কোন অভাব নেই। আনাদর নেই। অপ্রাপ্তি জনিত বেদনাও নেই।

পাণ্ডু উদ্বিগ্ন গলায় বলল ঃ তোমার সমস্যাটা কী বলতো?

সেই কথা বলতে সাত সকালে ঘুম থেকে তোমাকে টেনে তুলেছি। সেজন্য সত্যি দুঃখিত। তোমাকে একটা কথা আজই সামনা সামনি জানাতে ইচ্ছে হলো। আমি এখান থেকে চলে যাব।

চলে যাবে মানে?

আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি-চাইছি।

এখানে থাকলে, আর কিছুদিনের ভেতরে সত্যিই পাগল হয়ে যাব। এখানে আমি একেবারে একা হয়ে গেছি। আমাকে একা করে দেয়া হয়েছে। এই পরিবারের আমি কেউ নই। আমার কোন দায়িত্ব নেই, স্বামীর উপর পাছে দাবি করি তাই আমার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কী নিয়ে থাকব? তুমিও নিরুপায়। তাই, একা থাকাতে চাই। রাগ কর না লক্ষ্মীটী। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই। আমি তোমার জীবনে শুধু একটা বোঝা। আমি চলে গেলে তুমি আরও মুক্ত হতে পারবে। পিতৃব্যও মুক্ত মনে তোমার রাজ্য দেখাশোনায় মন দিতে পারবেন। তিনি নিঃশঙ্ক হবেন।

কেদারা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল পাণ্ডু। রাগে ও অভিমানে রক্তিম হয়ে গেল তার মুখখানা। অভিমান রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: তুমি এই কথা বলতে এ সহ আমাকে। কে বললে তুমি আমার জীবনে একটা বোঝা? বরং আমিই তোমার জীবনের বোঝা। তাই আমাকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছ।

দুদিকে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম: না গো না। তুমি কোনদিন বোঝা হওনি। কেবল তোমার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে?

প্রয়োজন! পাণ্ডু দু'চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের সুরে বলল। এটা একটা বিশ্রী শব্দ। তোমাকে আমি জিনিসপত্রের মতো প্রয়োজন মনে করিনি। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসার ফুল। অক্ষয় অব্যয়। ও ফুলের সৌরভ শেষ হবার নয়। আমিও তোমাকে স্ত্রীর সম্মান থেকে বিচ্যুত করিনি।

তুমি বুঝছ না, ব্যাপারটা আর তোমার আমার মধ্যে নেই। এখানে তুমি কেউ নও। বলতে কষ্ট হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। তবু জেনে রাখ তুমি একটা পুতুল। হাঁ পুতুল ছাড়া কিছু নও। এটা যে তোমার কত বড় অপমান তা বুঝেও বুঝছ না। কোন অধিকারে থাকব এখানে? মহিষীর সম্মান, মর্যাদা কী দিয়েছ আমাকে? প্রতিমুহূর্ত নীরব অপমানের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এভাবে আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার চেয়ে এস্থান ছেড়ে যাওয়া ঢের ভাল। মানুষের মর্যাদা, সম্মান গেলে তার আর কি থাকল? আমি শুধু একবার দেখতে চাই, আমার নিজের কাছে আমার জীবনটার কোন মূল্য আছে কিনা? তুমি আমাকে মুক্তি দাও। জলভরা চোখে কথাগুলো বহু কষ্টে-বললাম।

পাণ্ডু হঠাৎ অপ্রস্তুতবোধ করল। তার মুখে কোন কথা জোগাল না। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর গম্ভীর গলায় বলল: তুমি তো নিজের কাছে নিজের প্রয়োজনীয়তা খুঁজছ, এর মানে কিভাবে নতুন করে বেঁচে ওঠা যায়। সেই বাঁচার সঙ্গে তুমি আমাকে আর জড়াতে চাও না। তুমি বড় স্বার্থপর। আমার জীবনে তুমি আমার আশ্রয়, আমার একমাত্র অবলম্বন। একথা শুনেও তুমি চলে যাবে!

বেশ জোরাল গলায় বললাম: যাব। তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। যাবে তুমি? নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে এক অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে। যেখানে আমরা প্রতিমুহূর্ত নিজেকে অনুভব করব। আবিষ্কার করব। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে যোগাযোগ গড়ে তুলব, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার হব।

এটা তোমার নিছকই পাগলামি।

তা-হলে. আমাকে একাই একটু পাগলামি করতে দাও।

পাগলামির একটা নিষ্ঠুর রূপও আছে, রাস্তায় বসে তুমি বুক উজায় করে কাঁদ. কেউ জিগ্যেস করবে না, তুমি কাঁদছ কেন? কী তোমার দুঃখ? বরং উপহাস করবে' মজা করার জন্যে দু'চারটা পাথর ছুঁড়ে উত্যক্ত করবে, আরো কাঁদাবে। এসব খেপামি ছাড়।

আমাকে এবার সেই খেপামি একা একা করতে হবে। আমি তো বুঝেই গেছি, এখানে আমি যেমন অবাঞ্ছিত. দু'দিন বাদে তুমিও অবহেলার পাত্র হবে তেমন। গান্ধার যুবরাজ শকুনি তো নিজের রাজ্য ছেড়ে আর এমনি এমনি আসেনি। একটা কিছু করার মতলবে এসেছে। শুনেছি, পিতৃব্যের আমন্ত্রণে তিনি অন্ধ ভগ্নীপতির দেখাশোনা করতে এসেছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়নের প্রভাবমুক্ত করার জন্যে হস্তিনাপুরের গোটা প্রশাসন ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অথচ, রাজা হয়েও তুমি কিছু জান না। গলাধাক্কা খাওয়ার আগে সম্মানের সঙ্গে চলে গেলে অপমানের আত্মগ্লানিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হতে হবে না। এই রাজ্যে তুমি কত অসহায় এবং বন্ধুহীন তা জান না বলেই এমন নিশ্চিন্তে আছ। কিন্তু আমি তোমার মতো নিশ্চিন্ত নই। আত্মসম্মানজ্ঞান যার নেই সে মানুষ নয়। তার কোন প্রত্যাশা কিংবা দাবি থাকে না। কৃপা-অনুগ্রহ পেয়েই সে নিশ্চিন্ত। আঘাত, দুঃখ পাওয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই থাকে। তোমার প্রয়োজন সুখী জীবন। কীভাবে আছ, কেমন করে আছ সেটা বাইরের লোকেরা জানতে পারে না। কিন্তু এভাবে বাঁচার ভেতর কোন গৌরব নেই। আত্মসম্মান ভিক্ষে করে পাওয়ার জিনিস নয়। যার আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, সে মানুষ নয়। তার বেঁচে থাকা না থাকা সমান। আসলে এই বোধটাই তোমার হয়নি. মানুষের যা দামী. তার দাম না দিয়ে তুমি সস্তায় বিকিয়ে দিচ্ছ। তোমার এই বোকা বোকা দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে তোমার শনি প্রবেশ করছে। কিন্তু আমি অসম্মান, অবহেলা আর সইতে পারছি না। আমি জড়ও নই। আমি শুধু দেখাতে চাই. যারা তোমাকে কৃপা ও অনুগ্রহ করছে, আমাকে সইতে পারছে না, শত্রু ভাবছে, অবজ্ঞা, অবহেলা করে মর্যাদা হানি করছে, তাদের কাছে আমার জীবনটার যে কত মূল্য তা জানান দেবার জন্যেই তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি. যে মানুষের অন্যের ক্ষতি করার কিংবা দুশ্চিন্তা হওয়ার মতো ক্ষমতা নেই তাকে কেউ ভয় করে না। মানুষ বলে পাত্তা দেয় না। নিজের বাহুবল লোকবল. ব্যক্তিত্বের জোর না থাকলে বা অন্যকে ভয় পাওয়ানোর ক্ষমতা না থাকলে জীবনের বহুক্ষেত্রেই সেই মানুষের নিজের স্বাধীনতাকে একটু একটু করে বন্ধক দিতে হয় অন্যের হাতে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে গিয়ে ব্যক্তিসত্তার জোরে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করে আত্মসম্মান আদায় করে নেয়ার নাম মনুষ্যত্ব। মানুষ সেই সাহসের জন্যেই চিরদিন গর্বিত বোধ করছে। সেই সাহসটাই তুমি হারিয়ে বসেছ। আত্মসম্মান বোধের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। আমি সেই মুক্তির স্বাদ পেতে চাই। অনন্ত নীল আকাশে ডানা মেলে দেবার জন্যে আমার ভেতরটা ছটফট করছে।

শান্ত থাকতে আমি পারছি কৈ ?

পাণ্ডু জ্বালা ধরা চোখে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিপন্ন অসহায় মানুষের মতো বলল : সত্যিই আমার সাহস নেই। আমি বড় ভীতু। অনেকরকম ভয় আমার—হারানোর ভয়, হেরে যাওয়ার ভয়, রোগের ভয়, বিশ্বাসভঙ্গের ভয়। বিধাতা আমার জীবনটা কেন যে এইভাবে গড়ল, জানি না। এখন আমি কী করব? কী আমার করা উচিত? অস্থির বর্তমানের চেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভালো কী মন্দ তাও জানি না। তবে আত্মসম্মানজ্ঞান মেয়েদের প্রখর থাকে। জীবনের বাঁচার মানে তুমি নিজে যেমন আবিষ্কার করেছ সাহসের সঙ্গে তেমন করে আমি কিন্তু অনুভব করেনি। জীবনের যে ঝড় উঠেছে সেই ঝড়ে যে কোন মানুষকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে, প্রমত্ত ঝড়ের ধাক্কায় অনেক কিছুই ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে! তোমার প্রত্যাশা পূরণ নাও হতে পারে, স্বপ্ন ব্যর্থ হতে পারে। তাই বলছিলাম একটু শান্ত হও।

এক অদ্ভূত হাসিতে আমার অধর যুগল ভরে গেল। বললাম : যার জীবন যে খাতে একবার বয়ে যায়, তার পক্ষে অন্য খাতে হঠাৎ-ই তাকে বইয়ে দেবার উপায় থাকে না। নদীর ধর্মই হলো সাগরে হারিয়ে যাওয়া। নদীই হচ্ছে জীবন। আমার আর ফেরার পথ নেই।

রাগে পাণ্ডু গর গর ক'রে উঠল। বলল : তুমি স্বার্থপর। নিজেকে তুমি ভালোবাস। নিজেকে নিয়ে তোমার খুব দেমাক। নিজের সুখ, আনন্দ, গর্ব ছাড়া তুমি কিছু বোঝ না।

হাঁ, মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার নিজেকে। নিজেই সে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। সে আছে, তাই তার চারধার ঘিরে অন্যান্য সব সম্পর্ক আছে। সে সব সম্পর্ক না থাকলেও একজন মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের জন্য, আত্মসম্মানের জন্যে তারও যে কিছু করার ছিল বেশির ভাগ মানুষ সেই কথাটা ভাবে না। অন্যের ভাবাটাকে দেমাক মনে করে। আসলে জেদই মানুষকে দিয়ে সব করিয়ে নেয়। যার জেদ নেই, সে কি মানুষ?

হঠাৎ পাণ্ডুর মুখটা অপ্রতিভ দেখাল। নিজের ভাবনার মধ্যে বেহুঁশ হয়ে গেল।

পাণ্ডুর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যই তার প্রতি আমাকে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট করে তুলল। তবু এই মানুষটিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। তাকে বাদ দিয়ে তো আমার কোন আলাদা মর্যাদা কিংবা স্বীকৃতি নেই। হস্তিনাপুরে তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেছিলাম, পাণ্ডুকে ছাড়া সে পরিকল্পনার মানে হয়ও না হয়তো কোনো। জোর করে কিছু করতে চেষ্টা করা হবে হঠকারিতার সমান। তাকে সঙ্গে না পেলে কে কী রকম অবজ্ঞার চোখে তাকাবে তার দিকে কে জানে? মুখে চলে যাব বললেও আমার একার সাহস হলো না সত্যি চলে যাওয়ার। পাণ্ডু আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার অবলম্বন এবং আশ্রয়। হৃদয় ভাঙা মান-অভিমান, ক্ষোভ, রাগ, অসন্তোষ, ব্যর্থ হওয়ার জ্বালায় তীক্ষ্ণ অথচ মোলায়েম গলায় বললাম :

নরম মানুষকে সকলে কাদার মতো পায়ে মাড়িয়ে যায় অবহেলায় এবং ঘেন্নায়। তাদের পায়ে তলায় থেঁতলে যাচ্ছে তোমার অন্তঃকরণ। কিন্তু এভাবে তোমাকে অপমানিত হতে দেব না। কিন্তু আমি চাইলে কী হবে? তুমি তো আমার অনুভূতি, আশংকা, সংশয়, ভয়, সন্দেহ এসব বোঝ না। বোঝবার চেষ্টা কর। কখনও আত্মসমীক্ষা করে দেখেছ কী? মহর্ষি দ্বৈপায়নের কূটকৌশলে তুমি রাজা হয়েছ। পিতৃব্য ভীষ্মের কূটকৌশলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রাজত্ব করছ। ক্ষমতার চাবিটি পিতৃব্যের হাতে। মহর্ষি দ্বৈপায়নকে হারানোর জন্যে যে কোনদিন ঐ চাবিকাঠিটি ঘুরিয়ে সিংহাসন থেকে তোমাকে দূর কবে দেবেন। মহর্ষির কৃপাপুষ্ট ব্যক্তিব কোন স্থান নেই হস্তিনাপুরে। তারা পিতৃব্যের শত্রু। শত্রুকে নির্মূল করে পিতৃব্য দ্বৈপায়নের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক পরিচ্ছন্ন প্রশাসন চালু করতে চান, যেখানে তাঁর কতৃত্বই থাকবে শুধু। অগ্রজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পিতৃব্যের দুর্বলতা আছে। তোমার ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে গান্ধার রাজ সৌবল আমাত্যবর্গ এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের এক অঘোষিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধার স্বর্গ-রাজ্য সৃষ্টি করেছেন। যতরকম সুখ-সুবিধে পাওয়া সম্ভব সবই তারা পাচ্ছে। তোমার দিক থেকে তারা ধীবে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে চলে যাচ্ছে। তোমারও দিন ফুরিয়ে আসছে। গদি ছাড়বার জন্যে-প্রস্তুত হও।

পাণ্ডুর ভুরু কুচকে গেল। বিষাদে মুখখানা, থম থম করছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: আমায় তুমি অবাক করলে রাণী। অথচ, এরাজ্যের রাজা হিসাবে আমার কোন ভূমিকা নেই। রোগে রোগে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছি। আমার না থাকলেও চলে।

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি: জীবন সম্পর্কে যারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। তাদের কাছে সব কিছুই, এমন কি নিজেকেও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু আত্মসমর্পণ করবে কেন? নিজের সম্মান ও মর্যাদাকে কোনরকম আঘাত না করে প্রতিপক্ষের অস্ত্র ব্যবহারেব সুযোগ না দিয়ে তার হাতের অস্ত্র কেড়ে নাও। একটা অছিলা করে রাজা থাকতে থাকতে হস্তিনাপুর ছেড়ে চল। রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সফর করে বেড়াও। তাতে রাজার খাতির, যত্ন, মর্যাদা যেমন পাবে, তাদের মনোভাবও বুঝতে চেষ্টা করবে। হস্তিনাপুরের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কর। পিতৃব্যের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ জেহাদ ঘোষণাও করা হবে তাতে। তুমি যে দুর্বল নও, কৃপা কিংবা অনুগ্রহ দেখানোর মানুয নও, করুণা অথবা অবহেলার পাত্র নও—এটা জানান দেবার জন্যে তো গর্ববোধ করতে পারবে। সেটা কি জীবনের কম পাওয়া?

পাণ্ডু কথা বলতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল কবে অবাক মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে থাকে, মাথা নাড়ে। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল: তোমার মতো এমন গভীর করে তলিয়ে দেখিনি কখনো। আমাকে ক্ষমতায় বসিয়ে লুকিয়ে যা হচ্ছে তাতে সত্যি আমার গৌরব নেই। আছে অপমান। রাজার গৌরব এবং মর্যাদা বাঁচানোর জন্যে তোমার পথই বাঁচার পথ।

মহদেশ এবং রাজ্য ঘুরে হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন করতে আমাদের বৎসরকাল লেগে গেল। এই সময়ের মধ্যে রাজধানীতে এক রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গেল নিঃশব্দে এবং বিনা রক্তপাতে। পাণ্ডুর অনুপস্থিতে অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র রাজকার্য চালাচ্ছিল। কিন্তু পাণ্ডু ফিরে এলে সে রাজ্য আর ফিরিয়ে দিল না তাকে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করতে সপরিবারে পাণ্ডুকে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের পরোয়ানা জারি করল।

এরকম কিছু ঘটবে আমি জানতাম। পাণ্ডুর মনও তৈরী করেছিলাম খুব সংগোপনে। পাণ্ডুও জানতো তার অনুপস্থিতির সময়ে পিতৃব্য ভীষ্ম এবং মহর্ষি দ্বৈপায়নের কৌশলগত বিবাদ এবং ক্ষমতা লড়াইর উপর একটা যবনিকা পড়বে। এই যবনিকা হস্তিনাপুরে থাকলেও আটকানো যেত না। এতে শুধু রেষারেষি এবং তিক্ততাকে অতিক্রম করা গেল। বাইরের লোকও টের পেল না রাজনৈতিক পালাবদলের ঠাণ্ডা লড়াইর উত্তাপ। এতকাল যে লড়াইর সূত্রপাত হয়েছিল কৌরব পরিবারের অভ্যন্তরে, হস্তিনাপুরে চৌহদ্দীতে, ভীষ্মের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভেতরে সে দ্বন্দ্বের কৌশলগত লড়াই এবার হস্তিনাপুরের বাইরে লালিত হতে লাগল। মাটির ভেতর গাছ যেমন নিঃশব্দে শিকড় চালিয়ে দিয়ে রস শোষণ করে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে তেমনি পিতৃব্যের সঙ্গে মহর্ষির সংঘাতের সূক্ষ্ম শিকড় কৌরব বংশের দুর্বলতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চাড়িয়ে গেল। আর আমি হয়ে গেলাম তাঁদের বিবাদের ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু। সেদিনই বুঝেছিলাম সত্যিই আমি ইতিহাস হতে চলেছি। হয়তো একদিন আমাকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তির সৃষ্টি হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে আমি থাকব চিরকাল।

আমি খুব অসাধারণ মহিলা নই। আমার মনে ব্যর্থতার কোন খেদ নেই। আমি যা করেছি, আমার মতো সাধারণ একটি মহিলার পক্ষে তা খুব একটা সামান্য নয়। ইতিহাস আমার কি বিচার করবে তা কেবল ভবিষ্যতই জানে। তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বেঁচে ওঠার জন্যে, হারানো অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্যে, নিজের গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্যে, একজন সত্যকারের সংগ্রামী মানুষের যোগ্য সন্তানের উত্তরাধিকারী অর্জনের জন্যে একজন মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করেছি। কোন মূল্যবোধের কাছে কোন সময়ে

নিজেকে বন্ধক দেইনি। নদীর মতো এক খাদ থেকে আর এক খাদে বয়ে গেছি অনন্ত উৎসারে।

আমার সমস্ত সুবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছি, বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে পাণ্ডুর মতো এক অযোগ্যের হাতে পড়েছি। বিধাতা হয়তো আমাকে তাঁর যোগ্য সন্তান হয়ে উঠার জন্যেই এই বন্দোবস্ত করেছেন। বিধাতা একজন পুরুষের মতো আমাকেও কম করে কিছু দেন নি। সব রকম ভালোমন্দ সুখ দুঃখ বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে গিয়ে প্রমাণ করতে হয় নিজের কৃতিত্বকে। সে জন্যে আমার বড় চিন্তা হতো।

রাজনীতির রাহু আমার স্বপ্ন চন্দ্রমাকে গ্রাস করতে উদ্যত। আমার সাধ্য কি আটকাই তাকে? মুখ বুজে যেমন হেরেছি, অপমানও সয়েছি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকে ছোট করেছি, দশের চোখেও ছোট হয়ে গেছি। স্বার্থের তাপে আমার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। আমার বুকে স্বাতন্ত্র থাকার আগুন জ্বলছে। যে কোন মূল্যে নিজেকে রক্ষা করতে চাওয়ার ভেতর কোন দোষ নেই। মেয়ে মানুষ হওয়াও কোন অপরাধ নয়। বরং একজন উদ্যোগী পুরুষের চেয়ে একজন নারীর সফল হওয়ার সুযোগ বেশি। পুরুষ যেখানে পৌঁছতে পারে না, নারী সহজেই সেখানে পৌঁছে যায়। পুরুষকে সবটাই নিজের উদ্যোগে করতে হয়, কিন্তু নারীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোই আছে। কেবল তার নেবার অপেক্ষায়। সেটা নারীর সুবিধা এবং অসুবিধা। নারী বলেই তাকে দয়া করছে। অনুগ্রহ দেখাচ্ছে। এই বোধে নারীর অন্তর নিজের অজ্ঞাতেই হাঁফিয়ে উঠে। নিদারুন আত্মকলহে সে মনোকষ্ট পায়। সাহায্যে তার সাফল্যের গৌরব দীপ্তি ও তৃপ্তি কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তেমনি সব সময়ের ভয় কখন পা পিছলে সাহায্যের নোংরা জলে পড়ে যায়।

এ রকম একটা আত্মকলহের মধ্যেই অনুভব করলাম, বড় বটগাছ না চাইতেই ক্লান্ত পথিককে আশ্রয় এবং ছায়া দেয়। সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবনটা অনেকটা বিরাট বটগাছের ছায়ার নীচে বসে থাকার মতোই। বটগাছ ক্লান্ত পথিককে নিজের চেয়ে অনেক ছোট ভাবে, কিন্তু পথিকের মনে একবারও সে কথা উদয় হয় না। বরং মনে হয় এই ছায়া ও আশ্রয়ই বটগাছের কাছে তার একান্ত প্রত্যাশা। এটাই বটগাছের তার প্রতি কর্তব্য। তেমনি এক অবিচল কর্তব্য ও দায়িত্বসূত্রে পুরুষও নারীর পাশে অযাচিত ভাবে দাঁড়ায় সেবকের মতো, বন্ধুর মতো রক্ষকের মতো। পুরুষের এই প্রবণতা তার প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুতরাং, তাকে বিকৃত করে কেউ যদি ব্যক্তিগত জীবনের আস্বাদ নষ্ট করে দেয় তা হলেই সর্বনাশ।

আমি অনেক ভেবেছি, পিতৃব্য ভীষ্ম এবং মহর্ষি দ্বৈপায়নের কথা। বুঝতে চেষ্টা করেছি, উভয়ের ঝগড়ার ভেতরে কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেই মিলটা গভীর এবং অপ্রকাশ্য। খোলাখুলি ভাবে কেউ কিছু আমাকে জানাচ্ছেন না। তবে তাঁদের ঝগড়া আমাকে নিয়ে। আমার মধ্যে তাঁর দুজন কী দেখছেন কে জানে? ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরেছি, দুজনের কাছেই আমার একটা প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা অভিন্ন বলেই মনে হয়েছে। তবু দুজনের

মনোভাব সহযোগীর নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর। কেন? এই প্রশ্নটা আমার চিত্তকে আলোড়িত করেছে। বার বার মনে হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা উৎস তো থাকা দরকার। কিন্তু তার শিকড় কোথায়?

এরকম একটা প্রশ্ন চিহ্নের সামনে যখন থমকে দাঁড়িয়েছি, পাণ্ডু রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিদুরের সঙ্গে কক্ষে ঢুকল। বিদুরকে দেখেই মনটা খুশিতে ভরে গেল। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। কপট রাগ দেখিয়ে বললাম: তবু ভালো মনে পড়ল। আজকাল তো ভুলেই গেছ। উনি বোধ হয় জবরদস্তি করে ধরে এনেছেন তোমাকে, নইলে আসাই হতো না আর। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, অধমের সঙ্গে কে আর সম্পর্ক রাখতে চায় বল?

বিদুরের দু চোখে খুশির প্লাবন। মৃদু হেসে বলল: আচ্ছা, তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?

ঝগড়া করাটাকে সম্পর্কহীনতা বলে ভাবছ কেন? ঝগড়া সুস্থতার লক্ষণ। একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে অভিমানে, ভালোবাসায় কিংবা অধিকারে—এর মধ্যেও এক ধরণের রম্যতা আছে।

পাণ্ডু উষ্মা প্রকাশ করে বলল: কথা কাটাকাটি করার সময় নয় এখন। আমার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছে হস্তিনাপুর ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পিতৃব্যের সামনে অগ্রজ কথাগুলো বলল অথচ, তিনি প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর নীরব অনুমোদন পেয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্র। বিনা রক্তপাতে সিংহাসনের হাত বদল হয়ে গেল।

বিদুর বলল: এভাবেই ভারতবর্ষের মতো একটা বিরাট দেশও হাত বদল হয়ে গেছে একদিন। এ দেশের সরল, নিরীহ, আদিম অধিবাসীদের কি বহিরাগত আর্যেরা কূটযুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে গোটা উত্তরাঞ্চলকে আর্যাবর্ত করে নেয়নি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে? সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। নিজের শক্তির উপর শক্ত হয়ে যে দাঁড়াতে শেখেনি তাকে তো তার মাশুল দিতে হবে। একটা পরগাছাও আশ্রিত গাছের শাখাকে শুধু আঁকড়ে ধরে না, কাণ্ডের অভ্যন্তরে শিকড় চাড়িয়ে দিয়ে তার থেকে রস শোষণ করে বেঁচে থাকে, তেমনি করে একজন দুর্বল মানুষও অস্তিত্বের জন্যে তৃতীয় কোন শক্তির কাছে আত্ম সমর্পণ করে আদায় করে নিতে পারে তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।

বিদুরের সুচতুর কূট ভাষণ বুঝে নিতে বিলম্ব হলো না। ওর দুটি চোখের উপর আমার নিরীহ দুটি চোখ মেলে ধরে সকৌতুকে বলি: ঠিকই তো। একজন মানুষ যতক্ষণ নিজের কাছে হেরে না যাচ্ছে ততক্ষণ কেউ তাকে হারাতে পারে না। নিজের কাছে হেরে যাওয়াটাই মানুষের বড় হার। কিন্তু সংঘর্ষের আগেই তুমি তার কাছে হেরে বসে আছ। তোমাকে যদি হারতেই হয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে হারবে কেন? তাকে হারনোর জন্যে অনন্তকাল যদি অপেক্ষা করতে হয় আমাদের, তাই করব। তার শঠতা, কপটতার জবাব আমরা মিথ্যে ছলনা এবং কপটতা করেই দেব।

পাণ্ডু এবং বিদুর বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাণ্ডু আস্তে আস্তে বলল সত্যিই আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছি। আর তুমি কী অসাধারণ তৎপরতার সঙ্গে সব কিছু চটপট জেনে ফেলেছ, বুঝে নিয়েছ। বিদুর ঠিকই বলে, তুমি বাইরে খুব শান্ত, শিষ্ট নিরীহ, কিন্তু তোমার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ম মানুষ।

বিদুরের চোখের কোনে নীরব হাসির ঝিলিক দিল। আর তাতেই আমার ভেতরটা ভীষণ চমকে গেল। বিব্রত গলায় বললাম: দেবরের পাগলামিতে কান দিও না। আমাকে অপদস্থ করার জন্যে ওরকম অনেক কথা বানিয়ে বলে। কী আনন্দ পায় কে জানে?

অবিশ্বাসভরা চোখে পাণ্ডু আমায় চোখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল: বিদুর ছাড়া এই বিশ্ব দুনিয়ায় তোমার সুখের, আনন্দের আর কে ভাগীদার আছে? আমি তো অপদার্থ। কখনো সুখ আনন্দ দিতে পারেনি। তোমার জীবনে আমি রাহুর মতো এক দুষ্ট গ্রহ।

অসহিষ্ণু ক্রোধে বিরক্তিতে পাণ্ডুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললাম: ধান ভানতে শিবের গাজন সুরু হলো। ধেনো হাটে বুনো ওল নিয়ে বসলে। আশ্চর্য মানুষ বটে! কথা হচ্ছিল, নির্বাসন অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়েছে আমাদের। অন্তঃপুরের চৌহদ্দীতে বসে যে কাজ করা কঠিন সে কাজটা চোখের বাইরে গিয়ে করাটা সহজ।

তোমার এ রকম অদ্ভুত আনন্দের অর্থ বুঝি না।

স্বামী, প্রতিশোধ নেবে না?

নিতে চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? আমার মতো অকর্মন্য মানুষকে সাহায্য করার মানুষ কোথায়? সব মানুষই স্বার্থপর। আমার কাছে তার পাওয়ার যদি কিছু না থাকে তাহলে মিছিমিছি আমাকে সাহায্য করতে চাইবে কেন? তাকে কি দিতে পারি আমি? যে লোভে আমার জন্যে সব উৎসর্গ করতে রাজি হবে? নিঃসম্বল, অসহায় মানুষের বন্ধু কেউ হতে চায় না। তাকে একা একা চলতে হয়। আমার সন্তানও নেই যে, তার কাছে প্রত্যাশা করব।

একথায় হঠাৎ একটু দিশেহারা বোধ করে চুপ করে থাকি। তারপর ধীরে ধীরে বলি: তা আমি জানি। কিন্তু সন্তানহীনতা কৌরব পরিবারের কোন সমস্যা নয়। এ সংকট তো কয়েক পুরুষ ধরে চলেছে হস্তিনাপুরে। কার্যত মহারাজ শান্তনুর পর কারো ধমনীতে অবিমিশ্র কৌরব বংশের রক্ত নেই। তোমরা ক্ষেত্রজ পুত্র বলে অচ্ছুৎ হয়ে যাওনি। তুমি আমি এবং দেবর বিদুর চাইলে এক অসম্ভব প্রত্যাশা হয়তো পূরণ করা যায়। কৌরব বংশের সমান্তরাল এক নতুন বংশই পারে আমাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে। এই তৃতীয় শক্তিই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আদায় করে নেবে হৃতগৌরব ও মর্যাদা। তাই বলছিলাম. নির্বাসনে গিয়ে আমরা কিছুই হারাব না। হারাতে পারি না। কূট কৌশলে হস্তিনাপুর থেকে আমাদের যেভাবে উৎখাত করা হলো কূট বুদ্ধিতে সেভাবেই হৃতক্ষমতা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারি।

পাণ্ডু একথায় হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকে। তারপর

একবার আমার দিকে আর একবার বিদুরের দিকে তাকাল। কী যেন বলি বলি করে সামলে নিয়ে বলল ঃ রুগ্ন বলেই অগ্রজ অনায়াসে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। এখন আমি একলা। আমার অনুগতদের সে কিনে নিয়েছে। এতবড় একটা বেইজ্জত হওয়ার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোলা যায় কখনও? কিন্তু আমার মতো রুগ্ন অসহায় মানুষ কী বা করতে পারে? অর্থহীন প্রতিশোধ গ্রহণের স্বপ্ন দেখি। কত সময় মনে হয়েছে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে আমার অসহায় একাকীত্ব দূর করি। স্ত্রীদের কাছে স্বার্থপরের মতো এ প্রস্তাব করতে সাহস হয়নি। অপদার্থ, রুগ্ন স্বামীর জন্যে আর কত অপমান সইবে?

পাণ্ডু একটু হাসল। ম্লান হলেও হাসিটা তার বুক থেকে উঠে এল। কৃত্রিম নয়। মাথা নেড়ে বলল ঃ তবু তোমাকে আমার অপমানের কথা গভীরভাবে ভাবতে দেখে এবং তার একটা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের কথা বলতে শুনে কী আনন্দই না হয়েছে আমার। আজ আমার আনন্দের দিন। বুক থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। তোমরা কৃপা করলে আমি বাবা হতে পারি। পৃথা কুন্তী আমার ঐকান্তিক বাসনা পূরণ করতে তোমার পছন্দ করা যে কোন ব্যক্তিকে পুত্রোৎপাদনের জন্য আহ্বান করতে পার। এমন কি বিদুরকেও।

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে ফেলে পাণ্ডু বিদুরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বিদুর লজ্জায় মাথা হেঁট করল। তৎক্ষণাৎ দুচোখ বুজে আমি স্থির হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তার চোখ মেলে পাণ্ডুর দিকে তাকালাম। তার চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। বলল ঃ যারা ব্যতিক্রম হয়, তারা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে সৎ হয় খুব! তাদের লুকোবার কিছু থাকে না। অনাবিল চোখ, খোলা হাওয়ার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জীবনের ঘ্রান নেয়, জীবনকে ভালোবাসে। তোমাকে দেবার কিছু নেই। কিন্তু আমাকে ধন্য করার মতো অনেক কিছু করার আছে তোমার। জন্ম দিলেও যেমন সন্তানের জনক হওয়া যায় না, তেমনি সন্তান উৎপাদন না করেও একজন ভালো জনক হওয়া যায়। এতে তো তোমার সংকোচের কিছু নেই, শাস্ত্র মতে তারা তো আমারই সন্তান। আমার ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের দেহ ধারণ করে তারা তোমার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হবে। এক প্রাণ থেকে আর এক আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশগতি। আমি রইলাম না। কিন্তু আমার স্বপ্নের বাসনা, কামনার অম্লান শিখা তো রয়ে গেল। বলতে বলতে একটা গভীর শ্বাস পড়ল পাণ্ডুর। বুকের ভিতর থেকে এষণাটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

আমারও বুকটা কেমন হাহাকার করে উঠল বসুসেনের (কর্ণের) জন্যে। অনেককাল পরে ভুলে থাকা ব্যথা থেকে রক্তক্ষরণ হলো। এক মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল আমার ভেতরটা। বসুসেন আমার ছেলে! অনুভূতির ভেতর কী যেন ঢেউ দিয়ে গেল। এতদিনে তাকে নিশ্চয়ই দেখতে সুন্দর হয়েছে। এই বসুসেন যখন পেটে ছিল তখন স্বপ্নে কল্পনা করেছি, হাঁটতে শিখলে মা বলে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। খুব অভিমান হলে কোমর জড়িয়ে ধরে দুপায়ের

মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলবে ; তুমি ভীষন খারাপ। তোমার সঙ্গে আড়ি, তুমি একটুও ভালো না। মিছিমিছি আমাকে কষ্ট দাও ? আমি তোমার কী করেছি ?

কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে কী সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। সেই গভীর অজানা অনাস্বাদিত বোধ আমার বুকে যে বিশ্বাসঘাতকের মতো লুকিয়ে ছিল তা কখনও জানি নে। হঠাৎ করে সংস্রছাত ছুরি মারল আমার বুকে। আর এক গভীর অপত্যস্নেহ হঠাৎ উৎসারিত ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। মনে হলো, বসুসেনকে আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদরে সোহাগে ডুবিয়ে দিয়ে বলছি ঃ ভাব, ভাব, ভাব। অমনি থর থর করে কেঁপে গেল ভেতরটা। স্বপ্ন সত্য হলো না। কল্পনার বসুসেন দৌড়ে কোনদিন আসবে না। এলে হয়তো অন্যরকম লাগত।

বসুসেনের কথা মনে হলে মনের মধ্যে ঝড় উঠে। পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধেই তখন বড় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি। নিজের উপরেও প্রচণ্ড রাগ হয়। বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি নিজেই এই সরল নিষ্পাপ শিশুর চরম সর্বনাশ করেছি। আমার রক্তে রয়েছে সর্বনাশের বীজ। সেই অভিশপ্ত রক্ত বীজই সঞ্জীবিত হয়ে গেছে বসুসেনের মধ্যে। আতঙ্কে, ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। বড় ব্যাথা হৃদয় জুড়ে। হঠাৎই দুঃখ ঝাপসা হয়ে এল। মুখের ভাবও বদলে গেল।

পাণ্ডু আমার চোখের উপর চোখ রেখে বলল তোমার চোখে জল তুমি কাঁদছ ?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি ঃ কাঁদব কেন ? চোখে জল এমনি এসে যায়। অন্যদিকে মুখ ঘোরাই। বলতে ইচ্ছে করল ঃ তুমি তো জান না, এ জীবনে আমি কী হারালাম। সন্তান থেকেও আমি সন্তানহীনা। আমার মতো দুঃখী কে আছে ? বসুসেনের জন্যে খুব দুঃখ্য হয়। মন খারাপ করে। তার কথা খুব মনে হয়। কিন্তু কোন মুখে পাণ্ডুকে তার কথা বলব ? সংকোচে, স্বন্দে বুকটা তোলপাড় করতে লাগল। কতবার মনে হলো পাণ্ডুর পিতামহী সত্যবতী কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে দিয়ে কৌরববংশকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করলেন, তেমনি আমার কানীন পুত্র বসুসেনকে দিয়ে পাণ্ডুর সন্তান সংকটের বাধা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারি। আমিও হারানো সন্তান ফিরে পাই তা-হলে। শূন্য বুকটাও ভরে উঠে। কিন্তু অবৈধ মাতৃত্বকে নিজের মুখে কবুল করি কেমন করে ?

অন্তর্দ্বন্দে ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। যে অধিকারে মহর্ষি দ্বৈপায়নের ঔরসজাত সন্তানেরা কৌরববংশের উত্তরাধিকারী এবং কৌরব বলে পরিচিত। আমার কানীন পুত্র বসুসেনও মায়ের পরিচয়ে পাণ্ডব এবং কৌরব। কারণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর ধমনীতে কৌরববংশের রক্ত নেই, তারা এবংশের কেউ না। কৌরব বধূদের গর্ভে জন্ম বলে তারা কৌরব। তেমনি আমিও কৌরব বধূ। আমার গর্ভের সন্তান বলে বসুসেন যদি কৌরব নাও হয় পাণ্ডুর পুত্র তো। কিন্তু শাস্ত্রমতে কানীন পুত্রও স্বামীর পুত্র বলে গণ্য হয়। সত্যবতী দ্বৈপায়নকে পুত্র বলে যেমন কৌরববংশের মধ্যে টেনে আনল তেমনি আমিও পুত্রের দাবিতে

পাণ্ডুরসিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব দাবি করতে পারতাম। কিন্তু সেই দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। ভয়ে, লজ্জায়-সংকোচে পাণ্ডুকে সত্য কথা বলা হয়নি। স্বার্থের কোলাহলের মধ্যে আমি ছোট হতে পারি, কিন্তু বসুসেনকে ছোট করব কী করে? তার দোষ কী? মা হয়ে তার জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে পারি?

স্বাপরের মতো নিজের নিরাপত্তা এবং লাভের কথা বেশি ভেবেছি। সত্যবতীর সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না। আমার ও তাঁর দেশ, কাল, পাত্র এবং পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সত্যবতী নিজের রাজ্যে এবং অন্তঃপুরে ছিলেন একেশ্বরী। তাঁর সামনে পেছনে কোন বিরোধ বাধা ছিল না। অবৈধ মাতৃত্ব নিয়ে তাঁকে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। লোকলজ্জা তাঁকে বিদ্ধ করেনি। কোন অবিশ্বাস, সন্দেহ তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়নি। তিনি ছিলেন মুক্ত আর আমি নানাভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ। চারপাশে আমার শত্রু। সহস্র সন্ধানী চোখ আমাকে পাহারা দিচ্ছে। নিজেকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত আমি। এক মুহূর্তের জন্যে নিজেকে মুক্ত এবং স্বাধীন মনে হয় না। যে পিতৃব্য সত্যবতীর দক্ষিণহস্ত তিনি একটুও বোঝেন না আমাকে। তাঁর জন্যেই আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল।

পাণ্ডু বড় বড় চোখ মেলে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে আমাকে দেখছিল। ধীরে ধীরে সে চাহনি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল। সেই অসহনীয় দৃষ্টির সামনে আমি কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। মনে হলো, আমি তার কাছে ধরা পড়ে গেছি। লজ্জা পাওয়ার আগে বললাম ঃ স্বামী তুমি কি পুত্র চাও?

জ্যামুক্ত ধনুকের মতো পাণ্ডু উল্লসিত হয়ে বলল ঃ ভীষণভাবে চাই। এটা কি প্রশ্ন করে জেনে নেবার মতো কথা। দয়া যখন হয়েছে, তখন করুণা কর রাণী।

কথা বলার সময় ভুরু কুঁচকে গেল। দয়া বলছ কেন? স্ত্রীর কাছে প্রত্যেক স্বামীর দাবি এটা। একমাত্র অভিলাষ।

হাঁ, অভিলাষ। একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই, সব মানুষই সন্তানের মধ্যে তার প্রত্যাশার জগৎকে দেখে। তোমার গর্ভের সন্তান প্রত্যাশার পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে দেবে আমায়। পারবে না পৃথা কুন্তী?

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের সঠিক ব্যক্তিটি নিয়োগের জন্যে অনেক কিছু বিচার বিবেচনা অবশ্যক হয়। আমাদের ঘৃণা, বিদ্বেষের প্রতিশোধ শুধু নয়, হস্তিনাপুরের রাজা-সিংহাসনের উপর তোমার দাবি ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সহায়ক ব্যক্তিকে আমরা চাই। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া তো এক নয়। আমরা রাজ্যচ্যুত, নির্বাসিত। আমাদের সহায় নেই, সম্বল নেই, বন্ধু নেই, লোকবল, ধনবল বাহুবল কিছুই নেই। তাই আমাদের এমন মানুষের সহায়তা দরকাব যে হস্তিনাপুরের প্রশাসনেব ভেতরে থেকে সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। সে সাহায্য স্বার্থহীন দানে পরিপূর্ণ না হলে কোন লাভ হবে না। এমন ব্যক্তি অন্বেষণ করতে হবে যাকে হস্তিনাপুর সকল লোকে মান্য করে, তাব বিশেষ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থাকবে। তাকে চতুর, বুদ্ধিমান, কূটকৌশলী এবং বিশ্বস্ত হতে হবে। হস্তিনাপুরের উপর তার নিজের রাগ শুধু থাকবে না, সংগুপ্ত বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রতিহিংসায় উন্মুখ হয়ে সেও সুযোগের অপেক্ষা করছে। একমাত্র এরকম ব্যক্তি পেলেই আমি তাকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্যে বরণ করতে পারি।

পাণ্ডু একাগ্রচিত্তে ভেবে বলল : বিদুর ছাড়া এরকম ব্যক্তি হস্তিনাপুরে আর কেউ আছে কি-না জানা নেই।

কপট গাম্ভীর্য প্রদর্শন করে বললাম : তাহলে বিদুরকেই তোমার পছন্দ। শাস্ত্রেও আছে দেবরকে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত করা কিংবা বরণ করা অনাচার কিংবা গর্হিত কর্ম নয়।

পাণ্ডু সহসা উৎফুল্ল হয়ে বলল : প্রীত হলাম পৃথা কুন্তী।

সেদিন আচমকা বিদুরের কথাটা তুমি বলার পরে আমিও ভেবেছি, বিদুর সহায় হলে একদিন হস্তিনাপুর আমরা ফিরবই। হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে সে আমাদের লক্ষ্য জয়ের সহযোগী হয়ে কাজ করবে। আমাদের জন্যে যদি কিছু নাও করে, তার পুত্রদের জন্যে তো নিঃস্বার্থভাবে করবে। একজন পিতা যেমন তার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে ভরে রাখে, সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে তাকে আগলায়, তাকে জীবনে স্বমর্যাদায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা করে থাকে বিদুরও তাই করবে, এ আমি তোমায় বলে রাখলুম। পুত্রদের পিতৃপরিচয়ে তার নাম নাই বা থাকল, কিন্তু সে তো জানে, পুত্ররোত্ত জানবে বিদুরই তাদের পিতা। তার প্রাণের অম্লান শিখা তো রয়ে গেছে তাদের ভেতর। তার রক্তের ধারা তো বইছে তাদের ধমনীতে। দেখা হলেই দুটি রক্তস্রোত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবে।

আর কথা নয়, বিদুরকেই বরণ কর।

স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বুক থেকে অপরাধবোধের একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। বড় পবিত্র লাগল। একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল : বাঁচালে আমায়।

পাণ্ডুর দু'চোখে সহসা কেমন একটা সন্দেহে নিবিড় হলো। কী গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে অপলক চেয়ে আছি ওর মুখের উপর। সাহস করে জিগ্যেস করতে

পারলাম না ঃ অমন করে দেখছ কী? আমাকে দেখার আছে কী? সন্তান এলে সব নারীর শরীরেই কতরকমের রূপান্তর হয়। তুমি তো আর মেয়ে নও জানবে কেমন করে?

সন্ধানী চোখ দিয়ে পান্ডু কী দেখল কে জানে? বিবন্ন মন নিয়ে আর্ত গলায় বলল ঃ তোমার মনের কষ্ট, যন্ত্রণা আমি বুঝি। তোমার কাছে স্বামীর পরিচয় ছাড়া আর কিছু দাবি করার নেই আমার। আমার মতো হতভাগ্য কে আছে? ভাগ্য আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করল। ভাবতে কষ্ট হয়, তোমার কাছে আমার কোন দাম নেই। কী করব বলো? ভাগ্যের উপরে তো কারো হাত নেই। এক টুকরো দিয়ে আর এক টুকরো যদি পাই, তাই বা কম কিসে? সে টুকরোর ভেতর নাই বা থাকলাম আমি। কিন্তু তুমি আছ, আমার প্রেম আছে। সন্তানদের সমস্ত আত্মপরিচয়ের ভেতর আমি আছি। ভীষণভাবে আছি এবং থাকব। আমার দেহ মন আত্মা থেকে তারা জাত না হলেও তারা তো আমার নামের দীপ থেকে তো আত্মপরিচয় এবং বংশপরিচয়ের দীপ জেবলে নেবে। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের দীপ জ্বেলে নেয়ার নাম তো বংশগতি। তোমার মধ্যে দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। এক কম আনন্দ!

আমার সামনে দাউ দাউ করে অরণ্য জবলছে। মৃত্যু পরোয়ানা হাতে করে অন্তিম সময় গুণছে। যে কোন মুহূর্তে প্রলয় অগ্নি নদী টপকে আমার দিকে ধেয়ে আসতে পারে। অথচ, আমি একটুও বিচলিত নই। সত্যকে অকপটে স্বীকার করার জন্যে আমার সমস্ত মন প্রাণ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অতীতকে। অনেককাল আগের ঘটনা। তবু অতীতের সব কিছু খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল।

সে এক আশ্চর্য রাত। হয়তো মাঝরাত হবে। মাঝরাতের বোধ হয় একটা আশ্চর্য যাদু আছে। বিশেষ করে বসন্তকালের মাঝরাতে। আকাশে তারাগুলো মিটমিট করে জবলছে। অন্ধকারে গাছগুলো সব ভুতুরে চেহারা নিয়েছে। কোথাও কুয়াশা নেই। জোনাক পোকাগুলো চুমকীর মতো অন্ধকারে জবলছিল নিভছিল।

স্বপ্নে দেখলাম গান্ধারী দমকা বাতাসের মতো এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘুমের মধ্যে আমি চমকে তার দিকে তাকালাম। দুচোখে তার আগুন।

মুখখানা রাগে গনগন করছে। কথা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে গেল। বলল ঃ অন্যদের চোখ ফাঁকি দিলেও আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমার পেটে কার সন্তান? তোমার একটু লজ্জা করল না।

স্বপ্নে গান্ধারীর উত্তেজনা দেখে আমি খুব হাসছি। কৌতুক করে বললাম ঃ তোমায় ঈর্ষা হচ্ছে? কী করব বল, এসব তো আর জানিয়ে আসে না, হঠাৎ হয়ে যায়।

গান্ধারী আমার কথা শুনে রাগে ঘেন্নায় জ্বলে উঠল। ধিক্কার দিয়ে বলল ঃ ছিঃ! বলতে তোমায় লজ্জা করল না?

নির্বিকারভাবে তার প্রশ্নের জবাবে সকৌতুকে বললাম ঃ লজ্জা করবে কেন? লজ্জা করলে তো আর মা হওয়া যায় না। বংশরক্ষাও হয় না।

গান্ধারী তার ঘেন্না উজার করে বলল ঃ লজ্জা! কীলজ্জা!

থমথমে গম্ভীর গলায় উত্তর দিলাম—তোমরা কি আমার লজ্জায় মুখ রেখেছ যে লজ্জা পাব? আমি যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি। বাঁচবার জন্যে করেছি। সবাই একটা অবলম্বন চায়। সারাজীবন কী নিয়ে কাটাব?

আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেহায়ার মতো এমন করে কবুল করতে একটু সরম লাগল না।

কেন?

লোকে বলবে কি? রাজপরিবারের একটা মর্যাদা তো আছে।

আছে বুঝি?

কেন, সন্দেহ হচ্ছে?

অবাক হচ্ছি। সত্যি কথা বললে বাইরের লোকে কী বলবে বল তো। বাড়ীর বউ হয়ে সে সব কথা সকলের কাছে কি বলা যায়? কারণ, এতো আমার শ্বশুর কুলের ব্যাপার। তাঁদের কুলের পুত্রবধূ হয়ে কি তাঁদের নামে নিন্দে করতে পারি? তাঁদের নামে নিন্দে করতেও নেই যেমন, শুনতেও নেই।

গান্ধারী রাগে গজর গজর করতে বেরিয়ে যাচ্ছে আর এক মনে বলে যাচ্ছে—আমার শত্রু। পথের কাঁটা। আমার ছেলেকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার দুষ্টবুদ্ধি। কিন্তু আমি বলে রাখছি সব ভেস্তে যাবে।

গান্ধারীকে তাতানোর জন্য আর হতাশ করার জন্যে চেঁচিয়ে বললাম ঃ তুমি ভেস্তে দেবার কে? স্বামীর ইচ্ছে মেটাতে তার বংশ রক্ষা করতে আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি শুধু তাই করেছি। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? অন্যায় যদি কেউ করে থাকে সে তো তোমরাই করছ।

গান্ধারী থমকে দাঁড়াল কিছু বলবে বলে। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রমত্ত ঝড়ের মতো বলতে লাগলাম ঃ আমার শান্তি সৌভাগ্য কেড়ে নিয়ে ভেবেছ তোমরা সব একা ভোগ করবে। মেয়ে বলে আমাকে তুচ্ছ করারও কিছু নেই। প্রয়োজনে আমি বিদ্রোহ করতে পারি, আঘাত হানতে পারি। স্বপ্ন ভেঙে খান খান করতে পারি। সহসা গলার স্বরটা বদলে গেল বিতৃষ্ণায়। বললাম—অমন প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকার তো কিছু নেই। আমি কেমন

করে ভুলব তোমরা আমাকে গৃহছাড়া করলে, রুগ্ন স্বামীর সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে সিংহাসনচ্যুত করলে। রাজ্যে থেকে বিতাড়িত করে নিষ্কণ্টক হতে চাইলে। তোমরা কী ভেবেছ মুখ বুজে আমি সহ্য করব? কক্ষনো না। না-আ-আ।

ঘুমের ভেতর বিকট গলায় চিৎকার করে জেগে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসি। ঘরটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। গান্ধারী কোথাও নেই। খোলা জানালা দিয়ে ফাল্গুনের হিমশীতল ফুরফুরে হাওয়া বনফুলের গন্ধ নিয়ে ঘরে ঢুকছে। থমধরা বিষণ্ণতা, অবসাদ, ক্লান্তিতেও চোখের পাতা দুটো অতিকষ্টে খুলে রেখেছি। আর ঘুম আসছে না। কিন্তু অদ্ভুত স্বপ্নটা বুকে গেঁথে থাকল।

কিন্তু এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম কেন? বার বার মনে হতে লাগল এটা শুধু স্বপ্ন নয়। আরো কিছু আমার মনের গভীর অভ্যন্তরে সন্তান সম্পর্কে যে ভয় ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা লুকোনো ছিল স্বপ্নে তা একটা রূপ পেল যেন। এ হয়তো আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কথা। সে রাতে আর ঘুম হলো না। সারা রাত নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

ঘর সংসার সাজিয়ে পুতুল খেলা করতে আমি জন্মায়নি। সমস্যার সমুদ্র পেরিয়ে, পাহাড় কেটে রাস্তা করে জঙ্গল সাফ করে চলেছি যেন। সে নির্ভয় যাত্রা পথের একমাত্র সঙ্গী বিদুর। সে আমার স্বপ্নের পুরুষ। সে সাধারণ নয়। অপাপবিদ্ধ দুর্মর সাহসী বিশ্বজয়ী বিদুরের মধ্যে আমার আকাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটিকে আচমকা পেলাম। তাকে না পেলে আমার স্বপ্ন দেখা হতো না। আমি হারিয়ে যেতাম।

বিদুরের স্বপ্নালু দু'চোখের উপর মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে ধরে আমি টের পাই ওর বুকের ভেতরেও লুকোনো আগুন আছে। বিদ্বেষ বহ্নিতে ওর ভেতরটা তুঁষের আগুনের মতো পুড়ছে। কিন্তু ও কিসের বিদ্বেষ? ওর উৎসই বা কোথায়? কতবার মনে হয়েছে ওকে জিজ্ঞেস করে জানব। কিন্তু নারীসুলভ লজ্জা, সংকোচে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি সমস্ত মন দিয়ে তার উত্তাপ অনুভব করলাম।

বিদুর বড় চাপা স্বভাবের। মুখ খুলতে চায় না। সে তার কর্মপথের এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ইতিহাসের কোন্ প্রয়োজন মেটাতে সে এত নীরব? কুরু বংশের সঙ্গে তার অদৃষ্ট কোন রহস্যসূত্রে বাঁধা? উত্তর মেলে না।

একদিন আচমকা তার জবাব পেয়ে গেলাম। বিদুরের সেদিন মনই ভালো ছিল না। আমারও ঘরে থাকতে ভালো লাগল না। কী ভেবে বিদুরের কাছে গেলাম। একমাত্র ওর কাছে গিয়ে বসলেই একটু শান্তি পাই, নতুন করে প্রাণ পাই, ফুরিয়ে পাওয়া জীবন যেন নবীকৃত হয়ে উঠে। আমায় দেখে বিদুর উৎফুল্ল হয়ে বলল: তোমার কথাই ভাবছিলাম ক'দিন ধরে। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। কী ভালো যে লাগছে! এক গাল হেসে বলল: 'আপনি কেন এলে বধু আমার বোঝা বইতে'?

তার আকুল করা মনের ভাষার, বুকের সৌন্দর্যের রহস্যময় আকর্ষণে আমি

বোবা হয়ে গেলাম। মুগ্ধ দুটি চোখ তার চোখের উপর এমন করে মেলে ধরলাম যেন একটু ও উপচে, পড়ে বাইরে নষ্ট না হয়ে যায়।

বিদুরের শান্ত ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল। আমার নীরবতায় বিদুর একটু অস্বস্তিবোধ করল। তাই বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্যেই বলল : কথাগুলো বানিয়ে বললাম ভাবছ, তাই না? মাঝে মাঝে মনের মধ্যে যখন ঝড় উঠে, পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধেই যখন বড়ই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি, তখন তোমার কথা ভীষণ ভাবে মনে পড়ে। মানুষ হলেই তার মন বলে একটা ব্যাপার থাকে। মন থাকলেই সে ভাবে। ভাবলেই মনের মধ্যে ঝড় উঠে। ঝড় উঠলেই সেই উথাল পাথাল দরিয়াতে নোঙরহীন নৌকোর মতো বড় অসহায় লাগে।

বিদুরের কথা শুনে মন ভরে যায়। কে জানে? কী ছিল তার ঐ কথার ভেতর। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার বিস্ময় ভরা উজ্বল দুই চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বিদুর বলল : হাঁ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে তুমি কী দ্যাখ বল তো।

স্নিগ্ধ হাসির মাধুর্যে লাবণ্যময় হলো আমার অধর। বললাম : তোমার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের শীতলতার ভেতর, বরফ কঠিন গাম্ভীর্যের স্বচ্ছ স্ফটিকের ভেতর চাপা পড়া তোমার আত্মাকে দেখি। তোমার ভেতর আমি নিজেকে খুঁজে পাই। বড় আপন মনে হয় তোমাকে। আমার মতোই তুমিও চির অনাদৃত, বঞ্চিত, ভাগ্যহত। আমরা দুজনে এ বংশের কেউ নই, তবু বিনিসুতোর মালার মতো গাঁথা হয়ে আছি হস্তিনাপুরের সঙ্গে। এ বড় আশ্চর্য বন্ধন। আমার মতো তোমার বুকে বিদ্বেষের আগুন তুঁষের মতো জ্বলছে। তোমার ও আমার জীবনের অনেক অপমান, অবহেলা, রাগ - বিদ্বেষের তারগুলো এক সুরে বাঁধা যেন। তোমার চোখের ভেতর দিয়ে আমার হৃদয়খানি দেখি তখন বড় আপন করে মানি।

বিদুর কৌতুকে হাসল। কী অদ্ভুত মাদক হাসি। মনে হলো আমার পায়ের তলায় মাটি কেঁপে গেল। মনে হলো ভূমিকম্প হলো। প্রলয় ঘটল। বুক উথাল পাথাল করল।

বিদুর সহসা আমার হাত দু'খানা তার হাতের ভেতর ধরে আবেগ গাঢ় স্বরে বলল : কুন্তী চলো আমরা পালাই। এই পরিবারের বাঁধন ছিঁড়ে অন্য কোথাও। পারবে? সাহস হবে পালাবার? চলো দু'হাতে তালি দিয়ে, হস্তিনাপুরের মানুষদের চমকে দিয়ে বন পরীদের ঘুম কেড়ে নিয়ে, গেরস্থদের খোকা হোক নীল পাখির মতো রৌদ্র ঝলমলে, আকাশের দিকে উড়ে যাই। এই মিথ্যে জীবনের বুকের শূন্য অন্ধকার গুহা থেকে অন্য এক মুক্ত দৃপ্ত জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে।

দিশাহারার মতো বিদুরের দিকে চেয়ে থাকি। বুকের উপর মাথা রেখে বলি : বিদুর তোমার কী হয়েছে বল তো? আজ তোমার মন ভালো নেই। তুমি ভীষণ অশান্ত, অস্থির। তুমি যা বলতে চাইছ কথার ফুলঝুরি হয়ে যাচ্ছে। ও সব রঙ বাহারে কথা তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার

মনের কথাটাই শুনব। আমার মতো করে গুছিয়ে বল। ওগো প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু দুখের বন্ধু তোমাকে চেনা আমার শেষ হবে না কোনদিন।

শান্ত ভাবলেশহীন কণ্ঠে বিদুর বলল ঃ জান কুন্তী, রাজপদের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও শূদ্রানী মায়ের সন্তান বলেই আমার ভাগ্যে রাজা হওয়া হলো না। রাজাকে রাজবংশের ব্যক্তি হতে হবে। কিন্তু আমার তো তা ছিল না। পিতা বনবাসী ঋষি, মাতা শূদ্রানী দাসী। রাজবংশের সঙ্গেও কোন যোগ নেই। এমনকি বংশপরিচয়ে কৌরব নামের লেজুরটুকুও নেই। তাই রাজন্যস্বীকৃতি আমার ভাগ্যে জুটল না। কিন্তু ক্ষাত্রস্বীকৃতি দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করা হলো। একটি জন্মসূত্রে অর্জন করা সম্ভব হয়, অপরটি শুধু জন্ম নয় জাতিগত কৌলীন্য ও বৃত্তিগত শ্রেষ্ঠত্বে অধিকৃত হয়। অথচ, জন্মসূত্রে আমাদের পিতা একই ব্যক্তি। আমাদের তিনজনের শরীরে একই রক্তধারা বইছে। তবু রাজন্যস্বীকৃতি থেকে আমাকে বঞ্চিত করে রাখা হলো। জননী শূদ্রানী বলে আমাকে হেয় করে দেখা হলো। আর্যত্বের অহংকারে শূদ্র বলেই অবজ্ঞা করা হলো। কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, দক্ষতার, কোন মূল্য নেই? এই অসম্মান আমি ভুলতে পারছি না। শূদ্র কী মানুষ নয়! তার কী কুল-গৌরব থাকতে নেই! আর্য বলে কি সভ্যতার গর্বে অনার্যদের অপমান করবে? ঘেন্না করবে? তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আর্যদের অহংএ শিবও নেই, সুন্দরও নেই, সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ ভয়ংকর। তেমনি একটা ভয়ংকর রাগ বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর। তাকে আর থামানো যাবে না। কুন্তী তোমার বুকেও ঝড়ের কলধ্বনি। সে আমার হাত ধরাধরি করে চলি। আমি নেব ধ্বজা, তুমি পরিয়ে দেবে তাতে বিজয় কেতন। বল, কুন্তী পারবে।

আস্তে আস্তে উচ্চারণ করি —পারব। খুব পারব। বিধাতার হাতে দুটি ঘুঁটি আমরা। ছকে বন্দী দুটি মানুষ। আমরা তো নিমিত্ত। ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে আমরা দুজনে একজায়গায় জমায়েত হয়েছি।

বিদুর দার্শনিকের মতো গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল ঃ কুন্তী, এ কার বিধিলিপি? তোমার, না আমার? পাণ্ডুর, না ধৃতরাষ্ট্রের? ভীষ্মের, না মহর্ষি দ্বৈপায়নের? না সকলের?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎই মনে হলো আড়াল থেকে সত্যবতীই সব কলকাঠি নেড়েছেন। সেটা মনে করা কিছু অসংগত নয়। কারণ, আর্যঋষির লালসা-বহ্নিতে আহুতি দেয়ার অমর্যাদাকে সত্যবতী ভোলেননি, প্রৌঢ় রাজা শান্তনুর অভিলাষ পূরণে বাধ্য হওয়ার ভেতর যে নিরুপায় আত্মসমর্পণতা ছিল তাকেও ভুলে যাননি তিনি। তাই আর্যজাতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ঘৃণার প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্পে শান্তনুর কণ্ঠে বরমাল্য দেয়ার আগে ভীষ্মকে দিয়ে আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকা এবং শান্তনুর সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকার দাবি না করার এক কঠিন শপথ করে নিয়েছেন।

তারপরে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল তাতে সত্যবতীর কোন হাত ছিল না। সত্যবতী না চাইলেও তাঁর অনুকূলে ঘটনাগুলো ঘটছিল। আর তিনি ঘটনপ্রবাহের

ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। তাই তাঁর ধাক্কাটা তাঁর সমস্ত কর্মের গায়ে লাগল। সত্যবতীর স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রীতি গোষ্ঠী ও বর্ণের প্রতি গভীর প্রেম খুব গোপনে সুচতুরভাবে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখে রাজনীতির পুরোভাগে একটু একটু করে টেনে এনেছেন। কৌরববংশকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে দ্বৈপায়নকে দিয়ে কৌরববধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করার পরিকল্পনা কৌশলটি তাঁর উজ্জ্বল স্বজাতি প্রীতির নিদর্শন। কৌরববংশের মধ্যে শূদ্রদের একটা চিরস্থায়ী জায়গা করে দেয়ার সংকল্পে শূদ্রানীর গর্ভে দ্বৈপায়নকে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করা আর এক কৌশল তাঁর নিঃশব্দে আর্যদের হাত থেকে শূদ্রদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং পালা-বদলের এক নাটক করলেন। একটি সুপ্রাচীন রাজবংশের বংশকৌলীন্য মুছে ফেলে তার স্থলে আর এক গোষ্ঠীকে নিঃশব্দে স্থানান্তরিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদলের এক আশ্চর্য ফন্দী। এই অপূর্ব কৌশলটি সম্পূর্ণ করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সমস্যার মধ্যস্থতা করতে দ্বৈপায়নের উপর ভার দেয়া হলো। কায়েমী স্বার্থের প্রভাব থেকে শাসন ক্ষমতা মুক্ত করার উদ্দেশ্যই দ্বৈপায়ন পাণ্ডুকে রাজা করলেন। আর শাসনদণ্ডটি পুত্র বিদুরের হাতে তুলে দিয়ে ভেদনীতি প্রয়োগ করে কৌরব বংশের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। পাণ্ডুর গুরুত্ব যাতে না কমে এবং তাকে সর্ববিষয়ে সুপরামর্শ দেয়ার জন্যেই গোপনে আমারও তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে একটা হৈ-চৈ ফেলে দিলেন। এভাবে রাজনীতির পুরোভাগে আমার আসা অনেকের মনঃপুত হলো না। আমার গুরুত্ব খর্ব করার কোপ পড়ল পাণ্ডুর উপর। কিন্তু ইতিহাস নিজের নিয়মে রাজবংশকে মুছে ফেলার এক নিঃশব্দ ভূমিকা নিল।

খুব আশ্চর্য লাগল ভাবতে। জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটনা আকস্মিক-ভাবে ঘটে যায় যার কোন প্রস্তুতি থাকে না। বোধ হয় এরকম ঘটনা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন দুর্ঘনা বহুল হতো না। দুর্ঘটনাই আর এক ইতিহাসের জায়গা করে দেয়। এভাবেই ইতিহাস বদলায়—অনেকদিন ধরে, একটু একটু করে, নিজের পথে, নিঃশব্দে। ইতিহাসের স্রষ্টা কেউ তৈরী করে না। মহাকাল নিজের মতো করে গড়ে পিটে নেয়। বিবিধ ঘটনার টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে, বহু বাধা বিপত্তির পথ অতিক্রম করে, সুখ দুঃখ, আঘাত-যন্ত্রণা, ব্যর্থতা-হতাশার পাহাড় ঘেঁষে বয়ে এসেই তবেই ইতিহাসের আবর্তে গিয়ে পড়ে। রোদ ঝলমলে আকাশের নিচে উন্মুখ আকাঙ্ক্ষার সামনে অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তবেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া যায়। এ ভাবেই মানুষের ইতিহাস এক ধারা থেকে আর এক ধারায় গিয়ে মেশে।

দূরে কোথাও উচ্চৈস্বরে বন মোরগ ডেকে উঠল। ভোর হচ্ছে। দিনের আলো ফুটবার আগেই রাতের সব তারা মুখ লুকিয়েছে। কেবল ধ্রুবতারা নির্ভয়ে জ্বলজ্বল করছে। কৃষ্ণ পক্ষের মরা চাঁদ আকাশের বুকে ঝুলে আছে। রাত্রির ঔজ্বল্য এবং দীপ্তি তার নেই, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবতারা এবং মরা চাঁদও বিদায় নেবে। সূর্য একা আধিপত্য করবে। রাতের গ্রহ তারার সঙ্গে দিনের সূর্যের ঝগড়া। এ ঝগড়া চিরদিনের! আস্তে আস্তে

পৃথিবীতে দিন হলো। দিগন্তে সূর্য উঠল। নিবিড় ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা রাতটা সূর্যের আলো পড়ে জেগে উঠল। লোকালয় জুড়ে কোলাহল পড়ে গেল। কে যেন আমার বুকের মধ্যে ফিস ফিস করে বলল, কুন্তী এখানে তোমার সুখ নেই। গৃহবন্দী হয়ে থাকাকে কেউ বাঁচা বলে। তুমি মুক্তি চাওনা? প্রতিশোধ নেবে না? বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবে না? তা হলে পালাও। এখানে বসে মুক্তির জন্যে কিছুই করতে পারবে না। বেরিয়ে পড় মহাপৃথিবীর দিকে। পৃথিবীতে যারা একটা বাঁধা ধরা পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে বিদ্রোহ করে। আরামের সংসার ছেড়ে এক অনিশ্চয়তার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখার সাহস পায় তারাই আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। শুধু আলাদাই নয়, বিশেষ একজনও বটে।

সকাল হয়ে গেছে। রোদ ঝলঝল করছে চারদিক। তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভালো লাগছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে গেল। গাছগুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ছায়ার আলপনা মাড়িয়ে মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ সেই দিকেই যেন দৌড়ে গেল। অশ্বখুরধ্বনি একটি বিপদ সংকেতের মতো বাজতে লাগল বুকে আত্মসুখের প্রসন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল।

ঘরের দরজার বন্ধ কপাটের উপর হঠাৎ মৃদু হাতের টোকা পড়তে চমকে উঠি। ও শব্দ আমার চেনা। দ্বার খুলে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। মুগ্ধ গলায় বললাম: তোমার কথাই ভাবছিলাম।

ঘরে ঢুকে বিদুর আমার চোখের উপর চোখ পেতে রেখে বলল: তোমার ভাবা মাত্র এসেছি। কী ভালো বল আমি।

বলার তো অপেক্ষা নেই। সত্যি, তুমি ভীষণ ভাল।

সে তো আমি জানি। তাই তো নিজের তদারকিতে শতশৃঙ্গ পর্বতে তোমাদের জন্যে সুন্দর বাসস্থান তৈরি করেছি। আর তোমার ঘরটা তোমার মতই অনন্য।

কপট রাগ দেখিয়ে বলি: নিষ্ঠুরের মতো সাত সকালে এই কথাটা শোনাতে এলে? হস্তিনাপুর থেকে আমাকে তাড়াতে পারলে যেন বাঁচ তুমি। পরাশরী তোমার কানে কী মন্ত্র দিয়েছে? বশীকরণের কোন ওষুধ করেছে!

বিদুর লাজুক অপ্রতিভতায় মৃদু ধমক দিয়ে বলল: ছি অভিমানের বশে মিছেমিছি একজনকে দুষছ কেন? ও আমাদের সাথে পাঁচে নেই। ভীষণ ভালো মেয়ে।

অভিমানের সমুদ্র দুলে উঠল বুকে। মেয়েলী অভিমান করে বললাম, তা-হলে তোমার কাছে আমি খারাপ একটা বাজে মেয়ে এই তো। সে জন্যেই আমাকে তাড়াতে চাইছে। আমার জন্যে বুকে যদি একটু দরদ থাকত তা-হলে এভাবে নিজের তদারকিতে নির্বাসনে পাঠানোর ঘর করতে না। তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। আগে তো এত নিষ্ঠুর ছিলে না। তবে কি আমায় তুমি ভালোবাস না। আমি হয়তো তোমার কাছে ফুরিয়ে গেছি, তাই এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ।

বিদুর বেশ একটু অপ্রস্তুত হলো। বিব্রত গলায় বলল ঃ তুমি মিছিমিছি রাগ করছ। অবুঝের মতো তোমাকে আগে কখনো কথা বলতে শুনেনি! তুমি তো সাধারণ রমণী নও। কেন বুঝছ না, আমি একজন আজ্ঞাবাহী কর্মচারী। আমার দোষ কী বল? রাজাদেশ তো অমান্য করতে পারি না।

দপ করে দুচোখ ক্রোধে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম ঃ কে রাজা? অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে তোমরা মানছ বলেই রাজা, নইলে সে রাজা কি সে? এরাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান পাণ্ডু।

সত্য। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দখলে সিংহাসন। আমার মানা না মানায় কিছু যায় আসে না। অকারণে রাজার বিরাগভাজন হওয়ার চেয়ে বিশ্বাসভাজন হওয়ার মূল্য অনেক বেশি। বিশ্বস্ততার অগ্নিপরীক্ষায় আমি সফল হয়েছি। এটা আমার মূলধন হয়ে থাকবে। পরে টের পাবে, বিদুর যা করছে তোমার ভালোর জন্যে করছে। তার নিজের জন্যে করছে। এ করাটা কোনদিন ফুরোবে না। শতশৃঙ্গ পর্বতে গেলে পুত্রদের জন্যে যেভাবে করতে পারি, এখানে বসে কিছুই করতে পারব না। শতশৃঙ্গ পর্বতে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি অবুঝ হয়ে না। আমাকে বিশ্বাস কর—এই নির্বাসন তোমার পুরস্কার।

হঠাৎ বিদুর আমার হাতখানা তার হাতের উপর রাখল। আস্তে আস্তে ওর মুখটা নেমে এল আমার হাতের উপর। ওর অধরের উষ্ণ স্পর্শ পেলাম হাতে। মনে হলো লালা নিঃসৃত ভিজে ঠোঁট দিয়ে আমার ভেতরের সব উত্তাপ শুষে নিতে লাগল। মনে হলো দীর্ঘ উত্তপ্ত নিদাঘের পর প্রথম বৃষ্টি নামল। এক সুখকর অনুভূতির আবেশ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। অভিভূত গলায় বললাম ঃ আমার পেটে তোমার ছেলে এসেছে; কেমন করে জানলে?

আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। ফুলে আলো পড়লে যেমন পাঁপড়িগুলি মেলে ধরে তেমনি মাতৃত্বের শ্রী তোমার পয়োধরে, উদরে, নিতম্বে, অঙ্গে অঙ্গে এক অন্য নারী করে তুলেছে তোমাকে। কাউকে বলে দিতে হয় না সে কথা। তাই তো শতশৃঙ্গ পর্বতে তোমার যাওয়ার প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। সেখানে কোন বাধা নিষেধ নেই। নিজের মতো করে বাঁচতে পারার সুখ কী কম! এখন তো আমাদের আর নিজের জন্যে বাঁচা নয়, তোমার পেটে যে এসেছে তার জন্যে বাঁচা। সে আমাদের স্বপ্ন, সাধনা, প্রত্যাশা। হস্তিনাপুরে তাকে লুকোনোর জায়গা নেই। তুমি একটুও মন খারাপ কর না। ভুলে যেও না রাজনীতি ও জীবন নীতির মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। এই তফাৎটুকু যে বোঝে না, কিংবা মেনে নিতে পারে না সে বাঁচতে শেখেনি। একজন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে অনেক কলা কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! আমি আশি বছর আগের ঘটনা চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং কানেও শুনছি। বিদুরের কথাগুলো শুনে যদিও আমার শরীর মন চমকে উঠল, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তে ওর দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো—ও চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে? আমার কান্না পাচ্ছে। বিদুরের কাঁধের উপর মাথা রেখে আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় আমি কাঁদছি—আর মনে মনে বলছি 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
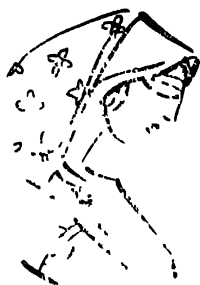
কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! এর ঘোর কাটতে চায় না। কারণ এতক্ষণ বা একটি ক্ষণে কিংবা একটি মুহূর্তে কিংবা সময়ের অতীত কিছুতে যা কিছু ঘটল তা স্মৃতি নয়, মনে পড়াও নয়, বাস্তব অনুভূতি, এককালের ঘটনা। যা সমস্ত চিত্ত জুড়ে অতীত ও বর্তমানের এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব চলেছে। আজ আমার কোন অভাব নেই, দৈন্য নেই।

চোখেতে শতশৃঙ্গ পর্বতের ছবি ভাসছে। পর্বতের পর পর্বত, আবার পর্বত। বিশাল বিশাল সমুদ্রের ঢেউ যেন অচল পাষাণে পরিণত হয়েছে। দিগন্তরেখা পর্যন্ত শত শত শৃঙ্গ যেন ঢেউ এর মতো জেগে আছে। পাহাড় খুব খাড়াই নয়। গাছপালা জঙ্গল খুব গভীর নয় এখানে। বিশাল বিশাল দেবদারু আর শমীবৃক্ষের বন যেন যেন পাহাড়কে পাহারা দিচ্ছে। বহু নিচে রুপোর পাতের মতো চকচক করছে পাহাড়ী নদীর জল।

এখানে আসার অল্পকাল পরে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হলো। তারপর আরো দুটি পুত্র জন্মাল। এরা সকলেই বিদুরের ছেলে। পাছে সে কথাটা জানাজানি হয়ে যায়, তাই বিদুরকে আড়াল করতে এক অলৌকিক গল্পের অবতারণা করতে হলো। ক্ষ্যাপা দুর্বাসার মন্ত্রদানের সেই পুরনো গল্পটাই কাজে লাগাতে হলো। এক অলীক অলৌকিক দেব মাহাত্ম্যের মোড়কে পুত্রদের জন্মরহস্য ঢেকে রাখা হলো। লোকে জানল তারা ধর্মের পুত্র পবনের পুত্র, ইন্দ্রের পুত্র। কিন্তু হস্তিনাপুর শুধু যুধিষ্ঠিরের জন্মের সংবাদ জানল। বিদুর যথা সময়ে তার জন্মের বার্তা হস্তিনাপুরের রাজ অন্তঃপুর পৌঁছে দিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বপ্নের মায়া আয়না ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এক কুৎসিৎ আত্মসংগ্রামে তাকে লিপ্ত করা ছিল বিদুরের কৌশল। ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী চিন্তায় কাতর করা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারানোর শংকা ও উৎকণ্ঠায় তিলে তিলে তাকে ক্ষয় ও নিঃসহায় করে তোলাই ছিল বিদুরের চক্রান্ত। ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশ সাধনের সংঘাতকে মনের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যুধিষ্ঠিরের জন্মের ঘটনাকে অলৌকিক এবং একটা দৈব ব্যাপার করে তুলল বিদুর।

আমার পুত্র হওয়ার সংবাদে গান্ধারীই সবচেয়ে বেশি বিচলিত। তার বিস্ময়ের অন্ত নেই। বলল: কুন্তীর পুত্র! বলহ কী দেবর? পাণ্ডু তো—

বিদুর তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল: এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্ষেত্রজ

পুত্র হতে তো বাধা নেই।

তারও তো একটা নিয়ম আছে।

পাণ্ডুই কুন্তীকে অনুমতি দিয়েছে।

গান্ধারী বেশ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল : দেবর এভাবে ক্ষেত্রজ পুত্র হয় না। পরিবারের লোকদের মেনে নেয়ার ব্যাপার তো আছে। কুন্তীর বিদ্রোহ কার উপর? সে কি চায়?

ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন গলায় বলল : সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে আবার বোধ হয় একটা জট পাকাল।

গান্ধারী হতাশ গলায় বলল : স্বামী আমার পেটে যে এসেছে তার জন্মানোর সার্থকতা কি? তার তো কোন ভবিষ্যৎ নেই। পৃথিবীতে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে অবাঞ্ছিত।

ধৃতরাষ্ট্র তার মনের ভয়টাকে চাপা দেয়ার জন্যে জোর গলায় বলল : কী সব আবোল তবোল বকছ বল তো। এই সিংহাসন ন্যায়ত ধর্মত আমার। এর ভেতর পাণ্ডু পুত্রের কোন স্থান নেই। তার ছায়ার সঙ্গে আমাদের লড়াই করা বৃথা।

স্বামী, কুন্তী সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। সে বসে নেই। গোপনে কিছু একটা করার মতলব করেছে। বাইরের তৃতীয় শক্তি হিসেবে দেবতাদের এর ভেতর ডেকে আনাটা আমার ভালো লাগছে না। আমার একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করছে না

বিদুর গান্ধারীকে শান্ত করার জন্যে বলল : বৌঠান সামান্য ঘটনায় এত উতলা হলে চলে? একটা কাল্পনিক আতঙ্কে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করার সুখ কি? এ সব তোমার চেয়ে বেশি কে জানে? তুমি তো অবুঝ নও।

পাছে গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়, ধৃতরাষ্ট্রের কুনজরে পড়ে কুন্তী, তাই ধৃতরাষ্ট্রকে কপট প্রবোধ দিয়ে বিভ্রান্ত করল বিদুর। বলল : অগ্রজ তোমরা মিথ্যে দুর্ভাবনার কষ্ট ভোগ করছ। একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী থাকতে পারে? সহায়হীন, বান্ধবহীন, পাণ্ডুপুত্রের জন্যে কুন্তী কিছুই করতে পারে না। ধর্মরাজ তো ভোগ-বিলাসের পদ। তাঁর কার্যত কোন ক্ষমতাই নেই। ধর্মের দোহাই দিয়ে দেবতারা তাঁকে দিয়ে অপ্রিয় কাজ করান। তাঁকে তৃতীয় শক্তি ভাবাটা কল্পনা বিলাসিতা মাত্র। তা-ছাড়া কুন্তীর কাছে কারো পাওয়ার কিছু নেই। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে হাস্তিনাপুরের বিরাগভাজন হওয়ার মতো মূর্খতা কোন নৃপতি করবে না। কুন্তীকে তারা সাহায্য করবে কেন? তার কোন ভবিষ্যতই নেই।

ধৃতরাষ্ট্র লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তুমি যথার্থই বলেছ। মিথ্যে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি। শিশু পুত্রকে নিয়ে এত মাথা না ঘামালে চলবে।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া টের পাওয়ার পরে বিদুর আর দুই পুত্র, সম্পর্কে নীরব থেকেছে। তাদের জন্মের কোন খবরই হস্তিনাপুরে পৌঁছল না। সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হলো। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রের মনের অবস্থাও ভালো ছিল না। আমার সম্পর্কে তার কোনরকম কৌতূহল যাতে উদ্রেক না হয় সেজন্যে এক দুঃসহ মানসিক সংকট সৃষ্টি করে বিদুর তার সমস্ত নজর এবং ভাবনাকে

হস্তিনাপুরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখল। বিদুরের অনুগত ব্রাহ্মণ, পুরোহিতরা ধৃতরাষ্ট্রের সদ্যোজাত পুত্র দুর্যোধনকে নিয়ে এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হলো। বিধাতাই সুযোগটা করে দিল। দুর্যোধনের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রকৃতির অভ্যন্তরে এক ভয়ঙ্কর গোলমাল সুরু হয়েছিল। চৈত্রের নীল আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে সারি সারি গাছপালা ম্লান মুখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাখিরা হঠাৎ ভয় পেয়ে দিগন্ত কাঁপিয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ছিল। পশুরা অসহায়ের মতো ডুকরে কেঁদেছিল। আকাশ ক্রোধে ক্ষোভে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বজ্রের ভীম প্রহরণে ধরিত্রীর নাভিশ্বাস উঠল। দুর্যোধন পাপাত্মা বলেই তার জন্মের নিমিত্ত এই সব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল। লোকে তাই নিয়ে বলাবলি সুরু করল, দুর্যোধন দুরাত্মা, পাপী ঘোর কলি। এ হেন শিশু রাজ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। তাই ধরণী তার আর্বিভাবে এত অধীরা। চরাচর ক্ষুব্ধ। বিশ্বপৃথিবী তাব বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার। রাজ-অন্তঃপুর পর্যন্ত এই অপব্যাখ্যার ঢেউ পৌঁছন। প্রতিশোধ নেয়ার সেই সুরু। সূচনাটা ভালোই হলো। এই ষড়যন্ত্র ধৃতরাষ্ট্রের মনের বেশীভাগ শক্তি ক্ষয় করে ফেলল এবং ক্ষমতা লড়াইর বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করার এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

ছেলেরা বড় হচ্ছে। বিদুরের আসা যাওয়া ভীষণভাবে কমে গেছে। কালে ভদ্রে কদাচিৎ আসে। আত্মীয়-স্বজন-বান্ধবহীন দেশে বিদুরকে পেলে আর ছাড়তে চায় না। ছায়াব মতো লেপ্টে থাকে। আমাদেরও যে কিছু গোপন কথা থাকতে পারে ছেলেদের জ্বালায় তা হওয়ার উপায় থাকে না। ভেতরটা তৃষ্ণার্ত হয়ে থকে। সামনা সামনি থেকেও বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করি। মনটা বিস্বাদে ভরে যায়। ছেলেদের উপর রাগ হয়। ঈর্ষা হয়। ছেলেরা বড় হলে এই হয় মুস্কিল।

দুজনের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে হাসি দু'জনে। চোখে চোখে নীরব খুশি ও অনুরাগ বিনিময় করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু তাতে কি মন ভরে? মনের তো একটা ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আরো কত কি লুকোনো থাকে—মনও তা ভালো করে জানে না। একটা অতৃপ্তিতে ভেতরটা টাটায়। বিদুর বোকার মতো হাসে। আমার গা জ্বলে যায়। রাগ হয় খুব। এভাবে

জব্দ করে ওর মজা দেখাটায আমি খুব বিরক্ত হতাম। ইচ্ছে করত, সকলের সামনেই দুম দুম করে পিঠে বেশ কিছু কিল চড় বসিয়ে দিই।

একদিন হঠাৎ কী হলো কে জানে? শরীরের ভেতর একটা অদ্ভুত রাগ ঢেউ দিয়ে গেল। প্রেমের অমৃত ছাপিয়ে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধের হলাহল ছড়িয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গে। বিষের জ্বালায় সেদিন বিদুরের সঙ্গে ঝগড়া করতেই রাত দুপুরে ওর ঘরে কড়া নাড়লাম।

দ্বার খুলে আমায় দেখে বিদুর একটু অবাক হয়েছিল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: তুমি! এত রাতে!

এত রাতে তোমার ঘরে তো কতবার এসেছি। কৈ সেদিন তো অবাক হওনি। বরং খুশি হতে ভীষণ। এখন তুমি অনেক বদলে গেছ। অন্যায় কিছু নয়। কারণ পরাশরীর গর্ভে তোমার ছেলে হয়েছে অনেকগুলি। তারাও বড় হচ্ছে। সুতরাং ভুলে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। পরাশরীর ছেলেরাই পারবে তোমার মনস্কামনা পূরণ করতে। তোমার কাছে আমরা ফালতু হয়ে গেছি।

বিদুর অবাক চোখে আমাকে বুঝবার চেষ্টা করল। তার চোখের চাহনিতে তখনও ঘুমের একটা ঘোলাটে ভাব ছিল। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিতে উঠতে বেশ একটু সময় নিল। আস্তে আস্তে বলল: এত রাতে তুমি আমরা সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছ?

একে কি ঝগড়া বলে? তোমার ছেলেরা যদি প্রত্যাশা পূরণে যোগ্য হয় তা হলে আমার ছেলেদের প্রয়োজন কি? তুমি এক নতুন প্রজন্মের স্রষ্ট্রী যাদের দেহে শূদ্রের রক্তধারা বইছে তাদের হাতেই তুমি শাসনভাব দিতে চাও। তোমার নিজের পুত্রদের ফেলে অন্যের কথা ভাববে কেন? কোন পিতাই ভাবে না। আমার কণ্ঠস্বরে ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্রূপের এক ঐকতান সৃষ্টি হলো মুহূর্তে।

বিদুর ভীষণভাবে চমকাল। তার মুখ কাগজের মতো সাদা। অবিশ্বাস ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল: তোমার ছেলে, আমার ছেলে নয়? ওদের এই পৃথিবীতে আনতে আমি নিঃশেষ নিবেদন করেছি নিজেকে ওদের দেহ, আত্মা, মেদ, মজ্জা রক্ত সব আমার বীর্যে গঠিত। পরাশরীব সন্তানদের আগেই ওরা দিয়েছে আমাকে পিতৃত্বের অনুভূতি, আনন্দ। নাই বা ঝুলে থাকল ওদের নামের সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু আমি তো জানি ওরা আমারই পুত্র। বাইরের পিতৃপরিচয় কুলপরিচয়টা সব। রক্তের সম্পর্ক, মনের সম্পর্কের কোন দাম নেই। পরাশরীকে তুমি ঈর্ষা কর। তার গর্ভে পুত্র হয়েছে বলেই আমাকেও অবিশ্বাস করছ। পরাশরীর পুত্রদের তোমার পথেয় কাঁটা বলে ভাবছ। কিন্তু এ তোমার ভুল ধারণা। সম্পর্কের শেষ সুতোয় বাঁধা এই কাঁটার ফুলটি নিয়ে তুমি নিজে অনর্থক রক্তপাত করছ। আমার বুকে তার কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে রক্তপাত করলে। এই সর্বনাশা খেলা তুমি কর না। রাজ অন্তঃপুরের ভেতর থেকে ওরা কোনদিন স্বাধীনভাবে হস্তিনাপুরে সিংহাসন দখল করার মতো কোন

আত্মঘাতী সংগ্রামে নিজেকে জড়াতে পারে না। আমিও সে চেষ্টা করব না। তাতে আমাকে দুকুল হারাতে হবে। কুন্তী ভালোবাসার উপর বিশ্বাস রাখ।

বিদুরের কথা শুনে কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। একটা অপরাধবোধে আমার ভেতরটা অনুশোচনায় ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। মেয়েরা যখন কথায় পেরে উঠে না, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে না অসহায়ের মতো তখন ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলে। আমিও কাঁদলাম বিদুরের বুকে মুখ রেখে। বুকের ঘন কালো লোমের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গায়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে অশ্রু বর্ষণ করলাম। অনেকক্ষণ। বললাম: বিশ্বাস কর এ আমার মনের কথা নয়। এসব অবাস্তব কথা আমি বলতেও চাইনি। তবু কেন যে মুখে এসে গেল জানি না। এখন অনুশোচনা হচ্ছে। লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। আসলে আমার মাথার ঠিক নেই। ষোল বছর এই বনে জঙ্গলে পড়ে আছি কিন্তু ভালো লাগে না। ছেলেরা বড় হচ্ছে। দিন চলে যাচ্ছে। অথচ, কিছুই করা হলো না তাদের জন্যে। এক জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি ষোল বছর। এতে কি মাথা ঠিক থাকে বল? আমি শুধু তোমার ডাক শুনবার অপেক্ষায় আছি।

কুন্তী তোমার কথা আমি বুঝি। কিন্তু উতলা হলে তো চলবে না। সব কিছুর জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে।

অবুঝ মনটা আমাকে পাগল করে দেয়। সব সময় মনে হয়, শপথ রাখা হলো না। স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। আমি হেরে যাচ্ছি। আমার যে তুমি ছাড়া কেউ নেই। ছেলেরাও না। তুমি আমার বন্ধু, আমার পরামর্শদাতা পথপদর্শক নির্দেশক, আমার গৌরব, ইজ্জত সব তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছি। বিদুর! বিশ্বাস কর হেরে যাওয়ার মতো লজ্জা আর কিছু নেই। হারতে আমার বড় ভয়। হারলে বাঁচব না। বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা খুঁজে পাব না। আমি তা হলে আত্মহত্যা করব।

উদ্বিগ্ন গলায় বিদুর বলল: তোমাকে কিছু করতে হবে না। অবস্থা এখন বদলে গেছে। পাণ্ডু এখন একা নয়। তোমাদেরও নির্বান্ধব ভাবার কারণ নেই। পার্বত্য রাজ্যগুলির রাজা ও প্রজার সঙ্গে তোমাদের সুসম্পর্ক বাহুবল ও লোকবলের অভাব পূরণ করবে। এই অঞ্চলের বেশ কিছু মুনি ও ঋষি তোমাদের গুণে মুগ্ধ। তাঁরাও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ষোল বছর ধরে যে নাটকের মহড়া এখানে চলেছে, সে নাটক এবার হস্তিনাপুরের রাজগৃহে হওয়ার ছাড়পত্র অবশ্যই পেতে পারে। কিন্তু তুমি কতখানি প্রস্তুত সেটা তুমিই ভালো জান। হস্তিনাপুরের প্রত্যাবর্তনের সাফল্য নির্ভর করছে তোমার উপরে

বিদুরের কথায় হঠাৎ সব গুলিয়ে গেল। নিজেকেই অবিশ্বাস করছি আমি। আমার প্রবল আত্মবিশ্বাস কোথায় গেল? ভেবে পাচ্ছি না কী করব? আমি ঘেমে উঠেছি! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বিদুরের চোখে চোখ রাখলাম। স্ফুরিত অধরে একটু অভিমান জাগল। বললাম: পাণ্ডবদের আপনজন তুমি। কী করলে ভালো হয় সে তো তুমি দেখবে। পিতা হিসাবে সেটাই তোমার করণীয়।

আমার জন্যে না হোক তোমার ছেলেদের কথা ভেবে তো কিছু একটা করবে।

হঠাৎ বর্তুল হাসি ফুটে উঠল আমার অধরে। চোখে নির্মল কৌতুক। বললাম : কী বলে ডাকব তোমায়—নেপথ্যের কুশীলব, না খল নায়ক

বিদুর কুটিল চোখে আমার দিকে চেয়েছিল। তারপর বলল : একটু বুঝে সুঝে কথাবার্তা বোলো। কথায় বলে দেয়ালেরও কান আছে।

হস্তিনাপুরের পথেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাণ্ডু মারা গেল। এরকম একটা বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই একটু দিশেহারা হয়ে পড়ি। এমন একটা বিপদ আমাদের সকলের বিপদ হয়ে মাঝপথে সব কিছু পণ্ড করার উপক্রম করবে কে জানত? পাণ্ডুকে হারানোর শোক আমার ছিল না। এক অকূল সমুদ্রে ভাসছি। স্বার্থপরের মতো ভবিষ্যৎ ভাবনায় অধীর। এই বিপদ এ-যাত্রার মতো কাটিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরতে পারব কি? এই প্রশ্নে আকুল হলো মন।

পাণ্ডুর মৃত্যু হঠাৎ আমাকে এমন একলা করে দিল যে ভালো করে কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ঈশ্বর সত্যি কি চায় কে জানে? একদিন পাণ্ডুর ভাগ্যোদয়ের যে সূর্য হস্তিনাপুরের আকাশে উদয় হয়ে হস্তিনাপুরেই অস্ত গিয়েছিল, তা যে আবার এমনি করে নবোদয়ের আগেই এক খণ্ড কালো মেঘ হয়ে উদিত সূর্যকে ঢেকে দেবে তা কে ভাবতে পেরেছিল।

পাণ্ডুর জীবদ্দশায় একবারও তার প্রয়োজন টের পায়নি। একটা সান্ধ মুহূর্তে মারা গিয়ে সে বুঝিয়ে দিল রুগ্ন অযোগ্য মানুষেরও সংসারে একটা দাম আছে। দেহান্তর পরে মনে হলো এই লোকটি ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। এই মানুষটাকে বাদ দিয়ে আমার বেঁচে থাকা নিরর্থক আমার কোন মূল্য নেই। পাণ্ডু আমার পরিচয় মাত্র। তার না থাকা মানে আমার সব পরিচয় হারিয়ে গেল। আমি ঠিকানাহীন হয়ে গেলাম। পাণ্ডুর অস্তিত্বহীনতার সংকট কাটিয়ে হস্তিনাপুরে আর ফিরতে পারব কি-না সন্দেহ হলো।

পাণ্ডুর শবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। এক প্রবল সম্মোহনে আটকে আছে আমার দৃষ্টি। দৃশ্যটি আমি দেখতে চাইছি না, কিন্তু না দেখেও যেন উপায় নেই। পাণ্ডু কী একা, কী আত্মীয় পরিজনহীন আজ পাণ্ডু। মৃত্যু মানেই কী একাকীত্ব ও পরিজনহীনতা? পাণ্ডুর প্রাণহীন

দেহ, ইন্দ্রিয় কি এই মুহূর্তে অনুভব করতে পারছে তার দুই স্ত্রী এবং পাঁচ পুত্র তার খুব কাছে বসে অশ্রুবর্ষণ করছে সে কী একবারও ভাবছে তার পুত্রেরা হস্তিনাপুরের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর তাদের অধিকার আদৌ ফিরে পাবে কিনা? ফর্সা ও সুন্দর ছিপছিপে রোগা দেহটির আজ কী দশা!

পাণ্ডুর শবের পাশে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছি। মনে হলো ওর ঠোঁটটা নড়ে উঠল। নিঃশব্দে আমাকে বলল যেন—পৃথা কুন্তী তুমি কাঁদছ? কেঁদে কিছু হয়? তোমার তো ভেঙে পড়লে হবে না। কেন বোঝ না, জীবনে দুর্যোগ যখন আসে তখন আপাতত তার আসার রকমটা দেখে অনেক সময় মনে হয় এটা বুঝি হঠাৎ উদয় হলো। কিন্তু ঝড় উঠার অনেক আগেই থাকে ঝড়ের সঙ্কেত। ঘরের চালে যখন আগুন লাগে সে আগুনের উদ্ভব যে তার কত আগে রান্না করার অসাবধানে, কিংবা কারো তামাক খাওয়ার নেশার ঝোঁকে ঘটে যায় তার খোঁজ রাখি না আমরা। কিন্তু আমি তো জানি যে ঝড় নিয়ে তুমি হস্তিনাপুরে ঢুকছ, সে ঝড়ে হস্তিনাপুরের ছাদ উড়বে না, দেয়ালও ভেঙে পড়বে না। কেবল তুমি ঝড়ে লণ্ড ভণ্ড হয়ে বিধ্বস্তের মতো পড়ে থাকবে। তোমার সে দুর্দশা দেখতে পারব না বলেই এভাবে চলে যেতে হলো। সত্যি, এমন করে না গেলে হয়তো হস্তিনাপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে না তোমরা। আমি না মরলে হয়তো ইতিহাস তার আপন গতিপথ পরিবর্তন করতে পারত না। আমার মৃত্যুটা দরকার ছিল। এই মৃত্যুটা তোমার নিজের পথে, তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। আত্ম-বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় তুমি নতুন হয়ে উঠবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাস হারালে মানুষ বড় একলা হয়ে যায়। হেরে গিয়ে নিজের কাছ থেকে শুধু পালানোর চেষ্টা করে। তুমি হেরে যাবে একথা কল্পনাও করতে পারি না। তোমার জেতার জন্যে আমার মৃত্যুই দরকার ছিল। হস্তিনাপুরে গেলেই বুঝতে পারবে আমার মৃত্যুটা কত প্রয়োজন ছিল।

পাণ্ডুর দিকে এভাবে কতক্ষণ তাকিয়ে আছি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলাম। একজন মুনির ডাকে চমক ভাঙল। সুধা স্নিগ্ধ শান্ত গলায় বললেন মুনিবর: মা, শোকে এমন পাথর হয়ে থাকলে তো হবে না। আমাদের তো একটা কিছু করতে হবে।

মুহূর্তে প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল। মাদ্রী সংজ্ঞাহীন হয়ে পাণ্ডুর বুকের উপর পড়ে আছে। পঞ্চ পাণ্ডব উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। তাদের চাউনি লক্ষ্যহীন। পরিস্থিতিই হঠাৎ এক দায়িত্বশীল রমণীতে পরিণত করে দিল আমাকে। আস্তে আস্তে বললাম: মুনিবর, হস্তিনাপুর যাব বলে বেরিয়েছি। এখন তো ঘরের ছেলেকে ঘরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব চাপল। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম যা কিছু করার তা হস্তিনাপুরে গিয়ে করব কৌরববংশের পারিবারিক নিয়ম মেনে। হস্তিনাপুরে আসার একটা ভালো অজুহাতও আমরা পাব। আপনি সেই আয়োজনই করুন।

মুনিবর বললেন: হস্তিনাপুর যেতে এখনও দিন দুই সময় লাগবে।

শুনেছি, ইঙ্গুদি তৈল পূর্ণপাত্রে শব সংরক্ষণ করা হয়। যে করে হোক

ঐ শব হস্তিনাপুরে নিয়ে যাব।

হস্তিনাপুরের দূরত্ব যত কমে আসে আমার বুকে ধকধকানিটা তত বাড়ে। কিন্তু হস্তিনাপুর পৌঁছে যাওয়ার পরে সব থেমে গেল। কেমন একটা প্রশান্তির ভাব এল। অবাক লাগল হস্তিনাপুরে অগণিত নাগরিক পাণ্ডুপুত্রদের দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পথে অপেক্ষা করছে। উৎসুক জনগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, পাণ্ডুপুত্রেরা দেবতার সন্তান। পৃথিবী থেকে ভেদাভেদ, বৈষম্য দূর করতে দেবতার অংশে তারা জন্মেছে। তাদের চোখে পুত্রেরা সব এক আশ্চর্য অসাধারণ মানুষ। এসব যে বিদুর এবং তার লোকেরা করেছে তা বুঝতে বাকি রইল না। এক দারুণ দুঃখের মধ্যে সংকট কাটিয়ে উঠার তীব্র আনন্দ ও সুখের অনুভূতি বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল।

বিদুর সকলের অলক্ষ্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এসব অনেককাল আগের ঘটনা। তবু এতকাল পরে সেদিনকার ঘটনাগুলোর সব একটা নতুন মানে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। দেড়যুগ আগের হস্তিনাপুরের বাইরেটা খুব বদলায়নি কিন্তু ভেতরে ভেতরে হস্তিনাপুর সেরকমটি আর নেই। বাইরে থেকে তা চোখে দেখা যায় না, বোঝাও যায় না। অনেক পুরনো ঘটনার তাৎপর্য আজ যেন মনেতে ছায়াপাত করছে, আগে কখনো করেনি। পৃথিবীতে কোন ঘটনা—দুর্ঘটনা কাউকে চিরকালের মতো অভিভূত করে রাখে না। রাখলে হস্তিনাপুর আমাদের মেনে নিয়ে জীবনস্রোতে ফেরার অনুকূল অবস্থা কখনও তৈরী করত না। ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে যখন সব জিনিসের আসল নকল যাচাই হয়ে যায় তখন হস্তিনাপুরেরও হয়তো একটা নতুন যাচাই অলক্ষ্যে হয়ে গেছিল নিশ্চয়ই।

সংসারে মিষ্টি ভালোবাসার আকর্ষণে গা ঢাকা দিয়ে অতীতের কথা ভুলে গেলাম। বর্তমান নিয়েও আর দুর্ভাবনা নেই। পাণ্ডুর সিংহাসনের উত্তরাধি-কারীত্ব মেনে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যুব / পদে অভিষেক করে এক নাটক সৃষ্টি করল। এই নাটক না হলে আমার রাজমাতা হওয়ার উচ্চাশা পূরণ হতো না। যে ভাবেই হোক জয় হলো আমার। কৃতিত্ব পুত্রদের। তারা অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট এবং নম্র স্বভাবের। গুরুজনদের

তারা শুধু বাধ্য ও অনুগত নয় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অপরিসীম। চারিত্রিক গুণেই পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীরও প্রিয়। কী শাস্ত্র বিদ্যা, কী অস্ত্রশিক্ষা, সর্বক্ষেত্রেই তাদের সাফল্য, কৃতিত্ব পারদর্শিতা, ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব পিতৃব্য ভীষ্মকে গর্বিত করল। তাঁরা খুব কাছের মানুষ হলো তাঁর। সরল, শান্ত, ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের ভালোমানুষী এবং অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যার কৃতিত্ব ভীষ্মকে মুগ্ধ করে রাখল।

মজার কথা আমার সম্পর্কে পিতৃব্যের অন্তরে যেটুকু বিরূপতা ছিল, পুত্রদের কল্যাণেই তা আর থাকল না। এখন তার সামনে দাঁড়াতেও ভয় করে না। অথচ, হস্তিনাপুর আসার আগে কত ভয় ছিল মনে। তা যে এমন করে কোনদিন মিটে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ার পরে আমি দুর্ভাবনামুক্ত হলাম। কিন্তু অন্তরের আশঙ্কা গেল না। রাষ্ট্রক্ষমতা তখনও ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। শাসনকার্য হস্তান্তর হলো না। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কোন কাজকর্মের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হলো না। ধৃতরাষ্ট্রের কপট কোন অভিপ্রায় নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিংবা পিতৃব্য ভীষ্মের নির্লিপ্ততা যে তাদের বঞ্চনার কারণ হবে এমন সন্দেহও আমার ছিল না। কারণ, আমার বিয়ের সময় পিতৃব্যের অন্তরে যে তীব্র কুন্তী বিরোধিতা এবং বিদ্বেষ ছিল ষোলো বছর পরে হস্তিনাপুর ফিরে সেই বিরোধিতা তাঁর কাছে পায়নি। অনেক বদলে গেছেন তিনি। রুক্ষ স্বভাবের বদ মেজাজী নিষ্ঠুর মানুষটার বুকের অতলে লুকেনো বাৎসল্যের সুধাসিন্ধুর মুখে যে জগদ্দল পাথরটি তার গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল পঞ্চপাণ্ডব মিলে তাকে সরিয়ে মুক্ত করে দিল যেন। ভীষ্ম একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

বড় সুখে আছি। অতীতের দিনগুলো দুঃস্বপ্ন মনে হয়। তবু তার ভেতর এককালে স্বপ্ন দেখতাম। কত সব অদ্ভুত বিচিত্র কল্পনা করতাম। কিন্তু আজ তার রাহুমুক্তি ঘটেছে। উৎকণ্ঠা, ভয় বলে কিছু নেই। সুখের শয্যায় শুয়ে ভাবি ঝড় চলে গেছে। এবার ঘুমোনোর সময়। নিশ্চিন্তে একটানা লম্বা ঘুম দিতে আর বাধা নেই

কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি ঘুমোলেও ইতিহাস ঘুমোয় না। ইতিহাসের নাকি ঘুমোতে নেই। ইতিহাস ঘুমোয় না, বলেই সময়ের গর্ভে এক নতুন ইতিহাসের ভ্রূণ সঞ্চার হয়। বহু ঘটনার ভেতর কোনো বৃহত্তের জটিল সৃষ্টি লীলার ফসল হয়ে একদিন তা ভূমিষ্ঠ হয়। ইতিহাসের পুরনো কুটিল স্মৃতি অন্ধকার গহ্বর থেকে হঠাৎ একদিন সাপের মতো ফণা ধরে। সেই ফণার ছোবলে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর ছেড়ে বারনাবতের আদিবাসী অধ্যুষিত অরণ্যাঞ্চলে হলো। এমনটা যে আবার ঘটতে পারে স্বপ্নেও ও ভাবিনি। ভাবব কী করে? বিপর্যয় হওয়ার কথা ছিল যখন, কিছুই ঘটল না। অদূর ভবিষ্যতের জন্যে যে তা মুলতুবি রইল এই সহজ কথাটা আমি ভাবিনি। নিবুদ্ধিতা অভিশাপের মতো আমার জীবনে যখন দেখা দিল, মনে হলো, এটা বুঝি হঠাৎ উদয় হলো।

সত্যিই হঠাৎ বলে কিছু নেই। আপাতভাবে যাকে হঠাৎ মনে হয় তার শিকড় থাকে ঘটনার গভীরে। বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারাগাছ যেমন মাটির নীচে সর্বাগ্রে

শিকড় চাড়িয়ে দিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেড়োয় তেমনি পাণ্ডুরপুত্রদের বারণাবতে পাঠানোর পেছনেও অনেককালের একটা ষড়যন্ত্র আছে। তার তাৎপর্য খুঁজে বার করতে গিয়ে ভীষ্ম সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত কথা মনে পড়তে লাগল। এসব কথা আগে মনে হয়নি কোনদিন। দাবানলের রাঙা আলো পড়েছে আমার ভাবনার ভীষ্মের গায়ে। মনে হচ্ছে রক্তের সাগরের স্নান করে উঠে আসছেন তিনি। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অচেনা মনে হচ্ছে। ভীষ্মকে এভাবে আগে কখনো দেখিনি। দাবানলের আলো পড়ে চিরচেনা ভীষ্ম চরিত্রটাই বদলে গেল। অথচ কোথও এতটুকু মিথ্যে নেই।

দাবানলের আলোয় আমার ভাবনার ভীষ্মকে অতীতের সমস্ত ঘটনার ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত দেবতার মূর্তির মতো দুর্জয় দেখাচ্ছে। প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব কিছু কায়েম করে ভীষ্ম সকলের মাথার উপর বসে আছেন। তিনি কিছুই করছেন না, অথচ সব কিছুর ভেতর ভীষণভাবে আছেন। সব ব্যাপারেই কী ভীষণ নির্লিপ্ত উদাসীন এবং নিরপেক্ষ।

ক্ষণে ক্ষণে মনে হতে লাগল আমাদের বারণাবতে পাঠানোর ব্যাপারে ভীষ্ম অনায়াসে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। বাধা দিতে পারতেন। তিনি একটু চাইলেই আমরা হস্তিনাপুর থাকতে পারতাম। শুধু তিনি চাননি বলেই আমরা এক জীবন থেকে আর এক জীবনের দিকে ভেসে গেছি ভীষ্ম পাণ্ডবদের কাছে সত্যি কী চেয়েছিলেন তিনি জানেন। এতকাল পরে আমার অন্য কথা মনে হলো। কৌরব পাণ্ডবদের সুখ শান্তি তিনি চাননি। নিরন্তর দ্বন্দ্ব, বিরোধ, গণ্ডগোল, অশান্তিতে তাদের জীবনটা বিষিয়ে উঠুক এটাই তো চেয়েছিলেন। রাজনীতির গর্ভদেশে তার উত্তাপ সঞ্চার করতে পরোক্ষে ধার্তরাষ্ট্রদের সব অপকর্মকে নীরবে অনুমোদন করেছেন। কারণটা হয়তো পিতা শান্তনু তাঁর জীবনের সব সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন বাসনার নীড় ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল। তাই পিতার ইন্দ্রিয় পরায়ণতা মাযের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে কুরুবংশকে সমূলে ধ্বংস করার এক পরিকল্পনা তাঁর মনের মধ্যে রূপ নিয়েছিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের গণগণে আলোয় তা যেন উদ্ভাসিত হলো।

অনেককাল আগের ঘটনা। তবু ভীষ্মকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই মানুষটা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। আমার সঙ্গে তাঁর বিরোধের কোন কারণ নেই তবু আমাকে প্রতিপক্ষ ভাবতেন। এই প্রথম তার কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভেতর সিংহাসন নিয়ে একটা ঠাণ্ডা বিরোধ ছিল। থাকাটা কোন অন্যায় নয়। কিন্তু ভীষ্ম পাণ্ডুর রাজা হওয়া খুশি মনে মেনে নেয়নি। হস্তিনাপুরের রাজ ক্ষমতার উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পাণ্ডুর চেয়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকেই তাঁর বেশি প্রয়োজন। কারণ পাণ্ডুর কোন অনুগ্রহ কিংবা দয়া নিয়ে রাজা হয়নি। তার রাজা হওয়ার মধ্যে কোন অধর্ম কিংবা অন্যায় ছিল না। রাজাকে যেহেতু সবদিকে নজর রাখতে হয় তাই অন্ধত্বের জন্যে ধৃতরাষ্ট্রকে স্বেচ্ছায় দাবি ও অধিকার ছেড়ে দিতে হলো। কিন্তু পাণ্ডু রাজা হোক, ধৃতরাষ্ট্র চায়নি। ভীষ্মও চায়নি। ধৃতরাষ্ট্রের মতো

অসহায় কিংবা পরনির্ভরশীল ছিল না পাণ্ডু। সে শুধু রোগগ্রস্ত। চিকিৎসা করলে সে রোগ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু তার ভালো হওয়াটা প্রাণ দিয়ে কেউ চায়নি। পিতৃব্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পথে বাধা পাণ্ডু। পথের কাঁটা পাণ্ডুকে সরানো দরকার। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভীষ্মকে কিছু করতে হলো না। ঈশ্বর তাঁর সহায় হলো।

পাণ্ডুকে রুগ্ন করে রাখা হয়েছিল। তাকে সুস্থ করে তোলার আমার উদ্যোগ ভীষ্ম ভালো মনে মেনে নেয়নি। সেজন্যে আমি তাঁর চক্ষুশূল হলাম। আমার কাছ থেকে পাণ্ডু দূরে সরিয়ে দেবার মতলবে মাদ্রীর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে দিলেন। হস্তিনাপুরে থেকে পাণ্ডুর সুচিকিৎসা সম্ভব নয় বুঝে তাকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে যাত্রার পরিকল্পনা করলুম। কোথাও না কোথাও একজন ভালো বৈদ্যর ভেষজ চিকিৎসায় পাণ্ডু তো সুস্থ হয়ে উঠবে। তা হলে কারো মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে রাজকার্য করতে হবে না। ভীষ্ম হয়তো নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা করছিলেন মনে মনে। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভাই-ভাইর বিবাদ জীইয়ে রাখলেন। পাণ্ডুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি হস্তিনাপুরের শাসনভার ধৃতরাষ্ট্রের উপর অর্পণ করে কার্যত দু'ভাইর বিবাদ বিরোধের এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। তারপর, পাণ্ডু হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন করলে ধৃতরাষ্ট্র তাকে রাজ্য প্রত্যার্পণ করল না। এ জন্যে ভীষ্ম কোনরকম দায়ী হলেন না। ধৃতরাষ্ট্রকে কোন অভিযোগও করলেন না। ন্যায়-অন্যায়ের কথা বললেন না। এক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়বোধ করলেন। ভাবটা এমন দেখালেন যেন দুভাইর বিবাদের মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না তিনি। নিজের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতেই চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। এর ফলে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেরও কোন অপব্যবহার করা হলো না। বরং তাঁর ঔদাসীন্যতায় সিংহাসন নিয়ে দু'ভাইর বিবাদ-বিরোধ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, বৈরীতা জটিল হলো। পাণ্ডুকে বঞ্চিত করে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হলো হস্তিনাপুরের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য ও ক্ষমতা থাকবে তাঁর হাতে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ার জন্যে সর্বদা তাঁর অনুগত ও বাধ্য থাকবে। তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে আজীবন ক্ষমতার থাকতে হবে। যে ক্ষমতা কার্যত তাঁরই।

ভারত সাম্রাজ্যে মুকুটহীন অধীশ্বর হওয়ার উচ্চাভিলাষ ভীষ্মকে আরো কপট করে তুলল। কী দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ সেই মনের গতিপথ! বোধ হয়, তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞাই যে রহস্যের সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমাগতই এক রহস্যময় অসাধারণ অতি মানুষ করে তুলল তাঁকে। এই অসাধারণত্বকে সযত্নে রক্ষা করতে গিয়ে অহংবোধে তিনি শুধু ভারাক্রান্ত হননি। হয়ে উঠেছিলেন ভয়ঙ্কর দুর্বিনীত, উদ্ধত জেদী, হিংস্র এক মানুষ।—আত্মকেন্দ্রিক এবং ক্ষমতা সচেতন এক কূট রাজনীতিক। সিংহাসনে আরোহণ না করেও কূট কৌশলে হস্তিনাপুরের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিজের হাতেই রাখলেন। কিন্তু সে কথা কাউকে জানতে দিতে চান না। স্মৃতিরূপে ধরে রাখতে চান নিজের মধ্যে। সে স্মৃতি ক্রোধের ঘৃণার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার। সত্যবতীর মুখে একদিন সে গল্প শুনেছিলাম।

হিম্‌বর্ষের কন্যা গঙ্গা রূপলাবণ্যে মুগ্ধ শান্তনু হঠাৎ একদিন পাহাড়ী উপজাতির গোষ্ঠী প্রধান গিরিরাজের কাছে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। পাছে অনার্যদলনকারী, অসুর দর্পহারী মহাবীর শান্তনুর রোষের শিকার হয়। স্বরাজ্য এবং স্বজাতি ধ্বংস হয় তাই গিরিরাজ ভয় পেয়ে শান্তনুর হাতে গঙ্গাকে সমর্পণ করল। কিন্তু ধীবর রাজ গিরিরাজের মতো ভুল করল না। সবিনয়ে তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বলল : মহারাজ! কুরুবংশ অতি মহান বংশ। আপনি সেই বংশের একজন কীর্তিমান নৃপতি। আপনার হাতে কন্যা সম্প্রদান করার মতো পুণ্যকর্ম আর কী আছে! কিন্তু আমরা ছোট জাত। অসভ্য, বর্ব্বর। সভ্য ও কৃষ্টি সম্পন্ন মহান আর্য বংশের নৃপকুল এবং অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আমাদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে ঘেন্না করেন। মহারাজ চাইলেও তাঁরা এই বিবাহকে সম্মান করবে না। আমার কন্যার জীবনটাই তাতে বিষময় হবে। তাই বলছিলাম মহারাজ পুনর্বিবেচনা করুন। মহারাজ, এটা কোন অনুরাগ কিংবা প্রেম নয়—চোখের ক্ষুধা, ভোগ করার বাসনা। ভোগের পরের দিনগুলিতে যখন ক্লান্তি আসবে তখন ভোগ্য উচ্ছিষ্ট বস্তুর মতো আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করতেও কষ্ট হবে না।

শান্তনু প্রতিবাদে করে বলল : আমার কোন চাওয়া অতৃপ্ত থাকতে পারে না। বিশ্বাস করে তাকে নির্ভয়ে আমার হাতে সমর্পণ করুন।

দাসরাজ একটু আশাহত হয়েই বলল : মহারাজ, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির আপনার মুখের উপর তর্ক করা শোভা পায় না কিন্তু আমি তো পিতা। পিতা হওয়া বড় জ্বালা। তাই, অভয় দিলে নির্ভয়ে বলতে পারি।

বলুন।

শুনেছি, গিরিরাজ কন্যা গঙ্গার পাণিগ্রহণের পর আটবছর আপনারা একত্রে থেকেছেন আপনার অনেকগুলি পুত্র সন্তানও হয়। উপজাতি রমণীর গর্ভস্থ সন্তান হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক এটা রাজবংশের অভিপ্রেত নয়। তাই সাত সাতটি সন্তানকে মন্দাকিনীর জলে জীবন্ত বিসর্জন দিয়ে তাদের হত্যা করা হতো। মহারাজ চমকাবেন না। অমন করে তাকালে ভয়ে সব কথা বলতে পারব না আমি। অধমের বিচলিত পিতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনাকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। মহারাজ নিন্দুকে বলে, পতিব্রতা গিরিরাজ দুহিতা মহান রাজার নিষ্ঠুরতায় অসহিষ্ণু হতে থাকে। ভক্তির বদলে স্বামীকে ঘৃণা করতে সুরু করেন। প্রেমের মাধুর্য এবং উত্তাপ দুই নষ্ট হলো। ঘৃণার বিষে নীল হয়ে গেল দুজনের সম্পর্ক। অষ্টম সন্তান গর্ভে এলে হতভাগিনী গঙ্গা হস্তিনাপুরে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছিল না। আপনার হিংসার বলি হওয়ার আগেই গিরিরাজ দুহিতা সদ্যোজাত পুত্র দেবব্রতকে বুকে করে ঘেনায় সেই যে চলে গেল আর ফিরল না। তারপর ষোল বছর পরে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে ছেলেকে একজন মানুষের মতো মানুষ করে আপনাকে অর্পণ করল। অনার্য উপজাতির প্রতি প্রীতির ভাব জাগাতে, মহীষী গঙ্গার প্রতি যে অন্যায় করা

হয়েছে তার প্রতিকার করতে দেবব্রতকে যুবরাজ করলেন। মহারাজ কন্যার ভবিষ্যতের ভাবনা সব পিতারই থাকে। আমিও উদ্বিগ্ন। আমার বিশ্বাস এই বিয়েতে আমরা কেউ সুখী হব না। নবোদ্ভিন্না তরুণীর স্বামীত্ব গ্রহণের অনেক প্রতিবন্ধকতা-আছে। আপনার অবর্তমানে মা মরা মেয়েটা নিরাশ্রয় হবে। তাকে নিয়ে আপনার রাজ্যে ও অন্তঃপুরে অশান্তি হোক, আমি চাই না। আপনার ক্রোধের আগুনে আমার রাজ্য-ঘর ছারখার হবে। অনেক রক্ত ঝরবে রক্তের মাটিতে পা রাঙিয়ে আমার কন্যাকে আপনি হরণ করতে পারেন। কিন্তু যেখানে সে পা রাখবে রক্তের দাগ পড়বে সেখানে। সে দাগ মুছবে না। আপনার পুত্র দেবব্রত স্বেচ্ছায় যদি সত্যবতীকে জননীর সম্মান দিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। সত্যবতীর পুত্রকে যদি হস্তিনাপুরের নৃপতি করে, তবেই এ বিয়ে হওয়া সম্ভব।

দেবব্রতের কানে কথাটা পৌঁছল। পিতার উপর তার ঘেন্না হলো। এই মানুষটার পাপের বিষ তাব শরীরে। স্বেচ্ছাচারী, ব্যভিচাবী পিতার অসংযম পুত্র হয়ে দেখার বিড়ম্বনা এবং দুর্ভাগ্য যে কী যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে বোঝে না। অমন মহীয়সী মাকে এই মানুষটা কত কষ্ট দিয়েছে। তাকে সুখী হতে দেয়নি। মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে আর পাপ গোপনের জন্যে বলেছে, গঙ্গার সন্তান ধারণের অক্ষমতার কারণে অকালে মৃত ও বিকলাঙ্গ পুত্র প্রসব করেছে। দেবব্রতের বুকটা জননীব দুর্ভাগ্যের জন্যে কষ্টের জন্যে হাহাকার করে উঠল। জননী তাকে অজ্ঞাতস্থানে লুকিয়ে না রাখলে আর সাত ভাইর মতো এ পৃথিবীর আলো দেখতে পেত না। অভিমানের সাগর উথলে উঠল বুকে। মনে মনে বলল : না দেখলেই ভালো হতো। মা গঙ্গা জীবন দান করে স্বেচ্ছাচারী পিতার অসংযত নির্লজ্জ ব্যাভিচার দেখার শাস্তি দিল কেন? যে মানুষের জীবনে প্রেম নয়, কামই সব, তাকে কেউ মানুষ বলে না। পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কি? পিতার স্বার্থপরতায় তার শুভ্র মনটি নীলবর্ণ হয়ে গেল। সে আর শান্ত থাকতে পারল না। নিজের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা, প্রেমের সুন্দর অনুভূতিকে এক মুহূর্তে নিষ্ঠুর হাতে শ্বাসরুদ্ধ করতে ধীবররাজের শর্তের কাছে আত্মবলি দিল। প্রতিশ্রুতি দিল পিতার বাসনা পূরণ করতে কোনদিন বিবাহ করবে না। হস্তিনাপুরের নৃপতিও হবে না।

আত্মত্যাগ হলো তাঁর আত্মহত্যা। গঙ্গার অতি আদরের পুত্র দেবব্রত সেদিন থেকে হারিয়ে গেল বঞ্চনার উষর মরুভূমিতে। শান্তনু মহিষী সত্যবতী ভীষ্মের জীবনের রাহু। তাঁর স্বপ্ন, কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকে গ্রাস করল। মনের কোণে ব্যর্থ জীবনের ক্ষোভ, ক্রোধ, শূন্যতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। সেই ক্ষোভ রূপান্তরিত হলো জেদে, স্বার্থপরতায়, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায়। আসলে কঠিন প্রতিজ্ঞা মেনে চলার কঠোরতার তাপে শুকিয়ে গেল তাঁর মনের সুকুমার অনুভূতিগুলি। তাই অম্বার প্রেমের কোন মূল্য ছিল না তাঁর কাছে পিতার বঞ্চনার প্রতি জমানো ঘৃণাটাই উগরে দিলেন অম্বাকে প্রত্যাখান করে। ভীষ্মের মধ্যে একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। এক নীরব পাশবিক ক্রোধ নিজের হৃদয়কে দুহাতে ছিঁড়ে কুটি কুটি করল। অনেক রক্ত ঝরল তবু

হৃদয়ের কান্না কেউ শোনে নি। প্রেমহীনতায় অভিশপ্ত ভীষ্ম হয়ে উঠলেন এক ভয়ংকর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি। মনের শুকনো জমিতে জন্ম নিল কূটনীতি। যার দ্বারা সিংহাসনে আরোহণ না করেও কুরুরাজ্যের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখে ভীষ্ম কার্যত পিতার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উপরে প্রতিশোধ নিতেই পিতৃবংশ কুরুবংশকে সমূলে ধ্বংস করার এক পরিকল্পনা করল মনে।

আগায় যদি কেউ জিগোস করে বারণাবতে বিপদ আছে জেনেও গেলে কেন? তোমরা না গেলে কী হতে পারত, সেটা দেখার তর সইল না? সত্যি বলতে কি, যেতে আমাদের হতোই। কিছুদিন বিলম্ব করা যেতে পারত মাত্র। কিন্তু তাতে লাভ কী হতো? অসম্মান, অমর্যাদা নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আমাদের হস্তিনাপুর ছাড়তে হতোই। সেখানে আমরা নির্বান্ধব স্বজনহীন। কেবল বিদুরই স্নেহপরায়ণ পিতার মতো আমার পুত্রদের আগলে রাখত। তাদের হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অনেক অভিযোগ করেছে। কিন্তু ফল হয়নি। যুবরাজ হয়েও যুধিষ্ঠিরের সত্যি কিছু করার ছিল না। বরং যুবরাজের আসনে তাকে বসিয়ে ধৃতরাষ্ট্র কার্যত দুর্যোধন ও দুঃশাসনের ক্রোধ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ, ঘৃণাকে ভয়ংকর করে তুলল। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের বিবাদবিভেদের ইন্ধন যোগাতেই পিতৃব্য ভীষ্মের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হয়েছিল এই সত্যটা বড় দেরী করে বুঝলাম।

কী আশ্চর্য মানুষ ভীষ্ম! আমার পুত্রদের প্রতি কী অসীম স্নেহ, মমতা অনুরাগ তাঁর। তাদের সাফল্য, কৃতিত্ব তাঁকে গর্বিত করে। বিশেষ করে যুধিষ্ঠির আর অর্জুন তো তাঁর ফুসফুস আর হৃদয়। তাদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ কত গভীর এবং আন্তরিক তা বোঝাতে প্রায়ই বলতেন: মাঝে মাঝে মনের মধ্যে যখন ঝড় উঠে, জীবনটা বোঝা মনে হয়, মন খারাপ লাগে তখন তোমাদের সঙ্গ পেলে তোমাদের কাছে এসে বসলেই মনটা ভরে ওঠে। বড় শান্তি পাই। তোমাদের সান্নিধ্য আমাকে নতুন প্রাণ দেয়। ফুরিয়ে যাওয়া শুকিয়ে যাওয়া আমার জীবনকে নবীকৃত করে।

মাঝে মাঝে অবাক মুগ্ধতায় তাদের শান্ত, শ্রীময় দুই আঁখি তারার দিকে তাকিয়ে অভিভূত গলায় প্রশ্ন করেন: তোমরা কে গো? কোথা থেকে এলে? কেন এলে আমার দুঃখের বোঝা বইতে? প্রিয় আমার! সুন্দর আমার!

এই অদ্ভূত মানুষটিকে পাণ্ডবদের বড় আশ্রয় এবং ভরসার পাত্র ভেবেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, পাণ্ডবদের কোন সংকটে কিংবা দুর্দিনে তাঁকে ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেনি। ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দর পক্ষে বিপক্ষে কোন কথাও বলেননি। ধার্তরাষ্ট্রদের কোন অন্যায় ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। পাণ্ডুপুত্রদের বড় প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সত্যাশ্রয়ী পিতামহ আপনজন হয়েও নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে ধার্তরাষ্ট্রদের নিন্দে কিংবা তিরস্কার কিছুই করেন না। নালিশ করলেও চুপ করে থাকেন। তাঁর নির্লিপ্ততার রহস্য পুত্রদের মনে নানা সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাঁর এই নিরাসক্তির কোন অর্থ খুঁজে পাই না। নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য একজন মানুষকে নির্লিপ্ত বা উদাসীন হতে হবে কেন? পাণ্ডু পুত্রদের মনে বিষ সন্দেহ ঢুকল। পিতৃব্যের কপট আন্তরিকতার প্রতি তাদের অবিশ্বাস জন্মাল। নিরপেক্ষ থাকার ভান করে অন্যায়কে, ভীষ্ম প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বিরোধ বাড়িয়ে তুলছেন। রেষারেষির ক্ষেত্র সৃষ্টি করছেন। পিতৃব্য নিশ্চয়ই তাদের হস্তিনাপুরে থাকা চায় না। একটু নির্লিপ্ত আর নিরাসক্ত থাকলেই যদি সে কথাটা বলা হয়ে যায় তা-হলে মুখে বলবে কেন? চুপ করে থাকাটা দোষের কিছু নয়। বিশ্বাসের উপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত গড়ে ওঠে। বিশ্বাস ভেঙে গেলে গোটা সম্পর্কটা নড়বড়ে হয়ে যায়। তখন সম্পর্কহীনতাকে জোড়াতালি দেওয়া মিথ্যে গোলমেলে এক সম্পর্ক বলে মনে হয়। তাকে জোর করে ধরে রাখার মতো বিভ্রান্তি জীবনে আর নেই। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে আছে আমার হস্তিনাপুরে বসবাসের স্মৃতি।

দেখতে দেখতে জীবনের তেরোটা বছর হস্তিনাপুরে কাটল। পাণ্ডবদের প্রকৃত হিতৈষী ছিল বিদুর। সন্তানের মতো তাদের আগলে বেড়িয়েছে। পিতার স্নেহ, মমতা আদর ভালোবাসা উজার করে দিয়েছে তাদের। এতটুকু কার্পণ্য ছিল না সে দানে! ভরে উঠার পবিত্র সুখে হৃদয়টা বড় হয়ে যেত। বড় আদর্শের আলো পড়ত তার চোখে মুখে। বিদুর অনন্য। তার অবদান ভুলবার নয়। পাছে ধার্তরাষ্ট্রেরা হেনস্তা করে, অপমান করে—তাই পাণ্ডবদের সর্বদা দূরে দূরে সরিয়ে রাখত। তাদের ছায়া মাড়াতে নিষেধ করত। তবু জীবনের অনেকগুলি অমূল্য সময় অপচয় হলো হস্তিনাপুরে। এগুলো তো আর ফেরানো যাবে না।

অন্তত জীবনের বাকী বছরগুলি একপক্ষের দয়ায়, ঘৃণায়, অনুকম্পায়, কিংবা ঔদাসীন্যে, নিরাসক্তিতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যেই পুত্রদের নিয়ে বারণাবতে যাওয়া। সেখানে গিয়ে কী করব। কোথায় যাব সেটা জানার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই। পথে বেরোলে কিংবা পথের দিকে চাইলেই আমার রক্তে এক ধরনের উন্মাদনা জাগে। চলতে চলতে পথ মিলে যায়। নিজেরও চলার ইচ্ছে করে। যারা থেমে থাকে, স্থবিরতার শিকার হয়েছে যারা জীবনে, তারা হয়তো জানে না সেকথা।

সংসারে বঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে আমার যাত্রাপথ অভিষিক্ত

হলো। তার শেষ পরিণতি যে কোথায় কেমন করে কোন চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা আমার অদৃষ্টও বোধহয় বলতে পারে না। কারণ যাকে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয় ভাগ্যচক্রের পরিধিতে তাকে আঁটে না। অনেক বাধা, বাঁক, নদী, পথ, জঙ্গল, পাহাড় পার হয়ে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা সহ্য করে একা একা লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। বিধাতা তাকে অন্য ধাতুতে গড়ে বলে সে একেবারে আলাদা। তাকে কখনও বা মধুর, কখনও বা নিষ্ঠুর হতে হয়। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই। লজ্জা কিংবা মুখ চাওয়ার ব্যাপার করলেও তার চলে না। তাই চিরটা কাল আমি বোধহয় একটু নিষ্ঠুর, একটু বেশী স্বার্থপর। পৃথিবীতে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর কে নয়? অমন যে রামচন্দ্র—তিনিও কর্তব্য করতে নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়েছেন। ধীবররাজ, শান্তনু, ভীষ্ম—নিষ্ঠুর হয়নি কে? যে সংগ্রামে নেমেছি তাতে জেতার জন্যে যখন যা করণীয়, তা করতে স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হওয়া কোন অন্যায় নয়।

যে অন্যায় অপরাধ আমি করে থাকি না কেন, একান্তে তার উন্মোচন করে নিজেকে দেখি। এসব অতীতের কথা। তার কিছুই নেই আজ, কিন্তু একদিন তো ভীষণভাবে ছিল। আমার সমস্ত জীবনে, অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে তার স্পর্শ লেগে রয়েছে এখনও। আমি কি কখনও ভুলতে পারি ভীষ্মের বঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতার কথা! সে কথা মনে পড়লে এখনও বিস্ময়বোধ করি।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হস্তিনাপুরে সত্যবতীর পাশে বসে আছি। আর তিনি আমার মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছেন! বললেন: সংসারে সব হিসেব যদি সহজ হতো মা, তাহলে তো কোন ভাবনাই থাকত না। তোমার অনুমান নির্ভুল। ভীষ্ম নির্লিপ্ত, উদাসীন এবং নিরপেক্ষ থাকার ভান করে নিরঙ্কুশ শাসনের কর্তৃত্ব অবাধে ভোগ করছে। বাইরে থেকে তার কপটতা বোঝা যাবে না। পিতার বাসনা পূরণ করতে যে পুত্র আত্মবলি দিতে পারে তাকে তো মহান বলতেই হবে। তার মহত্বে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু রাগও হয় ভীষণ। এই ছেলেটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে আমাকেই বিপদে ফেলল। মেয়েমানুষের মন তো; কেমন একটা সন্দেহ হলো। ক্রমেই মনে হতে লাগলো ভীষ্মের আত্মত্যাগের কোথায় যেন ফাঁকি আছে। তা মোটেই স্বার্থশূন্য নয়। অঙ্গীকারের পেছনে ভীষ্মের অঙ্ক ছিল অন্যরকম। আর ছিল দূরদর্শিতা।

কথার মধ্যে আমি বললাম: আমারও মনে হয় পিতৃব্য ভীষণ হিসেবী এবং স্বার্থপর।

মনে হওয়ার কিছু নেই। এটাই সত্য। সত্যিই সে স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর বলেই খুব হিসেব করে আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। মহারাজের যে যক্ষ্মারোগ ছিল আমি জানতাম না। যখন জানলাম, মুক্তির পথ তখন বন্ধ। সেই প্রথম মনে হলো দেবব্রত জেনেশুনে এক ঢিলে দুই পাখী মারার মতলব করেছে। আমার শরীরে ঐ মারাত্মক ব্যাধি শুধু সংক্রামিত হবে না। আমাদের সন্তানরাও ঐ ব্যাধিতে নির্বংশ হবে। আর সে মহান আত্মত্যাগের এক আদর্শ পুরুষরূপে চিরদিন মানুষের হৃদয়ের পূজা পেয়ে কুরুরাজ্য শাসন করবে

অনন্তকাল ধরে।

বুকের গভীর থেকে একটা লম্বাশ্বাস উঠে এল সত্যবতীর। নিস্তব্ধ ঘরে তার গভীর শ্বাসপতনের শব্দ শোনা গেল। ভারাক্রান্ত গলায় বলল: ভীষ্মকে কোনদিন বিশ্বাস কর না। ওর জন্যেই আমি পুত্রহীন। পাছে চিত্রাঙ্গদ রাজা হয়, তাই কিশোর পুত্রকে শক্তিশালী গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করল। ভীষ্ম এভাবে তাকে হত্যা না করলেও পারতো। আমাকে জিগ্যেস না করেই বিচিত্রবীর্যকে বিয়ে দেবার জন্যে স্বয়ম্বর সভা থেকে কাশীরাজ কন্যাদের হরণ করে আনল। এ সব না করে তো স্বয়ম্বর সভায় তাকে প্রা.ার্থী করে পাঠাতে পারতো। সেটাই তো নিয়ম। কিন্তু গায়ের জোরে যক্ষারোগাক্রান্ত বিচিত্র-বীর্যের সঙ্গে দুটি নিরীহ কন্যার বিয়ে দিয়ে সে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করল। ভীষ্ম জানত বধূরা কোনদিনই এই অসুস্থ মানুষটার ছায়া মাড়াবে না। যদি কোনভাবে তার সংস্পর্শে আসে তাহলে তাদের সন্তান হবে স্বল্পায়ু। এই বিয়ের ফলে কুরুরাজ্য ও সিংহাসনে উপর তার নিরঙ্কুশ অধিকার ও কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার কোন আশংকা রইল না। লোকে জানল ভীষ্ম কী কর্তব্যপরায়ণ, কী মহান! শান্তনুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্যে রুগ্ন ভাইকেও বিয়ে দিয়েছে। একজন নয়, দুই রাণী তার। ভীষ্মকে কেউ দুষবে না। একদিন তার কপটতায় আমিও ভু লছিলাম।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল: ভীষ্মকে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল। ভীষ্মের কপট অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দেবার দুর্বার সংকল্প নিয়ে বিচিত্রবীর্যের বধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে আহ্বান করলাম। এরকম একটা দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত ভীষ্মের সব হিসেব গণ্ডগোল করে দিল। কিন্তু বিধাতা তার সহায় হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে জন্মান্ধ করল আর পাণ্ডু জন্ম থেকেই পাণ্ডু (জন্ডিস) রোগাক্রান্ত হলো। তাদের জন্মে সিংহাসনের উপর ভীষ্মের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলো না। কেবল দ্বৈপায়নই তার চক্ষুশূল। সিংহা নের রাজা নির্বাচনে দ্বৈপায়নের ভূমিকা তাকে ঈর্ষান্বিত করল। আমার গোপন পরামর্শে দ্বৈপায়ন পাণ্ডুর রাজা হওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করল। এই প্রথম ভীষ্মের হার হলো ভীষ্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রকে বাড়া নার জন্যে দ্বৈপায়ন ভীষ্মের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা না করেই পাণ্ডুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিল। এ বিয়েতে ভীষ্ম খুশি হয়নি। কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, জেহাদ ঘোষণা করতেই যে দ্বৈপায়নকে আমি ডেকেছি, এটা বুঝে রাগটাকে কোনরকমে সংবরণ করে থাকল। নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে বড় বেশি বিপন্নবোধ করতে লাগল। তোমার উপর যে কোনদিন তার চোট এসে পড়বে। তাকে সামাল দেবার মতো বুদ্ধি তোমার আছে। এটুকুই যা ভারসা।

ক.াগুলো শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। কী বলব বুঝতে না পেরে হঠাৎ মাথা নত করে থম‍্মে গলায় বললাম: পিতৃব্য আমাকে শত্রুর চোখে দেখেন। তাঁর কাছ থেকে আমার পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু হারানোর ভয় আছে। কিন্তু হারিয়েও তো মানুষ অনেক কিছু পায়। হরিশ্চন্দ্র রাজার ঐশ্বর্য হারিয়ে সম্রাটের ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন। একেই বলে সত্যিকারে পাওয়া। আপনি আমাকে

সেই আশীর্বাদই করুন।

ছ'যুগ আগের ঘটনা। তবু কি আশ্চর্য! কি বিস্ময়! দাবানলের মাঝখানে বসে আমি সত্যবতীকে দেখছি। তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ঘটনাগুলোকে অনেকবার মনে মনে বিশ্লেষণ করলাম। আধিপত্য আর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে হস্তিনাপুরে ষড়যন্ত্র চলেছে, সেই ষড়যন্ত্রের জাল পাতছে ভীষ্ম অনেককাল ধরে। তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগের পথে অনুগত ও বাধ্য পঞ্চপাণ্ডব সহ যুধিষ্ঠির বাধা হবে আশঙ্কা করেই হস্তিনাপুর থেকে তাদের বিতাড়িত করা দরকার হলো। তাই বারণাবতের যাত্রার ব্যাপারে ভীষ্ম নীরব থেকে কৌরব-পাণ্ডবের বিরুদ্ধে ইন্ধন দিয়েছেন। এভাবেই বিরোধের মধ্যে তাদের টেনে এনে সর্বক্ষণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মশগুল রেখে ভীষ্ম রাজনৈতিক প্রাধান্যকে অটুট রাখলেন।

কিন্তু আমি যে আবার হেরে গেলাম। কোথা থেকে একটা ঢেউ এসে হঠাৎ আমাকে অনেকদূর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এ আমার সহ্য হচ্ছিল না। রাগে, ক্ষোভে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। আমি কেন হেরে যাব? এখন তো আমি একা নই। পাঁচ পুত্রের জননী। হেরে যাওয়াটা যে আমারই লজ্জা। ছাই চাপা আগুনের মতো ভেতরে ভেতরে আমি গুমরে মরছিলাম।

বারণাবতে আমার অবস্থা দ্বীপে বন্দী মানুষের মতো। পালানোর পথ বন্ধ। দুর্যোধনের পাহারাদারদের সদা সন্ধানী চোখ ফাঁকি দিয়ে সত্যি আমার করার কিছু ছিল না। ভেতরটা আমার হাঁফিয়ে উঠল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা। জরাসন্ধের প্রতিপত্তি। তাঁর শরণাগত হওয়া মানে তো আর এক বন্দীত্বকে মেনে নেয়া। মরে গেলেও আমি কারো অধীনতা মেনে নিতে পারব না। আমি চাই সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব এবং সহকর্মীর মর্যাদা। কিন্তু সে সম্মানের কোন যোগ্যতা তো আমার নেই। রাজনীতিতে সবটাই দেয়া নেয়ার ব্যাপার। কিন্তু আমার জমা-খরচের শূন্য খাতায় অন্যদের পাওয়ার মতো আছে কি? রাজনীতির হারজিতের খেলায় বড় জো ঘুঁটি হতে পারি। হেরে গেলে ফেলে দেবে, জিতলে মাথায় তুলে রাখবে। কিন্তু তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। সাফল্যের গৌরব নেই। জেতায় পৌরুষের কদর নেই। শুধু পাঁচ পুত্রের শৌর্য বীর্যের ভরসা করে প্রত্যক্ষ সংঘাতে নামার কথা চিন্তা করা নিছকই পাগলামি এবং মূর্খতা। উপায় শুধু একটা। কৌশল। কৌশলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়।

অবশ্যই; সে কৌশলের প্রথম কথা মুক্তি। বারণাবতে এই যন্ত্রণাময় দিনগুলো থেকে মুক্তির জন্যে অনেক কথাই মনে হলো। কিন্তু কোনটাই গ্রহণযোগ্য হলো না। জনারণ্যে মিশে গিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের শরিক হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সংকট থেকে দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করে শ্রেষ্ঠ মানুষের একটা আলাদা পরিচয় তৈরী করা এবং তার একটা রাজনৈতিক রূপ দেয়া হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। তখনই দেশের নৃপতিরা পাণ্ডবদের একজন মানুষের মতো মানুষ ভাবতে সাহস পাবে। কিন্তু তাতেও ভয় আছে, বাধা আছে। ধার্তরাষ্ট্রেরা টের পেলে হত্যা করবে। সব কিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। সুতরাং এমন কিছু করা

দরকার যাতে ধার্তরাষ্ট্ররা কোন দিন সন্ধান না পায়। এজন্যে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তিকর কিছু একটা করা দরকার।

বেশ বুঝতে পারি, রোজই ভীষণভাবে বদলে যাচ্ছি। এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় আমার ভেতরটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। আমার নিষ্ঠুরতার রূপ বড় ভয়ঙ্কর। আমিও ভয় পাই নিজেকে। চোখ খুলে রাখলে আমি দেখতে পাই পাণ্ডুর সহমৃতা করার জন্যে মাদ্রীকে একদল লোক টেনে হিঁচড়ে চিতায় তোলার চেষ্টা করছে। আর সে গায়ের সব জোর দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। বাঁচার জন্যে কী আকুল কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে বলছে ; তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচতে দাও। ছেলেদের নিয়ে বেঁচে থাকার বড় সাধ গো। তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও। ওদের ফেলে কোথাও যেতে পারব না। দিদি আমায় করুণা কর। বাঁচাও। আমি তোমার ছোট বোন হয়ে থাকব। দাসীর মতো চরণে ঠাঁই দিও। আমাকে তুমি দয়া কর। দয়া করে একটু বাঁচতে দাও।

কিন্তু কী আশ্চর্য। তবু মন গলল না। তার বুক ফাটা কান্নায় আমায় একটু করুণা হলো না। মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সরে যাচ্ছে। ওকে আমি ঈর্ষা করি, ভয় পাই। ওর ভেতর আমার সর্বনাশের ছবি দেখি। আমার পথের কাঁটা সরে যাচ্ছে—আমি কখনো ওর প্রতি সদয় হতে পারি? শত্রুকে মায়া-মমতা করতে নেই। শত্রুকে নির্মূল করা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করা শাস্ত্রীয় নির্দেশ।

জ্বলন্ত চিতায় মাদ্রীর দেহটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সারা গায়ে আগুন, তার মধ্যে মাদ্রী। তার ভীষণ ফর্সা শরীর কালো থেকে কালো হয়ে যাচ্ছে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে বিবশ হয়ে চেয়ে আছি। কত কি ভাবছি? হঠাৎই মনে হলো চিতার আগুনে শুয়ে মাদ্রী চিৎকার করে আমাকে যেন বলল : সহমরণের নাম করে আমায় তুমি খুন করলে? খুন! দারুণ চমকে উঠি! নিরুচ্চারে বলি : খুন করব কেন? তোমার কর্মফলই তোমার সহমরণের জন্য দায়ী। সেজন্য আমাকে খুনী বলছ কেন? তুমি তো স্বেচ্ছায় আমাকে সহমরণে যেতে দাও নি। পাপ, অনুশোচনা থেকে মুক্তি পেতেই পাণ্ডুর সহমৃতা হলে। আমায় অকারণ দুষছ কেন?

মাদ্রী খিল খিল করে হেসে বলল : চমৎকার! এর মধ্যে ভুলে গেলে? পাণ্ডু ভীষণভাবে চেয়েছিল তার নিজের একটা সন্তান হোক। অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের সুচিকিৎসায় তার দেহ মনে নতুন যৌবন এল। আমার রূপ যৌবনে সম্ভোগের প্রবল বাসনা জাগল তার অন্তরে। কিন্তু তুমি তার ইচ্ছেয় বাদ সাধলে। কেন চাইলে, তুমি তা জান। পাছে পাণ্ডুর ঔরসজাত পুত্র সিংহাসনের দাবিদার হয় এই ভয়ে তুমি আমার সন্তান কামনা পূরণ করতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে বরণ করতে বললে।

স্বামীর কথা ভেবে, তোমাকে নিষেধ করা কোন অন্যায় হয়নি আমার? স্ত্রীর কর্তব্য করেছি।

মিথ্যে কথা। আমার গর্ভে যদি পাণ্ডুর পুত্র হয় তা হলে রাজ্য ও সিংহাসনে

তার অগ্রাধিকার থাকবে। যুধিষ্ঠির বঞ্চিত হবে ভেবেই তুমি পাণ্ডুকে পিতা হতে দাও নি।

মাদ্রী আমার ত্যাগের অপব্যাখ্যা করতে তোমার সরম হলো না? তুমি হাসছ। কী ভয়ংকর তোমার হাসি।

দিদি। অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে পৃথক পৃথক ভাবে আহবান করলে আমার দুই পুত্র হয়। তুমি সহ্য করতে পারনি। ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে আমাকে বিশ্বাস ঘাতক, শঠ, প্রতারক বলে গালি গালাজ করেছ। তুমি ভুললেও আমি ভুলোনি। তোমাকে রাগানোর জন্যে বলি: একঘর ছেলে পুলে না হলে সংসার মানায় না। সহদেব নকুলকে পেয়ে মনে হচ্ছে - নতুন জীবন পেয়েছি। বাঁচার একটা মানে খুঁজে পেয়েছি। আরো দু একটি সন্তান আসুক আমার পেটে। এক মানুষের ভেতর অনেকগুলো মানুষ বাস করে। সেই মানুষগুলিকে সব বাবা মা তার সন্তানদের মধ্যে এত বেশি করে চায় বলেই বহু সন্তান কামনা করে। আমার কথা শুনে তুমি আঁৎকে উঠেছিলে। কেন? আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করনি। তুমি ভাবলে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্যেই আমি বহু সন্তান কামনা করছি। তোমায় ভয় পাছে অশ্বিনীকুমার দ্বয় দেবলোকের সাহায্যে হস্তিনাপুর অধিকার করে তার সন্তানদের সিংহাসনে অভিষেক করে তাই আমার নামে অনেক কুৎসা গেয়েছ পাণ্ডুর কাছে। পাণ্ডুর মনকে বিষিয়ে দেয়ার জন্য, আমার প্রতি তাকে বিরূপ করার জন্যে তুমি করনি এমন কাজ নেই। পাণ্ডুর মৃত্যুর জন্যেও দায়ী তুমি। দিনের পর দিন তার দেহ ও মনের যৌবনোচিত চাহিদার বঞ্চনা তাকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। কান্ডজ্ঞানহীন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বর্ব্বরতায় উন্মাদ হয়ে একটা তীব্র দৈহিক সুখের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ একটা অদৃশ্য ভয়ে বেঁচে থাকা সম্পর্কে প্রবল সংশয়ে, আক্ষেপে, ভীরুতায় পাণ্ডুর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। অসম্ভব একটা কষ্টে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সর্বাঙ্গ ভীষণ কাঁপছিল। দম বন্ধ গলায় বলল: কুন্তীর নিষেধ কেন শুনলাম না? তুমি কেন নিবৃত্ত করলে না? এখন কী হবে? মৃত্যুর আলিঙ্গনে চলে যাব? আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর চোখ মেলল না। এই ভয় না দেখালে, পাণ্ডুর কিছুই হতো না। আতঙ্কে, আর আত্মবিশ্বাসের অভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী। তুমি খুনী কুন্তী। ঠাণ্ডা মাথায় দু'দুটো খুন করলে।

এত জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারিত হলো যে, আমি ভয় পেয়ে চমকে উঠলাম। আশ্চর্য! আমি তো তখন বারণাবতের জতুগৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছি। মাদ্রী কোথাও নেই। তার সব অস্তিত্ব মুছে গেছে। তা-হলে এ কার কথা? হয়তো আমার পাপ অনুশোচনার আর্ত মনের গভীর অভ্যন্তরের কথা।

নিঃশব্দে এক আর্তনাদ বুক থেকে উঠে এল লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। অসহায়ের মতো উচ্চারণ করি: তা ঠিক। কিন্তু আমি কী করব? আমার করার কী আছে?

যা হয়ে গেছে তার জন্যে অনুশোচনা করব কেন? ন্যায়—অন্যায়, উচিত অনুচিত নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। রাজনীতিতে অন্যায়, অধর্ম পাপ

বলে কিছু নেই। সাবধানের বিকল্প নেই। সেজন্যে সিদ্ধান্ত নিতে যদি ভুলও হয় তা করা উচিত। ভুলের জন্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভুলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। এ সব শাস্ত্রীয় নির্দেশ। সংকটের সময় কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে পারা জরুরী নিষ্ঠুর হলেও যে সেটা নিতে না পারে, তাকে পরে পস্তাতে হয়। কথাগুলো আমার কানে কানে কে যেন শুনিয়ে গেল।

মাদ্রী তেরো বছর আগে সহমৃতা হয়েছিল। হঠাৎ সে কথাটা মনে হওয়ার তাৎপর্য কি? বারণাবতে বাস করার সঙ্গে তো তার কোন যোগসূত্র নেই। এত ঘটনা থাকতে সেই কথাটা মনে এল কেন? এর তো একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। সেই সূত্রটা কি? হয়তো মনই এরকম কোন নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে বলছে আমাকে।

কোন পথ ধরে অদৃষ্ট নিঃশব্দে মানুষের হাত ধরে তার গন্তব্যস্থানে পৌছে দেয় মানুষ নিজেও তা জানে না। আমার ক্ষেত্রে অদৃষ্ট এল এক নিষাদ রমণীর রূপ ধরে। পাঁচ পুত্র নিয়ে নিষাদ রমনী রোজই জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে যায়। রোজ দেখা হয়। তবু ওর কথাটা মনে হয়নি কখনো। ছাদ থেকে নিচের দিকে তাকাতে ওকে দেখলাম পাঁচ পুত্রের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমি মাতা পুত্রদের দেখছিলাম না। দেখছি, আমার চোখের উপর জতুগৃহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সারা গায়ে আগুন মেখে নিষাদ রমণী পাঁচ পুত্রের সঙ্গে ছোটাছুটি করছে। তাদের কালো রঙ পোড়া কয়লার মতো কালো থেকে কালো হয়ে যাচ্ছে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে। মাথার মধ্যে আমার বিদ্যুৎ খেলে গেল। পৃথিবীর আর কোন রমণী এবং পুত্রকে নয়, ঐ নিষাদ রমণী এবং তার পাঁচ পুত্রকে আমি চাই, পুরোপুরি চাই!

এসব সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার পথে আমার মেধা বিদ্যুতের মতো জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। এক নিষ্ঠুর আনন্দে, অমানবিক নৃশংসতায় আমার ভেতরটা নেচে উঠল। পাণ্ডবদের জীবিত থাকা নিয়ে বিভ্রান্তির এক সুন্দর নাটক তৈরী হয় এদের দিয়ে। ভস্মীভূত জতুগৃহের ভস্মস্তূপ থেকে ছটি দগ্ধ বিকৃত দেহ উদ্ধার হলে লোকে জানবে পাণ্ডবেরা আর জীবিত নেই। দুর্যোধন নিন্দিত হবে: ধৃতরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হবে। পিতৃব্য ভীষ্মের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের কৌশলটি কেন্দ্রচ্যুত হবে। এক লহমায় এত সব কথা মনে হলো। পরিচারিকা পাঠিয়ে নিষাদ রমণীকে ডেকে আনি।

গড় হয়ে প্রণাম করে বলল: মা, আমায় ডেকেছ? কিছু আদেশ করবে?

নিরাবেগ চিত্তে বললাম: হাঁ বাছা। পাঁচপুত্রদের সঙ্গে যখন জঙ্গলে যাও তখন তোমার মধ্যে আমি নিজেকে দেখি। তোমার পাঁচ পুত্র পঞ্চপাণ্ডর হয়ে যায়।

মার অশেষ কৃপা। কার সাথে কার তুলনা করছ?

কাল, ছেলেদের নিয়ে তুমি আমার এখানে রাতে খাবে এবং থাকবে।

কেন মা?

ব্রত পালনের নিয়ম। যে রমণী পাঁচ পুত্রের জননী হয় এই ব্রতে সন্তানদের সঙ্গে তাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে এবং তাদের সঙ্গে একরাত কাটাতে হয়।

তাই আর কি?

মা, এত আমাদের পরম সৌভাগ্য। ছেলেরা শুনলে আনন্দে আটখানা হবে।

খুশি হয়ে ও চলে গেল। আমার খুব ভালো লাগতে থাকে। নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে এরকম এক তীব্র আনন্দ লুকোনো আছে জানতাম না। আমার অধরে বঙ্কিম হাসি ফুটল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলি, যাদের নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তাদের জন্যে অনেক নিরীহ মানুষের আত্মবলি দিতে হয়। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। সব যুগেই সাধারণ নাগরিকের রক্তে লেখা হয় ইতিহাস স্রষ্টার বিজয় কাহিনী। এই নিষাদ রমণীর আত্মাহুতি পাণ্ডবদের বিজয়কাহিনীর পৃষ্ঠায় তেমনি জ্বল জ্বল করবে অনন্তকাল ধরে।

মানুষ তার সব ব্যাপারেই একটা অলৌকিক কিছু আশা করতে ভালোবাসে। মনে মনে আশার একটা সৌধও গড়ে তোলে। কিন্তু কোন কারণে সে সৌধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেলে অনেকে অদৃষ্টের লিখন বলে সহজে মানিয়ে নেয়। কিন্তু যারা তা পারে না, পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করে চলতে চায় তাদের হয় যত বিপদ। তারা নিজেকেও ক্ষমা করে না, পারিপার্শ্বিককেও না। এর ফলে শুরু হয় তার জীবনে এক নতুন সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষ নিজের সঙ্গে নিজের যেমন, আবার নিজের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর এক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পারিপার্শ্বিক যখন তার উপর প্রতিশোধ নিতে আসে তখন সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কখনও ধ্বংস হয়ে যায়, কখনও কখনও ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ী আসন রেখে যায়? কিন্তু সেগুলো যে মূল্য দিতে হয় তাকে তা সইবার মতো শক্তি, সামর্থ্য, মনোবল ক'জনের আছে? ইতিহাস কতটুকু তার দাম দেয় কে জানে? তার যা দাম মানুষের সংসারই দেয়। কবিই কেবল তার জন্য গর্ব অনুভব করে, সমবেদনা দেখাতে দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলে। কাব্যের পাতায় এক ফোঁটা চোখের জলের এই মূল্য কি কম!

বুকে প্রতিহিংসা, মনে অধিকার পুনরুদ্ধারের শপথ নিয়ে আমি পুত্রদের হাত ধরে মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ চলে গেছে সেই পথে অবিরাম এগিয়ে চলেছি আলোকিত প্রান্তরের দিকে। বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে আমাদের কিছু নেই। আমরা আমাদের যাত্রাপথে এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীদল।

দিনের পর দিন পুত্রদের নিয়ে চলেছি। নিয়তির এক অমোঘ আকর্ষণে।

কী ভালোই না লাগছিল! বনভূমি জুড়ে আছে কত অবাক বিস্ময়।

কত শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য, অনাঘ্রাত, অশ্রুত অদেখা। এর আগেও বনভূমি দেখেছি,—এতবার করে আর এতরকম করে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে দেখেছি—তবুও আশ মেটে না চোখের। বড় নতুন আর অচেনা মনে হয়।

হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে উঠি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। নিবিড় ঝোপ-ঝাড়ের লতাপাতায় জড়াজড়ির মধ্যে এসে দাঁড়াল একপাল হরিণ। অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তারা নবাগত অতিথিদের অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তারপর কি ভেবে চকিতে সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্যে দৌড়ে চলে গেল।

এক জায়গায় আমরা অধিকদিন কাটাইনি। নবাগতদের সম্পর্কে কোন আগ্রহ, কৌতূহল কিংবা সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার আগেই স্থানত্যাগ করে চলেছি। যাযাবরের মতো এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় গেছি। ফলে, অল্প সময়ের ভেতর কত জায়গা, কত নগর, রাজধানী, গ্রাম, অরণ্য আমরা ঘুরে ফেলেছি। মাঝে মাঝে ছেলেদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়। তাদের কোনো ভবিষ্যৎ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি না। মন খারাপ হয়ে যায়। আমার মন্দ কপালের জন্যে ওদের কত দুর্ভোগ! অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গভীর দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল তা গভীর হতাশায় মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয়। তবে কি হেরে যাওয়াই আমার অদৃষ্টের লিখন?

পর্বতের চড়াই উতরাই ভেঙে ত্রিগর্ত দেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় হেঁকে বলল: দাঁড়াও পাণ্ডু মহিষী। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কোথায় চলেছে তোমরা?

বুনো মহিষের মতো বলিষ্ঠ দুই পায়ের প্রবল চাপে জঙ্গল মাড়িয়ে নির্ভয়ে পঞ্চপাণ্ডবের সামনে দাঁড়াল। মিশকালো গায়ের রঙ। শালতরুর মতো যেমন দীর্ঘ তেমনি পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারা। কোথাও এতটুকু বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। কালো পাথর কুঁদে কুঁদে তৈরী যেন বলদর্পী মানুষটি। পাথরের একটা চাঙরার উপর পা রেখে পঞ্চপাণ্ডবকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আত্মপরিচয় দিয়ে দর্পভরে বলল, আমি এই অরণ্যের অধিপতি হিড়িম্ব। ভীম-অর্জুনকে আমি ভালোভাবেই চিনি। একলব্যের গুরুদক্ষিণা অনুষ্ঠানে তোমাদের দেখেছি। চিনতে ভুল করার মতো দুর্বল স্মৃতি আমার নয়।

হিড়িম্বার কথা শুনে আমার ভেতরটা চমকে গেল। যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, কণ্ঠস্বরে সব সাহসটুকু উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বলি: বাছা, তুমি ভুল করছ। আমরা তীর্থযাত্রী। মানুষের মতো মানুষ দেখতে হয় বৈকি!

হিড়িম্ব আমার কপট অভিনয়ে অখুশি হয়ে রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল: ও রত্ন লুকোনোর নয়। জঙ্গলের মানুষের চোখ বাঘের মতো। শিকার চিনতে ভুল করে না।

ভয়ে বুক কাঁপছিল। পাছে আমাদের পরিচয় জেনে ফেলে তাই কাকুতি-মিনতি করে বললাম: বাছা! আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলব কোন দুঃখে? তুমি যাদের নাম করলে এ তল্লাটে ও নামে কেউ আছে বলে

শুনিনি। ওরা বুঝি খুব খারাপ লোক? ওরা কারা বাপু।

হিড়িম্ব মুখ খুব বিকৃত করে মুলোর মতো দুপাটি সাদা দাঁত বের করে ভেংচিকেটে বলল: ন্যাকা! দুর্যোধনকে বোকা বানানো যায়, কিন্তু আমাকে যায় না। জতুগৃহে তোমরা কেউ পুড়ে মরনি। কিন্তু ভস্মস্তূপে ছটি মানুষের পোড়া শব এল কোথা থেকে? কাজটা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেই করেছ। কিন্তু লোকগুলো নিশ্চয়ই খেতে না পাওয়া নিষাদ, শবর পরিবারের কেউ?

হিড়িম্বর কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেল। ভয়ে হতভম্ব হয়ে ভীমের দিকে তাকাই। ওকে আমার বড় ভয়। অল্পে মাথা গরম করে বসে। চোখের ইশারায় শান্ত সংযত হতে বলি। বিপদে আমি বিচলিত হই না। শান্ত এবং সতর্ক থাকার এক আশ্চর্য সংযম আমাকে অন্য মানুষ করে দেয়।

হিড়িম্ব রুক্ষ গলায় বলল: তোমরা বিদেশী। বহিরাগত। আমার রাজ্যে অবাঞ্ছিত অতিথি। তোমাদের কার্যকলাপ সন্দেহজনক। উদ্দেশ্য তোমাদের ভালো নয়। তোমরা আমার বন্দী।

যুধিষ্ঠির অবাক গলায় বলল: আমাদের অপরাধ! সহায়হীন, সম্বলহীন, আশ্রয়হীন সামান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে তো আপনার মতো বীর পুঙ্গবের ভয় পাওয়ার কথা নয়। আমরা বন্দী হলে আপনার অপযশ হবে। কয়েকজন পরিব্রাজককে যে ভয় পায় তার মতো ভীরু দুর্বল কেউ হয় না। শত্রুরা একথা জানলে আপনার সমূহ ক্ষতি হবে। আপনার দুর্বলতা জানা-জানি হয়ে যাবে। একজন নিঃস্বার্থ হিতার্থীর মতো একথাগুলো বলা কি খুব দোষের?

হিড়িম্ব জোর দিয়ে বলল: তোমরা পরিব্রাজক নও। নতুন কোন রাজনৈতিক আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়েছ।

যুধিষ্ঠির বলল: রাজা আপদ্‌কালে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। মিথ্যে সন্দেহ করে আপনি নিজের ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। এতে আপনারই ক্ষতি। আমাদের কিছু নেই. শত্রু ভেবে হত্যা করলে কিছুই হারাব না আমরা। কিন্তু আপনি হারাবেন বিশ্বাস, আনুগত্য, নিরাপত্তা।

হিড়িম্ব বলল: তোমার কথাগুলো যুধিষ্ঠিরের মতো।

রাজা, সন্দেহ একবার হলে যায় না সহজে।

যুধিষ্ঠিরের কথার ভেতরে বললাম: তর্ক করে লাভ নেই। আমাদের বন্দী করলে যদি নিরাপদ মনে হয়, তাহলে বন্দী করুন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। চলতে চলতে হঠাৎ এ কোন বাধা পথ আগলে দাঁড়াল: এমনই এক বাধা যে, মনে হলো সামনে চলার পথ বুঝি নেই। আমরা ঠিক বন্দীর মতো ছিলাম না। নজরবন্দী হয়েছিলাম। পালানোর পথ খোলা ছিল না। ভগিনী হিড়িম্বার উপর দেখাশোনার ভার ছিল। ভীমকে তার ভালো লেগে গেল। ভীমকে প্রেমাস্পদ করে একান্ত নিজের করে পেতে চাইল। মনে হলো মুক্তি যেন হিড়িম্বার রূপ ধরে এসেছে। তাকে কোনভাবেই ফিরিয়ে দেয়া চলবে না। সকলের কথা ভেবেই

হিড়িম্বার প্রণয় স্বীকার করে নিল ভীম। হিড়িম্বা ও ভীমের প্রণয়টা গোপন রইল না। হিড়িম্ব চায় না ভগিনীর সঙ্গে ভীম মেলামেশা করুক। ভীমকে হত্যা করার জন্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। সেই ভয়ংকর দ্বৈতযুদ্ধে হিড়িম্ব প্রাণ হারাল। হিড়িম্বর রাজ্য সম্পদ ঐশ্বর্য আমাদের হলো। আশ্রয়হীন, সহায়হীন পাণ্ডবেরা পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মাটি পেল। স্বজনহীনতার অভাব দূর হলো। নতুন বান্ধব পেল। লোকবল বাহুবল, লাভ হলো।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আটকা পড়ে থাকব বলে তো পথে বেরোয়নি। জীবনের কোন একটা মানে যদি থাকে তো সে মানেটা হলো হস্তিনাপুরে নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করা। প্রতিশোধ নেয়া। এই পরিপূর্ণতা পাওয়াটাই আমার আসল পাওয়া। কিন্তু যা পেলাম তা যত নগণ্য হোক না কেন, তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। জীবনের কোন পাওয়াই ছোট নয়। ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিয়ে দিয়ে তাকে বধূর মর্যাদা দিয়ে অনার্যকুলের চিত্ত জয় করে নিলাম। অরণ্য আমার নিরাপদ আশ্রয় হলো। সহায় হলো। হিড়িম্বাকে তার ভ্রাতার রাজ্যের অধিশ্বরী করে দিয়ে আবার পাঁচ পুত্রের হাত ধরে পথ চলা শুরু হলো।

কিন্তু কোথায় বা যাব? আমার তো কোন ঘর নেই, আশ্রয় নেই। ভাবলে, সারা পৃথিবীটাই আমার ঘর। আমার সংসার। আমি এর সম্রাজ্ঞী। এ দুনিয়ার কত অসংখ্য মানুষের জীবন দেখতে পেয়েছি। আমার এই এক জীবনের উপর কত অসংখ্য মানুষের জীবনের যে ছায়া পড়েছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এক এক সময় ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের রাজ্য হস্তিনাপুর ত্যাগ করেছিলাম, যে স্বপ্ন নিয়ে বারণাবতের জতুগৃহে নিষাদ রমণী সহ পাঁচ পুত্রকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছি, সে উদ্দেশ্য কী সার্থক্য হয়েছে? এক-চক্রানগর'তে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে পড়ে থাকার জন্যে কি আমি এত কষ্ট স্বীকার করছি? নিঃসহায় দরিদ্র, মানুষগুলোর দুঃখ সংকট প্রতিকারের জন্য যে পাণ্ডবেরা এত করল তারা কি তাদের দাবি পূরণের যোগ্য হয়েছে? পাণ্ডবদের কোন কাজে লাগবে কি?

এই প্রশ্নটা আমার কাছে খুব বড় হলো। কারণ তখনও আমার চোখের সামনে

ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। শুধু ছিল একটা অতীত। সে অতীতটা ছিল এত ভয়ানক যে তা স্মরণ করতেও লজ্জা হতো, ঘেন্না করত। পায়ের তলা থেকে মাটিটা পর্যন্ত সরে গেছি। হতাশায়, ব্যর্থতায় আত্মঘাতী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বুকে আশার দীপটা মিট্ মিট করে জ্বলছিল। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি ভবিষ্যৎ তারই থাকে যার আশা থাকে। এখনও আমি আশা করি, স্বপ্ন দেখি। প্রবল প্রতাপান্বিত রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব এবং বকের মতো আরো যারা আছে তাদের দমন, পীড়ন, শোষণ অত্যাচার থেকে অগণিত সাধারণ মানুষদের উদ্ধার করতে গিয়ে যদি একের পর এক তাদের রাজ্যগুলি দখল করি তা-হলে ঐসব মুক্ত মানুষদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং আনুগত্য সহজেই আমরা পাব। এভাবেই একদিন অরণ্য অধ্যুষিত বিশাল দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হয়ে হস্তিনাপুর অভিযান করা আমার কোন আকাশ কুসুম কল্পনা নয়।

কিন্তু তবু কেমন যেন নিজের শক্তির উপর সন্দেহ হয়। আর সেই সময় একজন পুরানো মানুষের মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনি মহর্ষি দ্বৈপায়ন। হস্তিনাপুর তাঁর শরীর রক্তের মতো প্রিয় ছিল। একচক্রানগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তখন বাস করছি। হঠাৎ মহর্ষি সেখানে উপস্থিত হলেন। সংকটে পড়ে যখনই এই অদ্ভূত মানুষটার অভাব বোধ করি, ভীষণভাবে চিন্তা করি ঠিক তখনই এসে উপস্থিত হন। কী করে যে আমার মনের কথাটা টের পান তিনি জানেন।

অবাক মুগ্ধতায় তাঁর স্বপ্নালু দুই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ে। অভিভূত গলায় বলি: আমাকে বাঁচালেন মহর্ষি। ক'দিন ধরে শুধু আপনার কথাই ভাবছি। কিছু ভালো লাগছে না। বড় দিশেহারা লাগছে। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

মহর্ষি বললেন ঃ কল্যাণী! তুমি যেভাবে চলেছ তা ঠিক হচ্ছে না। পথের কী শেষ আছে জননী? সারা জীবন ধরে চললেও পথ শেষ হয় না। তোমার এ লক্ষ্যহীন চলার কোন দাম নেই। তুমি উদ্যমের অপচয় করছ। আত্মপ্রকাশ ভয়ে ভীত সংকুচিত বলেই তোমার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছ না। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-সংকটের প্রতিকার করে বড় জো একজন মহামানব হওয়া যায় কিন্তু রাজনীতিক হওয়া যায় না। যে কোন ঐশ্বর্যে, সম্পদে, সমৃদ্ধশালী শক্তিশালী বৃহৎ রাজ্যের রাজনৈতিক সহায়তা এবং আশ্রয় ছাড়া তোমরা কোন কালে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। ছ'মাস ধরে বনে বনে ঘুরে নিজেদের পরিচয় গোপন করে—কী পেয়েছ? যা দিয়ে তোমরা প্রতিশোধ নিতে পার? একটা হিড়িম্ব, একটা বক রাক্ষসকে হত্যা করে হস্তিনাপুরে পৌছতে অনন্তকাল লেগে যাবে। কিন্তু রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের মূল্য কি? তারা তোমাকে কি দিতে পারে? এসব বিচার করে দেখার সময় হয়েছে। সময়ের বৃথা অপব্যয় অনেক হয়েছে। এবার কী করলে রাজনৈতিক ফয়দা তোলা যায় তার কোন ভাবনা মাথায় আছে? তোমাদের কার্যকলাপে বিদুরও বিরক্ত এবং চিন্তিত। বিদুর তোমাদের সব খবরই রাখে। গোপনে তোমাদের নিরাপত্তার উপর নজরও রেখেছে সে।

বিদুরের কথায় এই বয়সেও লজ্জায় মুখ রাঙা হলো। সত্যি এই মানুষটার কাছে পাণ্ডবদের চেয়ে প্রিয়তর আর কিছু নেই। তার শরীরের রক্তের মতোই প্রিয় তারা। নিজের চিত্ত চাঞ্চল্য সামলে নিতে কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকি। আঙুল দিয়ে কাপড়ের প্রান্ত জড়াতে জড়াতে বলি ঃ কী যে করতে চাই, আমিও ভালো করে জানি না। দুরন্ত অস্থিরতায় আমি দিশেহারা। আপনিই বলে দিন কী করলে ভালো হয়? জ্ঞান হওয়া থেকে সংগ্রাম করছি। সে সংগ্রাম এখনও পর্যন্ত থেমে নেই। বারে বারে সংগ্রামকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর একটা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি। সংগ্রাম তো শুধু বাইরের সঙ্গে হয় না। নিজের সঙ্গে এবং চারপাশের জগতের সঙ্গে অহরহ সংগ্রামে সত্যিই ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত। শুধু হেরে যেতে চাই না বলেই নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছি। বড় একা লাগে।

দ্বৈপায়নের অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন ঃ তোমার মতো মানুষদের হয়তো সে অর্থে কেউই থাকে না। কেউ থাকার জন্যে তোমার মতো মানুষদের হয়তো জন্মই হয় না। কেউ যদি থাকে তা-হলে মানুষের মুক্তি, নিজের মুক্তি কী করে আসবে? কী করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হয় তোমার সে রকম যদি কেউ থাকতো তা হলে পৃথিবীর চলার গতি স্তব্ধ হতো।

লজ্জা পেয়ে বলি ঃ অমনি করে বলে আমার আমাকে লজ্জা দেবেন না। সত্যি আমার কেউ নেই একথা ভাবতেও ভয় করে। আমি একা কোথায়? এইতো আপনি আছেন, দেবর বিদুর ছায়ার মতো আছে, পুত্রেরা আছে বলেই তো মনে জোর পাই, বুকে ভরসা পাই। নইলে, আমার সাধ্য কী এত বড় একটা প্রতিশোধ একা একা নেয়ার। বরং বলা ভালো একটা বিরাট অন্যায়, অধর্মের প্রতিবাদ করার জন্যে আমরা সবাই এক মঞ্চে মিলিত হয়েছি। সেই তো আমাদের শক্তি।

মহর্ষির মুখে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি। দুই চোখের নিবিড় চাহনিতে এমন একটা বিভোর বিহ্বলতা ছিল যে তাঁর মুখের এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল। মৃদুস্বরে বলল ঃ শোন কল্যাণী, অনার্য রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করে তুমি যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কৌশল নিয়েছ তা বাস্তবোচিত হয়নি। দূরদর্শিতার অভাব হেতু পরে জটিলতা উদ্ভব হবে। তুমি তো জান সুর লোকের দেবতারা এবং আর্যাবর্তের আর্যরা এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্য রাজন্যবর্গকে প্রীতির চোখে দেখে না। তাদের সঙ্গে এদের উভয়ের বৈরীতার সম্পর্ক। এ অবস্থায় তাদের নিয়ে কিছু করতে চেষ্টা করলে এক মহা অনর্থের সূত্রপাত হবে। অকারণ রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনায় আসমুদ্র ভারতভূমি উত্তাল হয়ে উঠবে। দেবতা এবং আর্যরা শত্রুতা ভুলে একত্রে অনার্যশক্তি নিধনে মেতে উঠবে। তাতে অনার্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরাও বিপন্ন বোধ করবে। এই আত্মঘাতী মৈত্রী বন্ধন থেকে অচিরে তোমাদের সরে আসা দরকার।

আমার মাথা বন বন করে ঘুরতে লাগল। ভেতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাঁর দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে থেকে বলি ঃ

মহর্ষি, সে কথা যে একবারও আমি ভাবিনি তা নয়। কিন্তু নিঃসহায় পাণ্ডবদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ ছাড়া কিবা করতে পারে তারা ?

মহর্ষির অধরে স্মিত হাসি। দুচোখের তারায় রহস্যের দ্যুতি উজ্জ্বল করল তাঁর মুখমণ্ডল। স্নেহ মধুর কন্ঠে বলল : কিন্তু মা, গোড়ায় গলদ করে বসে আছ। পাঁচপুত্র সহ নিষাদ রমণীকে পুড়িয়ে মেরে তোমাদের আত্মগোপনের ধাপ্পাটা খুব কাঁচা কাজ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের লোকের চোখে তোমরা মৃত। কিন্তু তোমরা যে সত্যি তা নও, এই কথাটা প্রমাণ করা এবং তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা খুব শক্ত কাজ। মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি আগেও করেছ তুমি। এবারেও করলে! কিন্তু এবার জেতাটা খুব কঠিন। জতুগৃহ দাহে তোমরা কেউ মারা যাওনি একথাটা প্রমাণ করার কোন উপায় চিন্তা করেছ ?

বিব্রতবোধ করি। জবাব দেবার মতো উত্তর খুঁজে পাই না। হঠাৎই কে যেন কথাটা আমার মুখে যুগিয়ে দিল। বললাম : মহর্ষি! সত্যিই কিছু ভাবিনি। সমস্যা যিনি সৃষ্টি করেছেন, উদ্ধারের রাস্তা তিনিই দেখবেন। আমি তো নিমিত্ত। এখন মনে হচ্ছে পরিত্রাতার রূপ ধরে আপনি এসেছেন আমাকে পথ দেখাতে।

দ্বৈপায়ন সহসা হেসে ফেললেন। রসিকতা করে বললেন : তোমার উদ্ধার কর্তাই বোধহয় মৃতকে জীবিত করার এক আশ্চর্য কৌশল তোমার অগোচরেই ছক রেখেছেন অনেক কাল আগে। কবে জান ? আচার্য দ্রোণের গুরুদক্ষিণা দিতে মহারাজ দ্রুপদকে বন্দী করে যেদিন অর্জুন গুরুকে উপহাব দিল সেই দিনেই ছকা হয়েছিল। বোবা বিস্ময় নিয়ে বললাম : মহর্ষি, আপনার হেঁয়ালীর মর্মোদ্ধার করা আমার কর্ম নয়। অনুগ্রহ করে আপনি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

দ্রুপদ ও দ্রোণ বন্ধু হয়েও পরস্পরের শত্রু। দ্রোণের অপমানের প্রতিশোধ নিতে দ্রুপদ তাঁর প্রিয় শিষ্যকেই দ্রোণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চান। তাই কন্যা পাঞ্চালীকে বীর্যশুল্কা করার জন্যে স্বরম্বর সভা করছেন। তৃতীয় পাণ্ডব অবশ্যই স্বরম্বরের প্রার্থী হবে। স্বরম্বর সভায় পাত্রীর স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা কিছুমাত্র নেই। বীর্যশুল্কা কন্যাকে লাভ করার জন্যে যিনিই অদ্ভুত পণ পূরণে সমর্থ হবেন তিনিই দ্রৌপদীর স্বামী হবেন। আশার কথা অর্জুনের কৃতিত্ব, পারদর্শিতা এবং শৌর্য বীর্যের কথা মাথায় রেখেই মহারাজ দ্রুপদ প্রতিযোগী প্রার্থীদের জন্যে এক বিশেষ ধরণের যান্ত্রিক ধনু এবং লক্ষ্যবস্তু নির্মাণ করেছেন। সভায় ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। বহুদেশের প্রতিযোগী প্রার্থী রূপে রাজপুত্র এবং নরপতিরা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন, বণিক, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং শীর্ষস্থানীয় মুনি, ঋষি এবং বহু রাজপ্রতিনিধি। ঠিক করা হয়েছে স্বয়ম্বর সভায় একে একে প্রার্থীরা অকৃতকার্য হয়ে যখন নিজ নিজ আসনে ফিরে এসে হৈ চৈ বাঁধাবে তখন অর্জুন প্রার্থী হয়ে সভায় প্রবেশ করে সকলকে লক্ষ্যভেদ করে চমকে দেবে। তাঁদের সবার সামনে অর্জুনের এই আত্মপ্রকাশ জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যু সম্পর্কে জমানো রহস্যের যবনিকাপাত করবে। লক্ষ্যভেদের কৃত-

কার্যের সূত্রে তৃতীয় পাণ্ডবের কথাই সর্বাগ্রে সবার মনে হবে। জতুগৃহে পাণ্ডবেরা যে নিহত হয়নি, তারা বেঁচে আছে এই সত্যটা সারা ভারতবর্ষের মানুষ স্বরম্বর সভায় জেনে যাবে। ধৃতরাষ্ট্রের লুকোচুরি করার তখন কিছু থাকবে না। তা-ছাড়া পাণ্ডবদের রহস্যময় আত্মগোপন সম্পর্কে তাঁদের মনে যে সব প্রশ্ন উদয় হবে তা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডব বিরূপতার নজির হয়ে তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। বঞ্চনা থেকে পাণ্ডবেরা মুক্ত হবে। একসঙ্গে রাজকন্যা এবং রাজত্ব পাবে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি জুটতে পারে।

মহর্ষির কথা শুনে আমি তো অবাক। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখে কোন কথা যোগাল না। আশ্চর্য লাগছিল, কেনে রন্ধ্রপথ ধরে নিয়তি আসে বন্ধুরূপে মানুষ তা অনুমানও করতে পারে না। পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই নিয়তি এল দ্রৌপদীর রূপ ধরে, মহর্ষি দ্বৈপায়নের অনুকম্পার রন্ধ্র দিয়ে!

ঈশ্বর আমাকে আরো একবার নিষ্ঠুর হওয়ার শাস্তি দিল। এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা করতে আমাকে নির্দয় হতে বলল। দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রের ভার্যা হোক এরকম কোন ঘোষণা সত্যি আমি করতে চাইনি। সেরকম কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। জীবনে কিছু কিছু ঘটনা এত অতর্কিতে এবং দ্রুত ঘটে যায় যে, তার উপর মানুষের কোন হাত থাকে না। কিন্তু দোষের ভাগী তো তাকেই হতে হয়।

বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীর নিয়তি পঞ্চপাণ্ডবের রূপ ধরে আমার মুখ দিয়ে অদৃষ্টের ফরমানটা জারি করে নিল। মেয়ে মানুষের জীবনে এ যে কত বড় শাস্তি আমার চেয়ে বেশি কে তা জানে? দ্রৌপদীর জন্যে আমায় দুঃখ্যু হয়, অনুশোচনা হয়। নিজেকে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। সত্যিই আমি ভীষণ স্বার্থপর। শুধু নিজের কথা, সন্তানদের স্বার্থের কথা, ভেবেছি। দ্রৌপদীর মনের দিকে তাকাই নি। তার ইচ্ছে অনিচ্ছে কিংবা মেনে নেয়ার কথাটা একবারও মনে হয়নি। পাঁচ ভাইর প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, আনুগত্য, বিশ্বাস, সহযোগিতা, ঐক্য, সংহতির এক মালা গেঁথে দ্রৌপদীর কণ্ঠে আমি পরিয়ে দিলাম যেন। দ্রৌপদী তাদের জীবনে একমাত্র বন্ধন হয়ে রইল। সে বন্ধন কেউ এড়াতে গেলে দ্রৌপদী তাকে হাত বাড়িয়ে ডেকে নেবে। তার নিজের বন্ধনটুকু কখনও আলগা হতো দেবে না। সে আকর্ষণী ক্ষমতা তার আছে।

ঐ আকর্ষণই তার নিয়তি। তার মোহিনী আকর্ষণ যুধিষ্ঠিরের মতো

জিতেন্দ্রিয় ছেলের চিত্তও বিচলিত করেছে। নির্লজ্জের মতো বাসনার কথা বলতে তার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপেনি। স্বয়ম্বর সভা থেকে ফিরে এসেই অকপটে বলল: মা, সত্য গোপন না করে অকপটে বলছি, দ্রৌপদীতে চিত্ত আসক্ত হয়েছে।

সবিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠি যুধিষ্ঠির!

মা, জীবমাত্রেই প্রবৃত্তির বশ। প্রবৃত্তিবেগের কাছে ছোট বড়, আত্মীয়, ভ্রাতা সুশ্রী, কুশ্রী সমাজ, সংস্কৃতি, নীতি, ধর্ম বলে কিছু নেই। সেখানে মানুষে পশুতে তফাৎ নেই।

ঘৃণায় আমার মন ছিঃ ছিঃ করল। পুত্রদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ও নৈতিক অধঃপতন দেখে সুদীর্ঘকালের গর্ব অহঙ্কার তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। নিজেকে বড় অসহায় লাগল। রাগে ঘেন্নায় অপমানে আমার কান্না পেল। বললাম: তোমার কাছ থেকে এরকম জঘন্য প্রস্তাব শুনব কোনকালে প্রত্যাশা করিনি। তোমার মুখ দর্শন করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। ঘেন্নায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

মা, রাগ করে একজনকে তাড়িয়ে দেয়া সহজ কিন্তু তাতে আত্মবিনষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবে না। জিতেন্দ্রিয় ঋষি, মুনির শরীর পর্যন্ত শাসন সংযমের বাঁধ ভেঙে বর্বর হয়ে উঠে। কাম খারাপ কিছু নয়। কাম হচ্ছে শারীরিক সুস্থতার লক্ষণ, প্রসন্ন জীবনী শক্তির উৎস। কেন জান? বিশ্বপৃথিবীর মূলে রয়েছে মিলন স্পৃহা। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনিও মিলনে উৎসুক। নিজেকে দ্বিধা ভক্ত করে তিনি আনন্দ রস পান করলেন। এটাই প্রকৃতির ধর্ম। পাণ্ডবেরা তো বিশ্বনিয়মের বাইরে নয়।

উদ্গত অভিমান বুকে নিয়ে বললাম: পশুর কোন সমাজ নেই। সেখানে যা খুশি চলে। কিন্তু মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড় বলেই চিত্তকে সংযত রাখার জন্যে নিয়ম নীতির অনুশাসনের পাকে পাকে ফেরে ফেরে নিজেকে বেঁধেছে। তা-ছাড়া, আপন ভ্রাতার জয়লব্ধা স্ত্রীকে ভোগ্য বস্তুর মতো পাঁচজনে মিলে ভোগ করার এই নির্লজ্জ বাসনা মেয়ে হয়ে আমি মেনে নিতে পারি না। শুধু তোমাদের নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে বর্বর যুগে ফিরে যাব না।

মা, পশুকে শৃঙ্খলিত করে রাখলে ক্রোধে, ক্ষোভে গজরাতে থাকে। শৃঙ্খল তাকে হিংস্র করে তোলে। মরিয়া হয়ে শিকল কেটে যেদিন বেরিয়ে পড়ে সেদিন দুর্দিন। তেমনি অতৃপ্ত বাসনা ও কামনার বিক্ষোভ পাণ্ডবদের স্বস্তিতে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। ঘৃণা—বিদ্বেষ, অসন্তোষ বিদ্রোহের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করবে বিরূপ হৃদয়কে। হৃদয়ের সঙ্গে ছলনা করলে মহা অনর্থ ঘটবে। পঞ্চপাণ্ডবের ক্ষতি হবে। আত্মক্ষয় থেকে পাণ্ডবদের শৌর্য বীর্য, ঐক্যকে রক্ষা করতেই একান্নভুক্ত ভাইদের সঙ্গে দ্রৌপদীর সম্পর্ক অভিন্ন হওয়া দরকার।

আমি বিভ্রান্ত। দ্রৌপদীর মোহিনী আকর্ষণী শক্তি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যে একটি সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করবে এ কেবল তারই পূর্বাভাস। সুন্দ-উপসুন্দের অভিন্ন ভ্রাতৃপ্রেমের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না।

পাণ্ডবদের মতোই ভাগাভাগির কোন স্থান ছিল না। তিলোত্তমা তাদের জীবনে ঝড়ের বার্তা বহন করে আনল। বিবাদ বিভেদ বৈরীতায় দুই ভাই ধ্বংস হলো। আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠল। স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা আমাকে উদভ্রান্ত করল।

প্রবৃত্তিগামী পুত্রদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে ফুলের মতো নিষ্পাপ একটি মেয়ের স্বপ্ন, সুখ নষ্ট করতে পারব না। না, কিছুতেই না।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মানুষ তার নিজের মনের অয়নপথও ভালো করে চেনে না। সেখানে কতরকমের বিস্ময় যে লুকোনো আছে মানুষ নিজেই তা জানে না। জানে না বলেই কত কী আকস্মিক ভাবে ঘটে যায়। হঠাৎ ঝড়ে যেমন সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়, দ্রৌপদীকে দেখে তেমনি একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনের অভ্যন্তরে। দ্রৌপদীকে আনন্দে আবেগে বুকে টেনে নিয়ে বলিঃ তুমি রমণীর ঈর্ষার পাত্র। ভাবতে অবাক লাগে তোমাকে পাবার জন্যে দেশ দেশান্তর থেকে কত পুরুষ উন্মাদের মতো ছুটে এসেছে। না পেয়ে রাগে তরবারি খুলেছে, অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরেছে। তোমাকে পেয়ে যেমন গর্ব হচ্ছে, তেমনি ভয়ও করছে। জয়েব পরের দিনগুলিতে কি ঘটবে কে জানে? তাই তো প্রশ্ন জাগে, তৃতীয় পাণ্ডব কাকে জয় করেছে? একটি রমণীকে, না বীরভোগ্যা রমণীকে? তুমি পাণ্ডবেব জয়লক্ষ্মী। পাণ্ডবের মান, সম্মান, পৌরুষের বিজয় কেতন। পাণ্ডবের বিজয়ের গৌরব কোন একজনের নয়। তাতে পঞ্চপাণ্ডবের সমান ভাগ। পাণ্ডবের বিজয়-লক্ষ্মীর উপরেও পঞ্চপাণ্ডবের সমান অধিকার, সমান দাবি। তুমি পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা!

কথাগুলো আচমকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। আমি নিজে হতচকিত হয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকি। নিজেকে ধিক্কার দিই ছিঃ! এ কী করলাম! সত্যি, আমি কিছুই করিনি। আমাকে দিয়ে কথাগুলো কে যেন বলাল।

পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে মানুষ আজ অনেক দূরে সরে এসেছে। বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ টিঁকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক সম্পর্কের নিয়ম নীতি কঠোর করেছে। তবু কি মানুষ মেনেছে সেই অনুশাসন? স্বার্থের সংঘাতে নিজের মতো ভেঙেছে, গড়েছে। আমার একটা অদ্ভূত বেহিসেবী ঘোষণার চিরন্তন মূল্যবোধকে একটা বড় ধাক্কা দিল। তাতে মানুষের সমাজের ভূগোলটা হয়তো একটু বদলে গেছে। হয়তো সেই সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস সব কিছু বদলে গিয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সূত্রটা তাতে জটিল হলো, না সরল হলো এ প্রশ্নের জবাব দেবে আগামীকাল। তবে নারীকে সম্পত্তির মতো ভোগ করার নিয়মের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে নারী যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হলো। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের চাকা কয়েক পাক পিছনের দিকে ঘুরে গেল! তেমনি এক উদারনীতি সহিষ্ণুতা এবং সংযমের এক নয়া-দিগন্ত উন্মুক্ত করল। নারী হলো বন্ধন এবং ঐক্য সংহতির প্রতীক চিহ্ন।

সংসারে ভাবপ্রবণতার সত্যি কোন দাম নেই। সংস্কার নিছকই বিলাসিতা। যতক্ষণ মন সংস্কারকে প্রাধান্য দেবে ততক্ষণ জীবনের কোন উন্নতি নেই। জীবনেব কারবার বাস্তবতাকে নিয়ে। বাস্তবটাই সত্য। বাস্তব যত রূঢ় হোক তাকে ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। মন দিয়ে অনুভব করে তাকে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর হয়।

পাণ্ডবদের জীবন বাগিচার সেই সুন্দর ফুল দ্রৌপদী। পাণ্ডবদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী। তার জন্যেই পাণ্ডবেরা আজ একা নয়, নির্বান্ধব নয়। একসঙ্গে তারা রাজকন্যা এবং রাজ্য পেয়েছে। এক বিরাট রাষ্ট্রজোটের ছত্রছায়ায় দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে। জনগণমন অধিনায়ক কৃষ্ণ হলো পাণ্ডব সখা। যাদবদের সঙ্গে আমার ছিন্ন আত্মীয়সম্পর্ক বহুকাল পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। দ্রৌপদী বধূ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে একটা মুক্তির হাওয়া বইতে লাগল। পলাতক আসামীব মতো আত্মগোপনের পর্ব শেষ, ভিক্ষুকের জীবনের অবসান। এবার পাণ্ডুর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং তার সিংহাসনের দাবি ও অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজধানী হস্তিনাপুর ফেরার পালা। তাদের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে রাজকীয় সমারোহে আড়ম্বরে ঐতিহাসিক করতে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে রাজা দ্রুপদ এবং পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ করেনি এমন কাজ নেই। পাঞ্চাল রাজ্য ও যাদব সাম্রাজ্যের সম্মিলিত যুক্ত চতুরঙ্গ বাহিনী এবং বহু ছোট বড় সামন্তরাজা, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, রাজ-প্রতিনিধি সহ ভারত নায়ক কৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর যাত্রার সাথী হলো।

সর্বাগ্রে আমার বিজয় রথ। কী ভালো যে লাগছিল! সত্যি, আমি এক বিশাল দুনিয়া জয় করে হস্তিনাপুর ফিরছি যেন, গর্বে আমার বুক ভরে উঠছে। মনে মনে বলছি, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটল গো ফুল ফুটল!

আমার জীবনটা এক অদ্ভুত ধরনের। অদ্ভুত কারণ, জ্ঞান হওয়া থেকে জীবন যাকে শুধু বঞ্চনা করেছে, জীবনের কাছে তার আকাঙ্ক্ষা করার সত্যি কিছু থাকে না। বিধাতা যোগ-বিয়োগের ভুলে শুধু দুর্ভোগই পেলাম। সারা জীবন ধরে সংগ্রাম করেছি। সংগ্রামকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর এক সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আত্মপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি। তবু পালিয়ে যায়নি আত্মসমর্পণ করেনি। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে সংসারের এবং জীবনের বন্ধনের মধ্যে দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে তার মুখোমুখি হয়ে মাটি কামড়ে সংগ্রাম করেছি। এক আপোষহীন দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীকে লাভ করে মনে হলো পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সেই প্রথম পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎকে চোখ ভরে দেখলাম।

কুরুরাজ্যের সীমানায় আমাদের অভ্যর্থনা করতে হাজির ছিল বিদুর। আচার্য দ্রোণ, কৃপ, মন্ত্রী কণিক এবং আরো অনেকে। তাদের দেখে আমার একটু আশা জাগল। মনের ভেতর একটু জোর পেলাম। কিন্তু বুকের পাষাণ ভারটা একেবারে নেমে যায়নি। বিদুরকে দেখে ভীষণ আনন্দ হলো।

কতকাল পরে তাকে দেখলাম ঃ চুলে পাক ধরেছে। কাঁচা পাকা গোঁফের নিচে পুরনো হাসিটি এখনও তেমনি আছে। আমার এক উপচানো আনন্দে, এক অসহনীয় সুখবোধে ঠোঁট দুটো কথা বলার দুরন্ত আবেগ থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখেও জল এসে গেল। মুহূর্তে কেমন একটা স্থবিরতার শিকার হয়ে বে বা শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি।

নানা ঘটনার উলোট পালোট স্রোতে ভেসে গিয়েছি অনেক দূরে। স্পর্শ-কাতর মনটা তাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। তবু জীবনের একটা স্থির প্রত্যয়ের ভূমি বরাবরই ছিল বলে তার টানেই তো এই ফিরে আসা। বিদুরও আমার প্রত্যাশা। আমার প্রতি বিদুরের টানটা আজও কি তেমন আছে? তার মতো স্বার্থপরের সঙ্গে বিদুরের মায়া কিসে? বিদুর কি আজও ভালোবাসে তাকে? বিদুর আমার জন্যে অনেক করেছে? সকল চোখের আড়ালে সেও আমার মতই সহ্য করেছে কম নয়। কিন্তু আজ তাকে দেখার পরে মনে হচ্ছে আমি বোধহয় তার অভাব, শূন্যতা আর সইতে পারব না। বিদুরকে সত্যি আমার কিছু দেয়া হয়নি। তার কাছ থেকে স্বার্থপরের মতো শুধু দু'হাত পেতে নিয়েছি। মানুষটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। এক অজানা স্পন্দনে আমার হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হচ্ছিল। কিছু শিহরণ আমি টের পাচ্ছিলাম, যা দৈনন্দিন নয়, স্বাভাবিক নয়।

পাণ্ডবদের নিয়ে হস্তিনাপুরে এক নতুন নাটক হলো। নাটকে কোন সংঘাত নেই। কিন্তু একটা তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। হস্তিনাপুরে পোঁছনোর আগে পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রত্যাখ্যানের, অপমানের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের কত সব অদ্ভূত অদ্ভূত কল্পনায় মন তোলপাড় করেছে। কত উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা এবং প্রতিকার সম্পর্কে কত রকমের কৌশল নিয়ে চিন্তা করেছি। কী আশ্চর্য! হস্তিনাপুরে পা দিয়ে তার কিছুই করতে হলো না। আমার সারা পথের উত্তেজনার উত্তাপের উপর ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্য ভীষ্ম যে এভাবে জল ঢেলে দেবে কল্পনাও করেনি। মুখে তাঁরা কিছু বললেন না। ভাবখানা এমনই দেখানো হলো যেন কোন কিছু হয়নি। সেইজন্যে একটা তীব্র সন্দেহে বুকটা উথাল-পাথাল করতে লাগল। এই নীরবতা বিশ্রী ঠেকল।

একটুও স্বাভাবিক মনে হলো না। ঝড় উঠার আগে চরাচর জুড়ে যেমন থমথমে স্তব্ধতা বিরাজ করে, এও তেমনি। তবে কি ঝড় উঠবে? সংঘাত বাঁধবে? অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল।

তবে ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্য ভীষ্ম কী ভয় পেল? হবেও বা। তাঁর মুখে চোখে কেমন একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের ভাব ফুটে উঠেছিল। ওঁদের দিকে তাকালেই ভেতরের মন্দ অভিপ্রায়টা টের পাওয়া যায় যেন। তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে আমার দিনগুলো কাটতে লাগল। বেশ বুঝতে পারি আমাদের কোনরকম পাত্তা না দিয়ে নীরবে উপেক্ষা করে যাওয়ার কৌশল নিয়েছেন ওঁরা। বুক জুড়ে খই ফোটার মতো রাগ আর আক্রোশের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কিছুই চিন্তা করতে পারছি না, উচিত অনুচিত বোধও লুপ্ত হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্যর মতলব কী? তাঁরা কী চান? বুকের মধ্যে অভিমানের তুফান উঠতে চাইছিল। জোর করেই চাপা দিলাম সেটা। জটিল মন নিয়ে সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকি। চারদিকে ছোট মনের, ছোট, স্বার্থের মানুষ জনের অহরহ বাস করতে করতে আচমকা পিতৃব্য ভীষ্মের খুব বেশি করে মনে পড়তে লাগল।

মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পরে মেরুদণ্ডহীন কৌরববংশের প্রকৃত কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভীষ্ম। বিচিত্রবীর্যের মতো ধৃতরাষ্ট্রও নামমাত্র সম্রাট। দুর্যোধনও নামে যুবরাজ। কিন্তু সব কর্তৃত্ব, নিয়ম নীতি প্রণয়ন এবং তার বিধিবন্ধ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা ভীষ্মকে করতে হয়। কার্যত তিনি হস্তিনাপুরের সব, কৌরববংশের প্রাণভোমরা। এই মানুষটাই সব শাসন ক্ষমতা আগলে রয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবে পাণ্ডবরা ততদিন হস্তিনাপুরের অধিকার পাবে না। একথাটার মতোই সত্য কৌরববংশকে ধ্বংস করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। ভীষ্মের মনে যে আগুন জ্বলছে সে আগুন থেকে কৌরববংশের ধ্বংসকে আটকানো যাবে না।

ভীষ্ম ও কৌরববংশের ধ্বংস চায়। মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়নি তাঁর। নিজের বঞ্চনার উপশম ঘটানোর জন্যেও কিছু করা হয়নি। আবার পিতার কাছে সত্যভঙ্গ না করেও, কৌরববংশকে শৌর্য-বীর্য দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেও যে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া যায় তার এক পরিকল্পনা তাঁর মনে রূপ নিচ্ছিল। নব্বই বছর পরে আচমকা তাঁর মনের সেই বিচিত্র অয়ন পথটি উপলব্ধি করলাম হঠাৎ। আত্মহননকারী প্রতিজ্ঞার প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। নীরবতাকে নিজের বংশ কুরুবংশকে মূলে ধ্বংস করার এক অস্ত্র করে নিয়েছিলেন। শত্রুতা করার কী ভয়ঙ্কর ক্ষমতা নীরবতার। নীরবতা মানে সম্মত নয়; অসম্মতিও নয়, দুর্বলতা কিংবা বীর্যহীনতা নয়, বিরোধিতাও নয়, কারো পক্ষে অথবা বিপক্ষে যাওয়া বোঝায় না—অথচ কত সহজে সবাইকে খুশী রাখা যায়, সন্তুষ্ট করা যায়, নিজের অভিপ্রায়কে অন্যের কাছ থেকে গোপন করা এবং আড়াল করার এমন ছদ্মবেশও হয় না। কোন আঘাত-ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে শত্রুকে এবং মূল লক্ষ্যকে নিঃশব্দে আঘাত হানার এমন মারাত্মক কূট অস্ত্র বিশ্বে আর নেই। বিনা রক্তপাতে, সংঘর্ষ না বাঁধিয়ে শত্রুকে পঙ্গু এবং

অসহায় করে তোলার এমন কূটযুদ্ধ বোধ হয় রাজনীতিতে আর দ্বিতীয় নেই। কুরুবংশের উপর ভীষ্মের আক্রোশ, রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা তাঁর মনের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ নিচ্ছিল। নীরবতা তার ভূমিকা।

দাবানলের আগুন ছোট্ট নদীর বাধা ডিঙিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আর আমি সেই ধ্বংস যজ্ঞ ও আসন্ন মৃত্যুর মাঝখানে নিশ্চল হয়ে দেখতে পাচ্ছি নব্বই বছর আগের বহু ঘটনার মধ্যে ভীষ্মের ভয়ঙ্কর নীরবতা ও কূট কৌশল কী করে কুরুবংশের মৃত্যু ঘণ্টা বাজাচ্ছিল।

কী শতশৃঙ্গ পর্বত; কী স্বয়ংবর সভা থেকে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তনকে ভীষ্ম নীরবে শুধু অনুমোদন করলেন না, নিঃশব্দে স্বাগত জানালেনও। ভীষ্মের নীরবতার জন্যেই ধৃতরাষ্ট্র কার্যত তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রেরা পাণ্ডবদের উপর যে অবিচার এবং অন্যায় করেছে প্রীতি দিয়ে পিতৃব্য তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর পাণ্ডবপ্রীতি ধার্তরাষ্ট্রদের আশাহত করেছে, তাদের অন্তরে ঈর্ষার আগুন জেলেছে। বিদ্বেষ বিষে নীল হয়ে গেছে তাদের সারা শরীর। ফলে কৌরবও পাণ্ডবদের বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোত কৌরববংশের আয়ু ও স্বাস্থ্য অনেক দিন ধরে ভিতরে ভিতরে ঘুণ পোকার মতো খেয়ে নিচ্ছিল।

ভীষ্ম তার কোন প্রতিকার করেনি। বরং তাদের দ্বন্দ্ব বিরোধ, রেষারেষিকে এক অনিবার্য সংঘর্ষে প্ররোচিত করে কুরুবংশের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর হাতেই সব রাষ্ট্র ক্ষমতা। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশেই চলে এসছে। তবু ভীষ্মের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, ভীষ্ম নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা যদি গ্রহণ না করত তা-হলে কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদ বাঁধত না। কৌরববংশ ধ্বংস হওয়ার জমি তৈরী হতো না। আজ মনে হচ্ছে, শান্তনুর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে, দ্বৈপায়নের উপর জ্বালা ভরা আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্যে, সত্যবতীর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করার প্রয়াসে, জননী গঙ্গার নিদারুণ লাঞ্ছনা অপমানের এবং নিজের বঞ্চনার প্রতিহিংসা নিতেই কৌশলে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের ছোট ছোট বিবাদ-কলহ, স্বার্থবিরোধ, ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত, ভাই-ভাইর সংঘর্ষ, শরীকিয়ানা রেষারেষিকে প্রশ্রয় দিয়ে এক আত্মঘাতী সংঘর্ষের মদত ভীষ্মই দিয়েছেন। বাইরে থেকে তা টের পাওয়ার উপায় ছিল না। এই বিবাদকে নিঃশব্দে শুধু বাড়তে দিলেন না বিদ্বেষ বিষ থেকে জন্মানো ধ্বংসের বিষবৃক্ষের চারাগাছটি সযত্নে হস্তিনাপুরের রোপন করলেন। গোপনে তার নিয়মিত পরিচর্যাও করেছেন তিনি। কিন্তু এই নীরব ভূমিকাটির কোন দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপল না।

ভাবতে অবাক লাগে, কী আশ্চর্য কৌশলে সকলের অগোচরে ধার্তরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবদের দিয়ে নিজের বংশ কুরুবংশের ধ্বংসের মৃত্যু ঘণ্টাটা বাজাতে সক্ষম হলেন। এই অদ্ভুত কূট কৌশলটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সর্বদা মৌন থেকেছেন। পাণ্ডবদের উপর ধার্তরাষ্ট্রদের অবিচার, অত্যাচারের কোন প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ না করে সর্বদা নির্বিকার থেকেছেন। তাঁর ঔদাসীন্য ধার্তরাষ্ট্রদের পাণ্ডব বৈরীতার ইন্ধন যুগিয়েছে। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অর্থহীন সহৃদয়তা

এবং সমবেদনা তাদের কোন উপকার করেনি। বরং ধার্তরাষ্ট্রদের অন্তরে ঈর্ষা বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দিয়েছে। উভয়ের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বকে উস্কে দিয়েছে। মনোমালিন্য ও পারস্পরিক রেষারেষিকে তীব্র করেছে। কারণ, কুরুবংশকে ধ্বংস করতে হলে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া দরকার।

সংঘর্ষ! সংঘর্ষের কথা মনে হতে আমি সহসা চমকে উঠলাম। বোধ হয়, সংঘর্ষের সেই ছবি ভীষ্ম দেখতে পেয়েছিলেন পাঞ্চাল এবং যাদবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তনের ভেতর। কারণ, তাদের সঙ্গে জোট বাঁধায় পাণ্ডবদের শক্তি আরো বেড়ে গেল। হস্তিনাপুরের তোয়াক্কা না করেই পাণ্ডবেরা রাজনৈতিক জোটে যোগ দিয়ে আগেই তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করে ফেলেছে। সিংহাসন এবং রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী চিন্তা করেই পাণ্ডবেরা নিঃশব্দে তাদের ঘর গুছিয়েছে। হস্তিনাপুরের সঙ্গে যুদ্ধের মহড়া দিতে যে, তারা সক্ষম এই সত্যটুকু জানান দেবার জন্যেই কুরুবংশের প্রবল প্রতিপক্ষ পাঞ্চাল এবং যাদব প্রধানদের সঙ্গে একত্রে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছে। এঁদের সমর্থন এবং সহযোগিতা যে বাস্তব বা মিথ্যে কিছু নয় সেজন্যে সশরীরে তাদের হাজির করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। কৃষ্ণের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে!

ভীষ্মের মাথার মধ্যে সার্বিক ধ্বংসের রণদামামা বাজতে লাগল। দুর্যোধন বিচলিত। ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিত। এরকম একটা সন্ধিক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন দীর্ঘকাল। মনের কোণে লুকোনো কৌরববংশ ধ্বংসের সংঘাতের বীজ বপন করার জন্যেই পাণ্ডবদের দাবি ও অধিকার মেনে নিয়ে কুরুরাজ্য ভেঙে দু'খণ্ড করে তার অখণ্ডতা, শক্তি ও ঐক্যের উপর একটা বড় রকমের আঘাত হানলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জমি শুধু তৈরী হলো না, ধ্বংসের একটা অধ্যায় সমাপ্ত হলো। আমারও বিজয় সমাপ্ত হলো। একটানা দীর্ঘ সংগ্রামের উপর যবনিকা পড়ল।

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের নতুন রাজ্যপাট শুরু হলো। পুত্রেরা এখন নতুন রাজ্য এবং প্রশাসন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাদের চোখে এক পরিচ্ছন্ন রাজ্য গড়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের আমি কেউ নই। আমার কাজ শেষ পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ আমার ভূমিকা নিয়েছে। আমার ছুটি। সত্যিই আমার আর কোন কাজ নেই। দায়িত্ব, ভাবনা

কিছু নেই। আমি এখন একা। একেবারেই একা। এক নিঃসঙ্গতাবোধ জন্ম নেয় আমার ভেতর। একা বলে পারি পরিবেশকে বড় বেশী করে অনুভব করি। সামান্য ঘটনাও অসামান্য হয়ে যায়। নির্জনতায় আমার চারদিকে ছায়াগুলি যেন বড় নিবিড় হয়ে উঠে। তারা যেন কিছু বলছে, কিছু প্রকাশ করতে চাইছে। কখনও বা আমি ছায়াদের সঙ্গে একা একা কথা বলছি। আসলে, এসবই আমার অন্তরের এক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু এসব হওয়ার কথা নয়। ইন্দ্রপ্রস্থের চতুর্দিকে খুশির হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সুখ, শান্তি, প্রীতি, মমতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, ভালোবাসা সব আছে। তবু কী একটা তীব্র অভাব কুড়ে কুড়ে খায় আমাকে। বুকের মধ্যে উথলে উঠার ভাব হয়। তখন কিছু ভালো লাগে না। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির সত্যি কোন মানে নেই। তবু মনের মন যখন তার উপর দখল নেয় তখন সত্যি কিছু করার থাকে না তার। তখন সমৃদ্ধ মনেও সন্দেহ জাগে, এই পৃথিবীতে আমরা পরস্পরের কতটা আপনজন? অধিকাংশ সম্পর্কই বড় পলকা। হয়তো বা কৃত্রিম, বড় বেশি স্বার্থসম্পৃক্ত।

মনটা এখন যে এক জায়গায় আটকে গেছে, তা আমি খুব গভীরভাবে টের পাই। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নে মন ভারাক্রান্ত হয়। বড় অভিমান হয়। আমার উপর কারোর দাবি নেই আর। আমারও বোধ হয় দাবি করার নেই এ সংসারে কোন মানুষের উপর। পুত্রদের এখন নিজের নিজের সংসার, স্ত্রী, পুত্র আছে। দায়িত্ব কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী মনটির অবসর নেই মায়ের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করার। আগের মতো তারা আর নেই। বড় দূর হয়ে গেছে যেন। বুকটা ভীষণ খালি লাগে। তাদের সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে তাদেরও সেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

কাছের মানুষ বলতে একজনও নেই। মানুষের সমস্ত সম্পর্কেই বোধ হয় স্বার্থের। কেবল জন্মদাত্রী মায়ের কোন স্বার্থ নেই। সন্তানকে শুধু সন্তান হওয়ার সুখে, আনন্দে ভালোবাসে, তার মঙ্গল চায়। বদলে কিছুমাত্র চায় না। শুধু দিয়ে ভরে উঠতে চায়। দেয়ার পাত্রটি যদি না থাকে তা-হলে দেবেটা কোথায়? অতৃপ্তি তাই মনটাকে কুড়ে কুড়ে খায়। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে মুক্তি বলে যাকে জানলাম, সে হলো জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধন। সেই বাঁধনে দড়ির চাপে, রক্ত চলার প্রতিবন্ধকতায়, দাঁত টিপে কষ্ট সহ্য করার চেষ্টায় সমস্ত সত্তা আমার লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে যেন। বাকি জীবনটা নিজের মনের কারাগারে এমন করে রুদ্ধ হয়ে কাটাতে হবে হয়তো।

অনেক ক্লান্তি অনেক গ্লানি জমেছে দেহে ও মনে। এবার কোনও মস্ত গভীর মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমোব, লম্বা ঘুম। কোনও কাজ নেই। জীবনে এরকম কোনও যতির বেধে হয় খুব প্রয়োজন থাকে। একটানা এই দীর্ঘ-পথচলা বড়ই ক্লান্তির, একঘেয়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বুকের মধ্যেও বড় কষ্ট হয়। মনটা হু-হু করে।

জীবন অনেক বড় এবং জটিল। জীবনের কাছে সত্যি যে কী চাই আমি, নিজেও ভালো করে জানি না। মাঝে মাঝে চাওয়াটা, প্রত্যাশাটা আকাশে উঠে

যায়। মুগ্ধকরা কত সব আশ্চর্য ছবি ক্রমান্বয়ে ফুটে উঠে। ফুলের গন্ধের মতনই ভালো মানুষের মনের গন্ধও আপনিই ছড়িয়ে যায় মনের অভ্যন্তরে। তখন কী যে ভালো লাগে।

জীবন কী বিচিত্র! ঘটনার কী আকস্মিক পরিবর্তনে মানুষ আশ্চর্যভাবে বদলে যায়। আজ আমি পুত্রদের কাছে, রাজ্যে প্রজাদের কাছে স্পর্শাতীত এক দুর্লভ আসনে সমাসীনা মহামহিম এক দেবীমূর্তির মতো পাণ্ডু মহিষী সম্রাজ্ঞী কুন্তী। আমি আর কারো নিকটবর্তী হতে পারি না। আমাকে সত্যি যদি কেউ বুঝত তা-হলে এমন যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পেতে হতো না। জীবন ভোর জেতার জন্যে অনেক অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি। পরিবারের লোকজনের কাছেও হয়তো অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। কিন্তু যাই করে থাকি না কেন, নিজের জন্যে নয় আমার ভালোবাসা জনদের জন্যে করেছি।

আজ নিজেই আমার বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানেই আমি বন্দী। হয় তো এ আমার কর্মফল। আমার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত তো একজন মানুষ এভাবেই করে। স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে যে মনটি পতিত হয়ে যায় তাকে আবার স্বস্থানে স্থাপন করাই প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আত্মনির্মাণ হয় না। এই নির্মাণের জন্যে দুঃখকে যন্ত্রণাকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করে উত্তরণ খোঁজার জন্যেই। মনের আর্তিই মানস মুক্তির সুর হয়ে বুকের গভীরে দুঃখও আনন্দের সঙ্গে মিলে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি অতৃপ্তির ভেলায় ভেসে ভেসে কোন দেবলোকের দিকে যেন নিয়ে যায়। গভীর ভালো লাগার সঙ্গে এক ধরনের খারাপ লাগাও মিশে থাকে। সেই ক্ষণটুকুই বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। এই আনন্দ ও বিষণ্ণতার কোন নাম নেই। ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার আগে এই নিঃশব্দ বিষণ্ণ বেদনাময় আর্তিই বোধ হয় ভুক্তভোগীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে থাকার দিন মাস বছরগুলো পেরোতে লাগল। দুই, চার, পাঁচ সাত বছর করে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থকে গুছিয়ে নিচ্ছিল। শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থকে সাজাল। এক তিলোত্তমা হলো তাদের হাতে। আমার পুত্রেরা কাজের মানুষ। সেটাই আমার একমাত্র গর্ব। কাজ পাগল বলেই তো ইন্দ্রপ্রস্থ সকলের নয়নমনি, শত্রুর ঈর্ষাস্থল।

এইভাবে তেইশবছর কাটল। ইন্দ্রপ্রস্থ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। পুত্রেরা আগের মতো ব্যস্ত নয়। এখন তাদের অনন্ত অবকাশ। অবকাশের রন্ধ্রপথ দিয়ে পাণ্ডবদের নিয়তির রূপ ধরে দ্যূতক্রীড়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করল। হস্তিনাপুর থেকে একদিন তার বার্তা বহন করে আনল বিদুর।

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের সুখ সইল না। তাদের কপালটাই মন্দ। বনবাস অদৃষ্টের লিখন। কে ঠেকায় তাকে? নইলে, পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া করার দুর্মতি হবে কেন যুধিষ্ঠিরের? দ্যূতপণে পরাজিত হয়ে সত্যরক্ষা করতে পাণ্ডব মহিষী সহ পঞ্চপাণ্ডব বনে যাত্রা করল। যাওয়ার আগে অন্যান্য পাণ্ডব মহিষীরা যে যার পিত্রালয়ে গেল।

আবার আশ্রয়হীন হলাম। এমন ফাঁকা লাগছিল যেন আমি একা কোথাও দাঁড়িয়ে আছি, আশ-পাশে কেউ কোথাও নেই, কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু ধু ধু ফাঁকা স্তব্ধ নির্জন কোনো তেপান্তর আমার চারপাশে।

ইন্দ্রপ্রস্থের পাট চুকিয়ে সবাই চলে গেছে। অত বড় প্রাসাদ খাঁ খাঁ করছে। নিস্তব্ধ। থমথম করছে। চারদিকে এক অদ্ভুত শূন্যতা, আমি অন্তঃপুরের বাইরের খোলা জায়গায় বসে নিজের চোখমুখ ঢেকে মৌন হয়ে বসে আছি।

সেই সময় বিদুর এসে ডাকল! কুন্তী!

বার তিনেক ডাকল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছিল। কেমন করে বোঝাব, বিদুরের সহানুভূতি, সমবেদনা, অন্তরঙ্গতা আমাকে কিসের স্পর্শ দিচ্ছিল। তারপর আর থাকতে না পেরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলি।

পায়ে পায়ে বিদুর এগিয়ে আসছিল আমার দিকে।

বাইরের আলো যেভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ঘরের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে আলোয় ভরে দেয় তেমনি ভাবে এসেছিল! ও আমাকে দয়া করতে আসেনি। আমার সঙ্গী হতে এসেছিল, এসেছিল সাহচর্য দিতে, বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়াতে। ও এল আমার আনন্দ হয়ে। চারপাশের মলিনতা দূর করে দিয়ে বিদুর যেন এসে বলল ঃ কুন্তী আর কেন? অনেক হয়েছে। এবার মায়া কাটিয়ে দ্বার খুলে বাইরে চল। দেখ কত জায়গা। পৃথিবী কত বিরাট। সেখানে কেউ আশ্রয়হীন নয়।

ওর মুখে এই কথাগুলো শোনার জন্যে হাঁ করে বসেছিলাম। বিদুর ছাড়া আর কেউ তো কুন্তীর বুকের তলায় কান পেতে অনুভব করল না, কোথায় তার ব্যথা, কত জায়গায় বেদনা, কোন্ শূন্যতা আর বেদনা তাকে এত অসহায় করে তুলেছিল। বিদুর আমার কাছে সেদিন কীভাবে দেখা দিয়েছিল সে শুধু আমি জানি।

বিদুরের ডাক শুনে, আমি নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হই। চোখ মুছতে মুছতে বলি ঃ দেখ, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখছি। তোমার ডাকে ঘোর ভাঙল। আমি তো জেগে আছি। কোথায় অন্ধকার?

বিদুর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওর হাতে হাত রাখলাম। কী

গরম তালু। আমার ঠাণ্ডা হাতের আঙুল দিয়ে ওর উষ্ণ আঙুলগুলো জড়াল। ধীরে ধীরে চাপ দিল। রক্তের উষ্ণতায় উষ্ণতায় মিলন হলো হৃদয়ের স্পন্দন। ওর মুঠোর বন্দী হাতখানার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমরা কোন প্রতিক্রিয়া নেই। নিশ্চল হাতখানা শুধু ওর হাতে ধরা অবস্থায় ছিল। তাতেই আমার বুকের বরফ কাঠিন্য গলে যাচ্ছিল। বুক ভাসিয়ে এল করুণা, ভালোবাসা। বয়ঃসন্ধির প্রথম প্রেমের মতো সেই দুকূল ছাপানো গভীর প্রেমের সমুদ্রে অবগাহন করে সাঁতার দিতে দিতে অভিমান রুদ্ধ কণ্ঠে বলছি দেবর, ঢেউ এসে পায়ের তলা থেকে হঠাৎ কেড়ে নিল মাটি। দমবন্ধ করা স্রোতের জলে পাক খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছিলাম। সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে মনে হচ্ছিল ঢেউয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন মানুষ। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠিকই চোরাবালি থেকে টেনে তুলে বাঁচাবে। কিন্তু কী দরকার ছিল? আমি তো ফুরিয়ে গেছি। হারিয়ে গেছি। এ সংসারে আমার কানাকড়িও দাম নেই। আমার কী আছে যা তোমাকে দিতে পারি।

বিদুর উত্তর দিল না। হাসল। তার মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিক মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। আস্তে আস্তে বলল: বৌঠান বেলা পড়ে আসছে। এবার তো যেতে হবে।

চোখ ভরে জল নামল আমার। কথা বলতে পারি না।

বিদুরের কাছেই আছি।

বুকটা সারাক্ষণ হু হু করে পুত্রদের জন্য। একযুগ হয়ে গেল তবু রাজ্যোদ্ধারের জন্যে কিছুই করল না কবে কী করবে, কে জানে? দিন দিন আমিও হতাশ হয়ে পড়ছি। বাস্তবিক কেমন যেন একটা নেই নেই ভাবের মধ্যে আছি। যুধিষ্ঠিরের নির্বুদ্ধি তার উপর রাগ হয়। অভিমানে অনেক সময় একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

একদিন ধরা পড়ে যাই বিদুরের কাছে। স্থির দৃষ্টিতে ও দেখছিল আমাকে। ওর শান্ত স্থির অনুসন্ধানী চোখের উপর চোখ রাখতে পারি না। মুখখানা লুকোনোর জন্য নত হয়। আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরে জল মুছি। তারপর ভারি গলায় বলি: কিছু বলবে? ছেলেদের কোন খবর পেলে? ওরা কোথায় আছে?

বিদুর বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলে বলল: পাণ্ডবেরা এখন বিরাজের গৃহে আত্মগোপন করে আছে। ওখানে বসেই রাজনৈতিক তৎপরতা সুরু করেছে।

চকিতে ভেজা চোখ দুটো উজ্জল হলো। বিদুরের দিকে চেয়ে বললাম: কী ভালো খবর যে দিলে!

বিদুর অপলক আমার মুখের দিকে চেয়েই আছে। বিষণ্ণ গলায় বলল: তুমি কাঁদছিলে? কেঁদে কিছু হয়? তোমার দুঃখটা তাতে কমে কী? কাঁদে বোকারা।

ধরা পড়ে যাওয়ার বিব্রত ভাবটা চট করে লুকিয়ে ফেলে কপট রাগ প্রকাশ করে বললাম : তুমি তো আমাকে শুধু কাঁদতে দেখ। কাঁদতে কেউ চায় না, তবু কান্না এসে যায়। কেন কাঁদি, কোনদিন জানতে চাওনি। আমার মনের ভার বইতে পারছি না বলে কষ্টে কাঁদি। এ কান্নাটা তোমার সৃষ্টি। তুমি দায়ী। তুমি তো আমাকে ভালবাস। পাণ্ডবেরা তো তোমারই রক্তে মাংসে গড়া। এই কি স্নেহ মমতা ভালোবাসার লক্ষণ?

খুব সংশয় পূর্ণ এবং বিষণ্ণ চোখে বিদুর কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। শান্ত গলায় বলল : তোমার অভিযোগের অর্থ বুঝলাম না।

বুঝতে চাও না বলেই, পার না। কৌরব সভার দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময় পিতৃব্যের মতো তুমিও প্রতিবাদ করনি; তোমার রহস্যময় নীরবতার অর্থ বুঝি না? তোমার এ হেন আচরণের অপমানে ভেতরটা জ্বালা করে। লজ্জায় ঘেন্নার অপমানে তোমার কাছে কথাটা উত্থাপন পর্যন্ত করিনি। কথাটা মনে হলে বুক ঠেলে কান্না আসে। পৃথিবীতে মেয়েরা বড় অসহায় জীব। স্বামী, পুত্র, কেউ তাদের নয়। তারা একা।

এ তোমার অভিমানের কথা। তুমিও জান পাণ্ডবদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তাতে মানুষের হাত থাকলেও দৈবও সমান দায়ী। দৈবই পাণ্ডবের ঐশ্বর্য, বিলাসের জীবন চায় না। ইন্দ্রপ্রস্থে তাদের সংগ্রামী চরিত্রটাই নষ্ট হতে বসেছিল। অথচ ভীষ্ম খুব প্রত্যাশা করে নিজের স্বার্থে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য দিয়ে কৌরব—পাণ্ডবের সংঘাতকে জীইয়ে রাখতে চেয়েছিল। একটা বিরাট যুদ্ধের মধ্যে তাদের টেনে আনা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা গেল, পাণ্ডবেরা যুদ্ধ চায় না। দেশের সমৃদ্ধি উন্নতিই তাদের কাম্য। তাদের সংগ্রামী চরিত্রটাই বদলে ফেলল। অপরপক্ষে জরাসন্ধের মৃত্যুতে দুযোধন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গকে তার রাজছত্র তলে সমবেত করতে সক্ষম হলো। দুর্যোধনের পেছনে যে রাজনৈতিক সমর্থন ছিল যুধিষ্ঠিরের তা ছিল না। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সঙ্গে সংঘাত বাঁধাতে রাজি নয় বলেই ভীষ্মের কুরুবংশ ধ্বংসের পরিকল্পনা থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্যূতক্রীড়ার পণে পরাজিত পাণ্ডব কুলবধূ দ্রৌপদী কৌরব বংশ ধ্বংসের প্রলয়রূপিণী শক্তির রূপ ধরে কৌরব সভায় প্রবেশ করল যেন। বহ্নি কন্যা দ্রৌপদীর মধ্যে কৌরব বংশ ধ্বংসের আগুন দেখলেন ভীষ্ম। মনে হলো, পৃথিবীতে আর কোন রমণী নয়, কেবল দ্রৌপদীর অসম্মানই পারে পাণ্ডবদের বুকে জ্ঞাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বালাতে। সেই আগুনে হস্তিনাপুরের প্রাসাদ পুড়বে, কৌরব বংশ ধ্বংস হবে। তাই দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করতে নয়, অসম্মানের ইন্ধন দিতে, নিজের প্রতিহিংসাকে ত্বরান্বিত করতে কৌরবদের নিন্দনীয় আচরণের একজন নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। তার প্রতিবাদ তো দূরের কথা দ্রৌপদীর উত্থাপিত ধর্মের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা নিয়ে এক কূট বিতর্কের অবতারণা করে কৌশলে নিজের দায় এবং কর্তব্য এড়ালেন। পঞ্চ-পাণ্ডবকে অভিযুক্ত করে তাদের নিভন্ত আগুনে ক্রোধের বাতাস দিলেন। ভীষ্ম তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে টের পেয়েছিলেন, দ্রৌপদীর এই অপমানই পাণ্ডবেরা কোনদিন ভুলবে না, দ্রৌপদীই তাদের ভুলে থাকতে দেবে না। তাই কৌরবদের

দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দিয়ে কুরু বংশের সার্বিক ধ্বংসের এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। এ তো আর বাইরে থেকে দেখার জিনি নয়, বোঝার ব্যাপার। তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পেরেই আমিও ঘটনার প্রশ্রয় দিয়েছি।

কণ্ঠের হাসি ফুটল আমার অধরে। ঘৃণায়, ক্রোধে, অপমানে বঙ্কিম হলো সে হাসি। থমথমে বিষন্ন গলায় বললাম : চমৎকার যুক্তি।

বিদুর একটু অপ্রস্তুত হলো। থম থমে গম্ভীর গলায বলল, বৌঠান বড় দুঃখ, বড় ত্যাগ ছাড়া বড় কিছু অর্জন করা যায় না। মাকেও অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তান জন্ম দিতে হয়।

আরো একবার বলি চমৎকার। সারাজীবন ধরে আমাকে আব আমার পুত্রদের এই অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। কত দুঃখ, কষ্ট তারা পেয়েছে, কত স্বার্থ ত্যাগ করেছে তবু হস্তিনাপুরের ভীষ্মের মনের মতো মানুষ হতে পারেনি। তাদের কাছে হস্তিনাপুর কী প্রত্যাশা করে? হস্তিনাপুর তাদেব কী দিতে পারে? পাণ্ডবরা তো দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছিল। তারা তো একটা বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে পৌছতে পেরেছে। তবু কুরু জাঙ্গালের মানুষ তাদের কথা শুনল কৈ?

বিদুর হেসে বলল : তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। কাউকে সুখ দেয়াটা কঠিন। কিন্তু দুঃখ দেওয়া তো সহজ। তার জন্যে কষ্ট করার দরকার হয় না। পিতৃব্য ভীষ্মকে, সত্যবতীকে, আমাকে দুঃখ দিয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষ। পিতৃব্য তার দায়ভাগ নিয়ে দুঃখের ভাগী করেছেন তোমাকে। তারপর তা অতিক্রম করে গেছে তোমার পুত্রদের দিকে। জীবনকে কেন্দ্র করে এই দুঃখে আবর্তিত হতে শুরু করেছে যে সব মানুষ, নিয়তির অন্ধ আঘাতে তারা কে কোথায় ছিটকে যাবে, নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে কেউ জানে না। ইতিহাসের রথচক্রতলে আমরা শুধু নিষ্পেষিত এবং ছিন্নভিন্ন হতে আছি। এভাবেই মানুষের নতুন ইতিহাস সূচনা হয় নিঃশব্দে, তা না হলে কৌরববংশের স্তম্ভ পিতৃব্য ভীষ্ম নিজের বংশের উপর নৃশংস প্রতিশোধ নিতে এত নির্দয় হবেন কেন? তাঁর বুকের গভীরে প্রতিহিংস নিঃশব্দে আর্তনাদ করে মরছে।

বুকের গভীর থেকে সহসা একটা গভীর দুঃখ, বিষণ্ণ আর্তি, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়ল। নিজের মনেই বিলাপ করে বলল : হায়রে মানুষের স্বপ্ন! কত আশা করেই না মানুষ সংসার গড়ে আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত নিপুণভাবেই সেই সংসার এবং আশার সৌধ ভেঙে দেয়। পিতৃব্য ভীষ্ম পিতৃ-পিতামহের সেই স্বপ্নের রাজ্য হস্তিনাপুরকে শৌর্যবীর্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশাল কুরুজাঙ্গালকে এমন করে বিশ্বাসঘাতকের মতো ভাঙবেন ধ্বংস করবেন, কেউ কল্পনা করেছিল? দেবর, সংসারে এমন ঘটনা কেন ঘটে।

আমার জীবনের ইতিহাস যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে এখন অনেকদূর সরে এসেছি। হঠাৎ অদৃষ্টের অমোঘ নিয়মে জীবন সায়াহ্নে যদি ফিরতে হয় সেখানে, তার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। অনেক কিছুই বদলে গেছে। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। তবু কৃষ্ণ সব হিসেব গোলমাল করে দিল। তার কথায় যে যুক্তিই থাক না কেন, জীবনের ছকের খুব একটা হেরফের হবে না। কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হবে! পাপই বটে! কত পাপ করেছি এক জীবনে। মানুষ হয়ে জন্মানোটাই আমার পাপ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় পাপ করেছি কর্ণের কাছে। লোকলজ্জায় একদিন যাকে বিসর্জন দিয়েছি, আজ সব লাজ-ভয় জয় করে জননীর অধিকারে সন্তান বলে তাকে দাবি করতে হবে। সেই প্রার্থনা নিয়ে তার কাছে গেলাম দীন ভিক্ষুকিনীর মতো।

সে এক আশ্চর্য সকাল।

আকাশ থেকে সূর্যোদয়ের স্নিগ্ধ আলোর রশ্মি পড়েছে কর্ণের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর। কী অসাধারণ সুন্দর লাগছে তাকে! চক্ষুমুদিত কর্ণের ধ্যান সমাহিত শান্ত, সৌম্য মূর্তির অপরূপ কান্তির দিকে বিমোহিত হয়ে চেয়ে আছি। এই প্রথম তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে নয়নভরে দেখছি। দেখে গর্ব হলো, আনন্দ হলো। এক তীব্র ভালো লাগার আবেশ চোখে লেগে রইল।

ও আমার দেহ, মন, প্রাণ আত্মা থেকে জাত কিন্তু আমার কেউ নয়। জননীর কোন কর্তব্য করেনি। কোন অধিকারে তাকে নিজের বলে দাবি করব? কী আশ্চর্য! আত্মজার আবেগে বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল না। আসলে, তার সঙ্গে পুত্রের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি বলেই বোধহয় আমার সমস্ত আবেগ দিয়ে তাকে অনুভব করার মতো কোন অনুভূতি হলো না। পুত্র বলে মনে করলেই সে পুত্র, যদি না ভাবি তবে কেউ নয়। এমন একটা সম্পর্কশূন্য, আবেগশূন্য অনাত্মীয় মানুষের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে বোধহয় কোন লজ্জাই থাকে না। কিন্তু জননীর আত্মসম্মান জ্ঞান, বিশ্বস্ততার কী হবে? ভিক্ষে চাওয়া আর নিজের অধিকারে কিছু দাবি করা তো এক নয়। ভিক্ষুকের কোন অধিকার নেই, চেয়ে না পাওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কোন

লজ্জা বা অপমান নেই। প্রার্থনার জন্য তাকে কোন দাবি কিংবা তিরস্কার শুনতে হয় না। কিন্তু আমি তো তার কাছে ভিক্ষুকের মতো আসেনি, এসেছি আমার অনেক দাবি, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। সে অধিকারকে কেউ যদি 'না' বলে ফিরিয়ে দিয়ে অপমান করে তা-হলে সইতে পারব না, অথচ সেরকম একটা আশঙ্কা নিয়ে কর্ণের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

অনন্ত সময় বয়ে যায়। অবশেষে কর্ণ চোখ মেলল। দেখা হলো। অবাক মুগ্ধ চোখে পুত্র দেখছে তার জন্মদাত্রীকে আমি দেখছি আত্মজাকে। কতকাল পরে দেখছি! আর মনে মনে ভাবছি, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত চির অভাগা কর্ণকে কোন প্রাণে জননী হয়ে ঠকাব আজ। জননীর পবিত্রতা নোংরা হয়ে যাবে, পৃথিবীর কোন জননী সন্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, হীন প্রতারণাও করেনি কোনদিন। পৃথিবীর সব জননী যেন আঙুল উঁচিয়ে তাকে তিরস্কার করছে। ছিঃ ছিঃ করছে। মাথার ভেতরটা আমার ঘুরতে লাগল। ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হতে লাগল অপরাধবোধে। ইচ্ছে করল কর্ণের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাই দূরে কোথাও।

মস্তিষ্কের মধ্যে আলোড়িত হতে লাগল কৃষ্ণের কথাগুলো। জীবনে যা কিছুই ঘটে তা নিজ কৃতকর্মের ফল। তা থেকে তো পালিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না। এক জীবনে তো কত ঘটনাই ঘটে। তার সব কিছুর জন্যে একজন মানুষ দায়ী না হতেও পাবে, তবু তার দায় বহন করতে হয় তাকে একা। তার ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, পারা-না-পারা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামানো কিংবা দুঃখিত হওয়ার মতো কিছু নেই। কারণ, যা ঘটার তা তো ঘটবেই। এটাই বাস্তব এবং একান্ত সত্য।

এরকম একটা সংকোচ, সংশয়ে যখন ঘেমে উঠেছি তখন দীপ্ত হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে কর্ণ বিনম্র কণ্ঠে ডাকল ঃ জননী, কে তুমি?

বিব্রত লজ্জায় অস্ফুট স্বরে বলি ঃ পুত্র, কুন্তী আমি?

চমকানো বিস্ময়ে কর্ণ আর্তকণ্ঠে বলল ঃ তুমি অর্জুন জননী!

আমি জননী তোমার।

চমৎকার! ও শব্দ উচ্চারণ কর না তুমি। তোমার মুখে জননী কথা মানায় না দেবী। তুমি এক দায়িত্বজ্ঞানহীনা নারী শুধু। সন্তানের চেয়ে নিজের লজ্জা, অপমান পাপ গোপন করা বড় যার কাছে, সে কি জননী হতে পারে? শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান জননীর কোল তার বিশ্বাসের আশ্রয়, বড় নিশ্চিন্ত, নিরাপদ বিশ্রামের জায়গায় সে আশ্রয় থেকে যে তাকে বঞ্চিত করে সে জননী কখনো নয়।

পুত্র, তোমার তিরস্কার আমার প্রাপ্য। আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে শুচি হতে এসেছি। অভিযোগ, অভিমানের বিষ উগরে দিয়ে তুমিও নির্বিষ হও। পুত্র, কোন দাবি নিয়ে আসেনি আমি। একান্ত দীনা জননীর মতো ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে করুণা পেতে এসেছি।

মানুষের করুণায় যার জীবন ধন্য, সে করবে করুণা তোমায়! তোমার করুণা পেলে যে মানুষ হয়ে উঠত, তোমার নির্দয় অকরুণ অবহেলা দিয়ে তার

হৃদয়কে পাথর করে দিলে কেন?

পুত্র!

দেবী, পৃথিবীর কোন মানুষকে তোমার অপরাধ, পাপের কথা জানাতে চাও না বলে লোকালয়ের বাইরে নির্জন নদীতীরে প্রত্যুষে একাকী এসেছ। ধিক ধিক তোমাকে। জননী বলে ডাকতে আমার ঘেন্না করছে। তোমার গর্ভে জন্ম হওয়ার কলঙ্ক, লজ্জা অপমান আত্মগ্লানিতে বুক আমার পুড়ে যাচ্ছে। আমার সামনে থেকে দূর হও। হে ঈশ্বর। আমাকে তুমি অন্ধ করে দাও, বধির করে দাও!

বসুসেন!

চমকে তাকাল কর্ণ! হাসল এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে। বলল: আমার কবচ কুণ্ডলের মধ্যে লুকোনো জন্মপত্রে ঐ নাম শুধু জননী রাধা আর পিতা অধিরথ জানে। আমার সঙ্গে তোমার নাড়ীর সম্পর্ক বোঝাতেই ঐ নাম ধরে ডাকলে আশ্চর্য তোমার অভিনয় প্রতিভা! দেবী, জীবন-নাটকের এই চরম আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করার কোন দরকার আছে কি? নীচ স্বার্থপর বলেই নিষ্পাপ শিশুকে মুছে ফেলতে ভয়ঙ্কর অশ্বানদীর উত্তাল স্রোতে মঞ্জুষায় ভাসিয়ে দিয়েছিলে তাকে। একটু মমতা হলো না তোমার! এ কী জননীর কাজ! মাতৃকুলের কলঙ্ক তুমি। করুণা করব তোমায়?

আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম: বসুসেন! তুমি কী আমার শুধু তিরস্কার করবে।

দেবী, তোমার পাপের কথা বলে আমার সমবেদনা, সহানুভূতি আদায় করতে এক নতুন নাটক করছ তুমি।

সমস্ত আবহাওয়াটা নিথর স্তব্ধতায় থম থম করছে। সময় কোথা দিয়ে দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কেউ টের পাইনি। অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে কাঁদছি। ভালো-মন্দর বিচার করার ভার অনির্দেশ এক মহাকালের কাছে দিয়ে আমরা দুজনা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

সময়ের গতি দুরন্ত। অদ্ভুত মানুষের মন, আর অদ্ভুত সেই মনের গতি সেই মনটা কাউকে আঘাত করে, দুঃখ দিয়ে শান্তি পায় না, আবার তাকে স্বস্তিতেও থাকতে দেয় না! দুঃখে, বেদনায় ক্লান্ত হয় না। বরং খুঁজে বেড়ায় নিজের ভেতর নিজেকে, তার আত্মাকে। তাকে সে দেখতে পায় না কখনও। তবু সেই এসে মনের হাল ধরে।

কী যেন ঘটে গেল কর্ণের বুকের ভেতর। আস্তে আস্তে স্বগতোক্তি করে বলল: দেবী, পৃথিবীতে কর্ণের মতো মানুষদের হয়তো সত্যিই কেউ থাকে না। কেউ থাকার জন্যে কর্ণের মতো মানুষদের হয়তো জন্মই হয় না। কেউ যদি থাকবে তা-হলে স্বার্থপর মানুষদের, পাপ, অন্যায় অপরাধের বিষ গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হবে কে? মনের কারাগারে বন্দী মানুষকে মুক্তি দেবে কে? কী করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? আমি শুধু মহাকালের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হতে এসেছি। বল দেবী, তোমার জন্যে কী করতে পারি?

অগ্রজ পুত্র তুমি।

দেবী, এমন সুন্দর সকালে কোন স্বার্থে চেনাতে এলে আমাকে।

পুত্র, সব তিরস্কার, অপমান সহ্য করে আমি তোমাকে ফেরাতে এসেছি।

সেই ফিরলে দেবী, বড় দেরী করে এলে। এখন এ ফেরার কোন মানে হয় না।

সব কিছুর একটা সময় থাকে। সেই সময় না হলে মানুষ শত চেষ্টা করে কিছু করতে পারে না। তুমি চাইলেই কি, বসন্তের ফুল শরতে ফোটাতে পার? বিধাতাও পারে না।

হাসল কর্ণ! বলল ঃ ঋতুর ফুল ঋতুতে ফোটে ঠিক। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তার ভেতরে ফুল ফোটানোর আয়োজন চলে নিঃশব্দে। তারপর একদিন কলি হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সন্তান সম্পর্ক স্বীকার করার জন্যে জননী হয়ে তুমি কী করেছ? দেবী বড় স্বার্থপরের মতো এসেছ।

অভিমানী পুত্র আমার! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর পঞ্চ-পাণ্ডবেরে—

জ্বালাভরা দুই চোখে কর্ণের কী ঘৃণা! বলল ঃ ক্ষমা। মুখের ক্ষমাই কি ক্ষমা! ক্ষমা চাইলেই কী ক্ষমা করা যায়? হাজার অপরাধের পরে যে ক্ষমা চায় তার ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে মহত্ব কিংবা অনুতাপ নেই তেমনি তাকে ক্ষমা করার ভেতরও কোন উদারতা কিংবা মহত্ব কিছু নেই। পঞ্চপাণ্ডব কে আমার? তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? বিনিসুতোর মালার মতো পলকা একটা সম্পর্কের জন্যে কোন কিছু ত্যাগ করা যায়? মনকে দেখানোর কোন আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতে কত ঘৃণা করি তাদের। এটা জানার মতো যদি মন থাকত তা-হলে অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে আসতে না। দেবী কর্ণকে ফেরাতে আসনি, কপটতা করে পঞ্চপাণ্ডবের জীবিত থাকার প্রতিশ্রুতি চাইতে এসেছ। কর্ণ যে বঞ্চিত, সেই বঞ্চিত থাকছে। বড় হৃদয়হীন নিষ্ঠুর তুমি।

বৎস, অভিমানে অন্ধ তুমি। তাই আমার হৃদয়খানি দেখতে পাচ্ছ না। তোমার সব রাগ, ঘেন্না, ঝগড়া তো আমার সঙ্গে। আমাকে যত পার ঘেন্না কর। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে তো তোমার কোন বিবাদ নেই।

দেবী, শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের মতো জননীর ভূমিকায় অভিনয় করে আমায় ঠকাচ্ছ। শুধু পঞ্চপাণ্ডবের জীবনের নিরাপত্তা চাও? কর্ণ তোমার কেউ নয়, তার বাঁচা মরা নিয়ে তোমার কোন উদ্বেগ নেই, দুর্ভাবনাও না। বড় স্বার্থপর তুমি। হাত পেতে শুধু নিতেই এসেছ, দিতে আসনি। তোমার মতো গর্ভ-ধারিণীর সন্তানেরা পৃথিবীতে বড় হতভাগ্য।

ওরে অভিমানী তোকে আমি নিতে এসেছি তৃষিত বক্ষের মাঝে। সর্বাগ্রজ তুই!

এতকাল পরে জানলে! এতদিন তৃষিত বক্ষে কেন জায়গা হয় নি—তার জবাব দেবে কি জননী? দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপরীক্ষার রণভূমিতে পাছে অর্জুনের বীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, তাই সংজ্ঞা হারা হয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত করলে। তুমি ভুললেও আমি ভুলেনি। কর্ণ চিরদিনই অবহেলার পাত্র। তবু তুমি জননী আমার। বড় আশা করে এসেছ। বিমুখ করব না তোমায়। তুমি চিরকাল পঞ্চপুত্রের জননী থাকবে।

কর্ণের প্রতিশ্রুতি মিথ্যে হয়নি। আমি পঞ্চপুত্রের জননী আছি। তার প্রার্থনা আমাকে অপ্রস্তুত করল। মায়ের কাছে সন্তানের কত দীন প্রার্থনা! "দেবী আমার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কর্ণ যখন থাকবে না তখন শুধু তাকে তোমার বলে ভেব একটু। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল তার জন্যে, তা-হলেই তার মায়ের ভালোবাসা পাওয়া হবে।

হতভাগা কর্ণের প্রাণহীন দেহের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি। চোখ দুটো বিষণ্ণ বেদনায় ছোট হয়ে এল। তবু চোখ ফেটে এক ফোঁটা জল ও পড়ল না। এ এক রহস্য। বড় অদ্ভুত জটিল রহস্য। কর্ণের সঙ্গে আমার পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি বলেই আত্মীয় বন্ধন বড় শিথিল ছিল। তার মৃত্যুতে সৌজন্য-মূলক একটা শোকভাবে আমার ভেতরটা ভীষণ মৌন, গম্ভীর এবং বিষাদে ভরে ছিল। একটা গভীর থমথমে শোকের ভাব আমার চোখে মুখে লেগে রইল।

হায় রে কপাল! তবু পাষাণ চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল ও গড়াল না। কিন্তু তার মৃত্যুটা আমার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে এক খণ্ড পাথরের মতো ঝুলে রইল।

কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল কর্ণের দীন আর্তি, মানব জন্মের তীব্র ব্যাকুলতা। মাগো জীবনের বড় কোন মর্ম যেখানে নেই, সেই জীবন তো বহন করা যায় না। আমার বঞ্চিত, অবহেলিত, ব্যথিত জীবনের কত জায়গায় যে কত দুঃখ, বেদনা, দৈন্য, হাহাকার, শূন্যতা তা বোঝার মতো তোমার মন কোথায়? তাই যখন আমি থাকব না, আমাকে ছোঁয়ারও যখন সাধ্য থাকবে না, আমার বিরুদ্ধে যখন আর কারো নালিশ থাকবে না; রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা থাকবে না, মাতৃ স্নেহের অবহেলায় যখন তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকব, তখন তাকে একটু করুণা কর। তোমার পুত্র বলে ভেব। বেঁচে থেকে যে মায়ের আদর মমতা, স্নেহ ভালোবাসা পেল না, মরণে তার সব সুধাটুকু চোখের জলে বুক নিঙরে দিও। তোমার বুকে সাগর হয়ে যেন মিশে যাই। তখন আর আমার কোন কষ্ট থাকবে না।"

আর থাকতে পারলাম না। দীর্ঘ তপ্ত মাতৃত্বের শুষ্ক মরুভূমিতে প্রথম বৃষ্টি নামল। বুক ভাসিয়ে এল কান্না, করুণা, মায়া, ভালোবাসা। আমার সব লজ্জা

দ্বিধা, সংকোচ ভেসে গেল অশ্রুর সাগরে। কর্ণের দেহে সত্যিই সাগর হয়ে মিশে গেলাম। কী সুখে ভরে যাচ্ছিল ভেতরটা। বললাম, পুত্র আমার। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তোর অভাগিনী কুমারী জননীকে!

এখনও আমরা প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি। দীর্ঘকাল ধরে আমি তার প্রতীক্ষা করছি। প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত ভীষণ অপবিত্র লাগছে। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করব বলেই তো বনভূমিতে এসেছি। সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে এসেছি। বিদুর পারেনি। আত্মগ্লানিতে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্ত ও ভাবে আমি হেরে যেতে চাই না নিজের কাছে। মৃত্যু দিয়ে তো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। স্বেচ্ছা মৃত্যু মানেই জীবনের উপর ছেদ টেনে দেয়া। আমার অস্তিত্বকে স্বেচ্ছায় মুছে ফেলতে চাই না। এরকম আত্মহননের পেছনে কোন আদর্শ নেই, নীতি নেই। পলাতকী মনোবৃত্তি নিয়ে মানুষ নিজের কাজ নিজে পালিয়ে বাঁচার জন্যে আত্মহনন করে। ভালো-মন্দ যাই করে থাকি, নিজের জন্যে করেছি। তার সব দায় আমার। সে জন্যে পালানোর কী আছে! আত্মরক্ষার জন্যে পালাব, কিন্তু কৃতকর্মের দায় এড়াতে পালাব কেন? প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমি অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করব। মহাকালের রথ যতদিন না আমাকে নিতে আসবে ততদিন আমি প্রতীক্ষা করব। কান পেতে আমি তাঁর পায়ের ধ্বনি শুনছি। কী ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে মহাকাল অগ্নির রূপ ধরে আসছে, হাতে তাঁর আগুনের শিখা, গলায় আগুনের মালা, গায়ে অগ্নি বরণ বসন, কপালে আগুন রঙের টিপ জ্বল জ্বল করছে। আমার মনের সমস্ত তারগুলি যেন তাঁর আগমনের সুরেই বাঁধা হয়ে গেছে। তাই এক আশ্চর্য সুখে দেহ মন ভরে যাচ্ছে। মহাকাল আগুনের রূপ ধরেই যেন আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছেন।

দাবানলের মধ্যে আমার জীবনের এ কোন বিশ্বরূপ দেখলাম। যেখানে বিশ্বের সব সত্য পৌঁছয়। কথাটা মনে করে আমার গায়ে কাঁটা দিল। এর আদি নেই মধ্য নেই, অন্ত নেই। যাকে আমি অতীত বলে ভেবেছি প্রকৃতপক্ষে তা অতীত হয়ে যায় নি, আমার সমস্ত ভাবনার মধ্যে অনুশোচনা মধ্যে অনুক্ষণ বর্তমান। তার তাপে আমার দেহ মন পুড়ছে সর্বক্ষণ। আগুনের মতোই তার দাহ। স্নায়ুতে স্নায়ুতে তার ভয়ংকর জ্বালা আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না।

মনের আগুনে প্রতিদিন পুড়ে মরার চেয়ে দাবানলের আগুনে পুড়ে মরা অনেক শান্তি। নইলে, মাদ্রীর সহমরণের পাপ, নিষাদ রমণী ও তার পাঁচ পুত্রকে বারণাবতে হত্যা করার পাপ, কর্ণকে বঞ্চনা করা, প্রতারণা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? আমি সর্বক্ষণ প্রার্থনা করছি, হে রুদ্র আগুনের বেশে এসে আমাকে তুমি গ্রাস কর। আমার পাপ, অপমান, লজ্জা গ্লানি সব পুড়িয়ে ছারখার করে দাও। তোমার পরশে আমাকে পবিত্র কর ঃ ধন্য কর।

রুদ্র আমার প্রার্থনায় সাড়া দিতেই যেন শুকনো গাছের একটা জ্বলন্ত ডাল হয়ে কুটীরের চালের উপর ভেঙে পড়ল। শুকনো খড়ের চাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট হলাম। এই প্রথম মৃত্যু ভয় হলো। যে ভয় সব জীবের আদিম এবং অকৃত্রিম। ঘাতকের মতো মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে জ্বলন্ত ডাল আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। পালানোর পথ বন্ধ। সারা গায়ে দুঃসহতাপ অনুভব করছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখে বিভীষিকা দেখছি। ঘুম নামছে চোখে। লম্বা ঘুম।

———